বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবর—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ২৫শে ভাদ্র ১৩৮৯ ১১ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২	প্রথম সংখ্যা

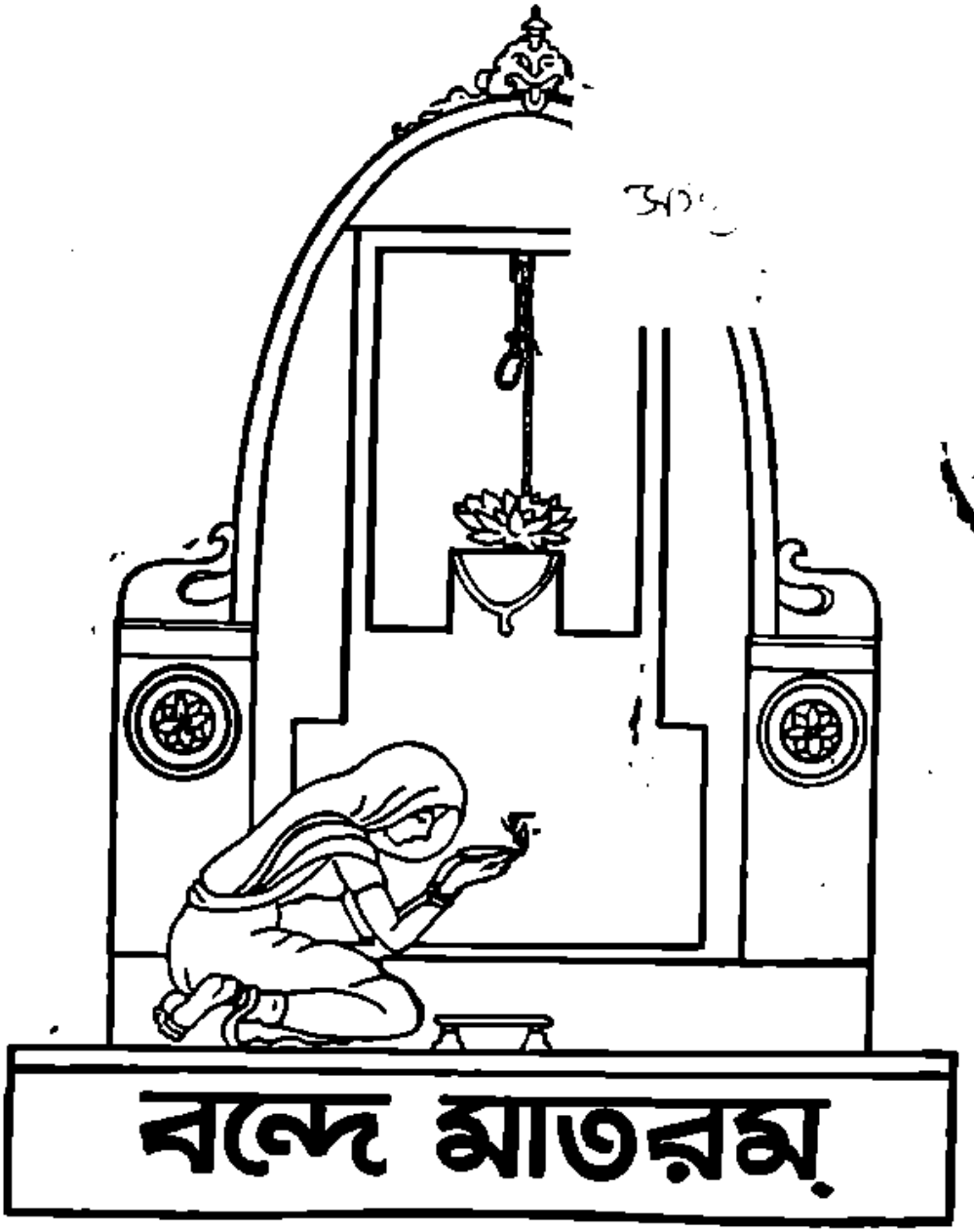

বন্দে মাতরম্

সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্লকুসমিত-দ্রুমদল শোভিনীম্।
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিনীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটীকণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখরকরবালে,
অবলা কেন মা এত বলে।
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদল-বিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাম্ অতুলাম্,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্
বন্দে মাতরম্।
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

সম্পাদকীয়

শ প থ

চারশ বার্ষে পদার্পন করিলাম.....

দেশের মুক্তি সংগ্রামে যাহারা নিজেদের জীবন বলি দিয়া গিয়াছে, স্বাধীনতার পরে তাহাদের অমরত্বের দাবি অস্বীকার করিবার যেন একটা সুকল্পিত অভিযান সুরু হইয়াছিল। আমরা এই প্রতিক্রিয়া-পন্থী অভিযানের বিরুদ্ধে আপোষহীন ও বিরামহীন প্রতিরোধ ঘোষণা করিয়া যাত্রা সুরু করিয়াছিলাম।

এই সংগ্রামে আজ আমরা জয়ী। বাঙ্গালীর অত্যাশ্চর্য চেতনার দ্বারে আমরা প্রবেশ লাভ করিয়াছি। শুধু বাঙ্গালী নয়, সারা ভারতবর্ষে আজ ভারতের বিপ্লব আন্দোলনের শহীদ-গণের জীবনী, জীবনাদর্শ ও বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা জানিবার ও বুঝিবার একটা আগ্রহ সৃষ্টি হইয়াছে। আধুনিক রাজনীতির নির্লজ্জ সুবিধাবাদ ও আধুনিক সামাজিক নেতৃত্বের নির্লজ্জ আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থলুব্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে অতীত দিনের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে স্বার্থহীন ত্যাগ, সেবা ও আত্মোৎসর্গের আদর্শে আজ আমরা দেশবাসীর সশ্রদ্ধ আগ্রহ ও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছি।

বিপ্লবী বাংলা এই সুস্পষ্ট আদর্শ ও উদ্দেশ্য লইয়া জন্মলাভ করিয়াছিল এবং নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে। আজ নূতন বর্ষে পদার্পন করিয়া এই সঙ্কল্পই পুনরায় ঘোষণা করিতেছে। যদি মরিতে হয় তবে এই আদর্শ লইয়া মরিবে, যদি বাঁচে যতদিন বাঁচিয়া থাকিবে কোন কারণেই আদর্শের সঙ্গে আপোষ করিতে স্বীকৃত হইবে না। এই সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করিয়া বিপ্লবী বাংলা নতুন বৎসরে যাত্রা সুরু করিল। অতীতের ঐতিহ্যের নিকট আদর্শের ঋণই আমাদের ঋণ, সেই ঋণ পরিশোধের ব্রতই আমাদের ব্রত। সেই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার পবিত্র প্রচেষ্টার কোন স্তর থেকে দূরে বলিয়া মনে করি না, কোন ত্যাগকেই অতিবড় বলিয়া মনে করি না। চির বিপ্লবী বাঙালীর শুভেচ্ছা সঙ্গে আছে এবং থাকিবে এই বিশ্বাস ও ভরসায় আমরা আবার যাত্রা সুরু করিলাম।

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয় গান—
আসি অলক্ষে দাঁড়ায়েছে তারা দিতে হবে বলিদান।

চিত্তপ্রিয়

জ্যোতিষ

বাঘা যতীন

মনোরঞ্জন

নীরেণ

ভবেশ নন্দী

জন্ম : ৯ই নভেম্বর ১৯০২ মৃত্যু : ৩০শে আগস্ট ১৯৮২

অবিভক্ত বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম বিপ্লবী নেতা শ্রীভবেশ চন্দ্র নন্দী গত ৩০শে আগষ্ট পরলোক গমণ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বৎসর। অকৃতদার এই বিপ্লবীর জীবনের প্রায় ১৫ বৎসর বৃটিশ কারাগারে এবং পাকিস্তান জেলে বন্দী অবস্থায় কাটে। বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম পুরধা এবং সুভাষচন্দ্রের বিশেষ ঘনিষ্ঠতম সহকর্মী। স্বাধীনতা আন্দোলনে তার অবদান স্মরণীয়।

পাকিস্তানের তিনি Constituent Assembly র সভ্য ছিলেন তিনি পাকিস্তান জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম এবং কংগ্রেসের বিশিষ্ট নায়ক ও সংগঠকরূপে সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তিনি পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ঢাকায় তিনি 'আমার দেশ' নামে একটি সাপ্তাহিক কাগজ প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। বারবার সাম্প্রদায়ীক দাঙ্গায় জীবন বিপন্ন হলেও তিনি সর্বদা সংখ্যালঘুদের পাশে নির্ভীকভাবে তাদের মনোবল রক্ষা করেন। দেশবিভাগের পর যে কয়জন বিশিষ্ট বিপ্লবী নেতা পূর্ববাংলায় থেকে গিয়েছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

পাকিস্তানে থাকা কালে শ্রীনন্দী Pakistan Minority Commission এবং Law Commission এর প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ হেমচন্দ্র ঘোষ, অনিল রায়, লীলা রায়, সত্য গুপ্ত, ভূপেন রক্ষিত, ডা: ভূপাল বসু, মণীন্দ্র কিশোর রায় প্রমুখের অন্তরঙ্গ ও ঘনিষ্ঠ সহকর্মী এবং সেই বিপ্লবীদলের উচ্চতম সারীর নেতা। তাঁর সংগঠন প্রতিভায় বহু যুবককে বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগদানে সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেন। উল্লেখ্য যে, বিনয়-বাদল-দীনেশ অনিল দাস ও আরও অনেক শহীদরা তাঁর সাহচর্যে বিশেষ প্রেরণা লাভ করেন।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর তিনি কিছুকালের জন্য এখানে আসেন এবং নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হন। 'বিপ্লবী বাংলা'র সম্পাদক মণ্ডলীর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। এই নিরলস কর্মী সর্বজন প্রিয় মহান বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি।

মৃত্যুর পথে জয়ের তূর্য বাজে

—অভিজ্ঞ

১৯১৫ সালের ৯ই সেপ্‌টেম্বর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বীরের বুকের রক্ত দিয়ে লেখা হয়েছিল। কালচক্র আবর্তনে ৯ই সেপটেম্বর যেমন প্রতি বৎসর ঘুরে ঘুরে আসে, চারখণ্ড সংগ্রামের ইতিহাসও তেমনি প্রতি বছরই ৯ই সেপটেম্বর মনকে আন্দোলিত করে। নতুন করে জাগে অগ্নি উৎসাধারে মৃত্যুহীন জীবনের হিল্লোল। সে দিন যে পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধা সব তুচ্ছতার ঊর্দ্ধে উঠে আত্মবলিদানের অনির্বাণ দীপশিখা জ্বেলেছিলেন তাই হয়েছিল পরবর্তী অভিযাত্রীদের অমূল্য পাথেয় সুনিশ্চিত পথ সংকেত।

একদিকে বিপুল সশস্ত্র পুলিস ও তাদের অনুচরদল পুলিসের তিন প্রধান টেগার্ট, ডেনহ্যাম ও বার্ডের নেতৃত্বে অগ্রসর, অন্যদিকে পথকষ্টে ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত পঞ্চ বিপ্লবী বীর হাতে তাঁদের একটি করে পিস্তল। এই অসম যুদ্ধে জয়লাভ যে অসম্ভব তা তাঁরা জানতেন কিন্তু বিনাযুদ্ধে আত্মসমর্পণের পরিবর্তে তাঁরা বীরের মৃত্যু শ্রেয়: বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। সে দিন তাঁরা মহাশক্তিশালী ব্রিটিশ সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন :

"যত বড়ো হও
তুমি তো মৃত্যুর চেয়ে বড়ো নও
'আমি মৃত্যু-চেয়ে বড়ো' এই শেষ কথা বলে
যাব আমি চলে।"

যুদ্ধে চিত্তপ্রিয় নিহত হন, নায়ক যতীন্দ্রনাথ মারাত্মক ভাবে আহত অবস্থায় পরদিন হাসপাতালে মারা যান। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসি হয় এবং আহত যতীশ সুস্থ হবার পর ১৪ বছরের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেলেই মারা যান। এ ইতিহাস বহু কথিত ও বহু পঠিত তবু চির নূতন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ জড়িয়ে পড়লে বিপ্লবীগণ তার সুযোগ নিয়ে দেশে একটি সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটিয়ে রাষ্ট্রশক্তি অধিকারের পরিকল্পনা করেন। বাংলার দুই প্রধান বিপ্লবীদল অনুশীলন ও যুগান্তর কিন্তু কৌশল ও কর্ম পদ্ধতি অনুসরণে একমত হতে পারে না। অনুশীলন দলের নেতা রাসবিহারী বসু ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাদলে বিদ্রোহ ঘটিয়ে বিপ্লবীদলের নেতৃত্বে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আয়োজন করেন তা অনেক দূর এগিয়ে যায়। অন্যদিকে যুগান্তর দলের নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি স্থানীয় প্রস্তুতি সমাপ্ত করে জার্মাণী থেকে প্রতিশ্রুত অস্ত্র বোঝাই জাহাজের আগমন প্রতীক্ষায় থাকেন। দুটি পরিকল্পনা নির্দিষ্ট ব্যবস্থামত এগিয়ে গেলে একই সময়ে যুগপৎ আঘাত হানতে পারত এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছত, কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনা জনিত তা ঘটল না। ইংরাজ সরকারের মেয়াদ আরো ত্রিশ বছর বেড়ে গেল।

দেশের মুক্তি সংগ্রাম ১৯১৫ সালের সাময়িক বিপর্যয়ে কিন্তু পিছিয়ে যায় নি। মুক্তি সংগ্রামে পরাজয় নেই। অভিজ্ঞতার আলোক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নির্ভীক মৃত্যুবরণের অদৃশ্য শক্তিতে ভরপুর হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম নতুন উদ্যমে নতুন পন্থায় এগিয়েই গিয়েছিল এবং আসমুদ্র হিমাচল প্রকম্পিত করেছিল।

১৯১৪-১৫ সালের অভ্যুত্থান আয়োজনের ব্যর্থতার কারণ ছিল গোপন তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়া। প্রস্তাবিত সেনা বিদ্রোহ এবং জার্মাণী থেকে অস্ত্র সরবরাহ, দুটি প্রচেষ্টার ব্যর্থতার মূলেই ঐ এক

সর্বনাশা হেতু ছিল। এতে অস্বাভাবিকতা কিছু ছিল না। গুপ্ত সংগঠন সীমিত লক্ষ্য সাধনে সফল হতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর পটভূমিতে একটি সামগ্রিক জাতীয় অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে গুপ্ত সংগঠন তা যতই আন্তরিক ও নির্ভীক হোক, লক্ষ্যে পৌঁছতে যে পারে না সে সত্য কেবল যে ১৯১৫ সালের ব্যর্থতাই প্রমাণ করেছিল তাই নয়, ইতিহাসের অনেক অসফল বিদ্রোহ তার সাক্ষ্য দেয়।

প্রথম যুদ্ধকালীন ভারতের পটভূমিও সার্বিক বিদ্রোহের অনুকূল ছিল না। দেশে তখনো গণজাগরণ ঘটে নি। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেশাত্মবোধ সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের অধিকাংশও ছিলেন আবার-মোহগ্রস্ত ব্রিটিশ সহযোগী। রাজভক্তির ইমারতে তখনো ফাটল ধরে নি। নতুবা বিশ্বযুদ্ধে ইংরাজের হয়ে দলে দলে ভারতীয় সেনা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ত না এবং ভারতের মানুষ নিজেদের অভাব অভিযোগ ভুলে স্বেচ্ছায় এত অর্থ ইংরাজের যুদ্ধ তহবিলে যোগাত না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৩৬, ৬৯৬ জন ভারতীয় সৈনিক প্রাণ দিয়েছিলেন এবং আহত হয়েছিলেন ১,০৬, ৫৯৪ জন। যুদ্ধ তহবিলে ভারতীয়দের দানের পরিমাণ ছিল ছিল ১০৫ মিলিয়ান পাউণ্ড।

এ পরিস্থিতি যে বিপ্লবীরা না জানতেন এমন নয় তবু এসব চিন্তা অগ্রাহ্য করে তাঁরা এগিয়ে গিয়েছিলেন। কারণ জীবনে তাঁরা পরাভবকে স্বীকার করতে শেখেন নি। তাঁরা বুঝতেন, সুযোগের সদ্ব্যবহার, তাঁরা জানতেন জীবন ও মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, তাঁদের অন্তর ছিল উদ্বেগহীন, সংকল্পে অটল। প্রথম প্রভাতের অভিযাত্রীদল তাই অন্তহীন আত্মবিশ্বাসে ভর করে, নির্ভয় চিত্তে শত্রুর সম্মুখীন হয়েছিলেন। তাঁরা জানতেন, তাঁদের এই অভিযান, এই আত্মত্যাগ নিষ্কলুষ চরিত্র গৌরব ভবিষ্যতের অভিযাত্রীদের পথ দেখাবে। তাই ছিল তাঁদের একমাত্র চিন্তা একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সাধনা। হে পঞ্চ বিপ্লবী ধন্য তোমাদের বিপ্লব সাধনা।

অমর শহীদদের আত্মত্যাগ বিফল হয় নি শত তরুণ পরে তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আত্মদান করেছেন। আবির্ভাব হয়েছে দেশে মোহ ঘুম ভাঙ্গানো যাদুকর মহাত্মা গান্ধীর, এসেছেন সর্বত্যাগী বীর নায়ক নেতাজী ১৯১৫ সালের অসমাপ্ত সেন বিদ্রোহ ঘটিয়েছেন তিনি এবং রাসবিহারী বসু দেশের বাইরে এবং তাঁরই প্রভাব স্পর্শে ব্রিটিশের প্রতি আনুগত্য অস্বীকার করেছে ব্রিটিশের ভারতীয় বাহিনী। অসহায় ইংরাজ ভারত ছেড়ে চলে গেছে যতীন্দ্রনাথ প্রমুখ বিপ্লবীদের আত্মবলিদান বৃথা যায় নি, বিফল হয়নি রাসবিহারীর সমর কৌশল।

সাময়িক পরাজয়গুলি জয়ের পথে এক একটি সোপান ছিল। বালেশ্বর যুদ্ধ তাদের অন্যতম। সিপাহী যুদ্ধ থেকে শুরু করে আজাদ হিন্দ ফৌজের সংগ্রাম পর্যন্ত যতগুলি প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ব্রিটিশ অধিকার উচ্ছেদের জন্য পরিচালিত হয়েছিল, তা সে সশস্ত্রই হোক কিংবা অহিংস সত্যাগ্রহই হোক কোনটিতেই শত্রুকে পরাস্ত করে হাতে হাতে জয় মালা দেশ জননীর গলায় পরানো সম্ভব হয় নি। কিন্তু তাই বলে সেগুলি কি বিফল হয়েছিল? সংগ্রামগুলিই তো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইস্পাত ফ্রেমকে আঘাতে আঘাতে চূর্ণ করে দিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখ্য, ভারতীয় বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের নেতৃবর্গ শ্রীঅরবিন্দ, ভিন্ন থেকে রাসবিহারী, যতীন্দ্রনাথ এবং নেতাজী

(১৪ পৃঃ দ্রঃ)

স্বাধীনতার স্বাদ

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার পঁয়ত্রিশ বছর পরেও যে ভয়াবহ মর্মন্তুদ চিত্র সবার চোখে পড়ে—দুপুর গড়িয়ে প্রায় বিকাল যখন হয় হয়, তখন দেখা যায় শহরের ফুটপাথের স্থায়ী বাসিন্দাদের রান্নাবান্নার তোড় জোড় শুরু হয়। দুখানি ইঁটের মাঝে কিছু খড় কুটোভাঙ্গা কেরোসিন কাঠের টুকরোরাস্তায় পড়ে থাকা ময়লা কাগজ অথবা ফলের টুকরির ভগ্নাংশ বা মাছের চাটাইয়ের ছেঁড়া খোঁড়া নোংরা চেঁচাড়ির ফেলে দেওয়া অংশ বিশেষ গুঁজে দিয়ে ওরা মাটির হাঁড়িতে জল দিয়ে তাতে কিছু ধোয়া চাল ছাড়ছে ভাত রান্না করার আশায়। ঐ রাঁধুনিদের চার পাশে ওদেরই কাচ্চা বাচ্চা, ছোট বড় মেয়ে মায় যোয়ান মরদ ও বুড়া-বুড়ি সবাই পেটের জ্বালায় ছট্ ফট্ করছে। সকলেরই আশা রান্না হলে তবে তো ওরা কিছু খেতে পাবে। দিনান্তে প্রায় প্রতি দিনই ওরা একবারই খেতে পায়, আবার কখনো কখনো তাও বোধ হয় পায় না। রোদে-বৃষ্টিতে-ঝড়ে দারুণ হাড় কাঁপানো শীতে ওরা ঐ ভাবেই আকাশতলে পড়ে থাকে। এ ছাড়া ওদের আর উপায় কি? ওরাই যে আসল সর্বহারার দল। তাই ওদের দেখার কেউ নেই। না জনগণ না এদেশের সরকার—কেউই ওদের দিকে ফিরেও চায় না। ওদের ভরসা নিজেদের গতর, আর বোধ হয় সেই ভগবান, যার দেখা ওরা কেন, কেউ-ই পায়নি।

তবুও ওরা বেশ নির্বিকার ভাবে ঐ কঠিন বাস্তবের সঙ্গে লড়াই কোরে বেঁচে থাকতে চায় কায়ক্লেশে। দুঃখকষ্ট বোধ ওদের গা সওয়া হয়ে গেছে বহুদিন ধরেই। ওরা এর জন্য কাউকেই দোষারোপ করে না, মাঝে মধ্যে চরম বিপদের দিনে কপালে করাঘাত করে ও খুবই অসহ্য হলে ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজেরাই সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করে। কেউ ওদের সান্ত্বনা দেবারও নেই যে। ঐ ফুট-পাথের ওপরই ওদের নব জাতক জন্ম নেয় সময় হলেই। নবজাতক ওখানেই ঐ নোংরা পরিবেশে লালিত-পালিত হতে থাকে, পরে বড় হয় এবং একই ধরণের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয় অধিকাংশ-রাই। তবে ব্যতিক্রমও আছে ওর মধ্যে, কারণ ওদের মধ্যে কিছু সমাজ বিরোধী যুবক বা কিশোর ওখানেই তালিম নেয় বড়দের কাছে। কুখ্যাত প্রতারক গোষ্ঠী যাদের পুলিস কেপ মারী নামে অভিহিত করে বা কাঙ্গালী পার্টি যারা হাওড়া ষ্টেসন ইয়ার্ডের মধ্যে মালামাল চুরি ও ছিনতাই করে তারা কিন্তু অধিকাংশই এ শহরের ফুটপাথেই জন্মায় ও তথায় তালিম নেয় এবং দল গড়ে। ওদের মধ্যে ভাল মানুষ, নিরীহ গোবেচারা কি নেই? নিশ্চয়ই আছে এবং তারাই সংখ্যায় অধিক। ঐ ভাল মানুষের দল শহরের রাস্তায় রাস্তায় ছেঁড়া কাগজ, পরিত্যক্ত জংধরা পুরাণ লোহা লক্কড়, রাস্তায় ফেলে দেওয়া তৈজস পত্র ইত্যাদি আবর্জনা জাতীয় নানা ধরণের জিনিষ কুড়িয়ে জড় করে ও পরে তা যথাস্থানে বিক্রি করে জীবন ধারণের জন্য কঠিন সংগ্রাম করে। ঐ সব সংগ্রামী ও পরিশ্রমী মানুষের দল দিনের পর দিন ঐ ভাবেই বেঁচে থাকার চেষ্টা করে। কেউ কেউ আবার ওরই মধ্যে হয়তো বা কোন মহাজনের সু-নজরে পড়ে কোন স্থায়ী চাকুরীও পায় পুরাতন জিনিষের দোকানে। তবে বেশীর ভাগ লোকই হয় ঐ ভাবে দিন গুজরান করে আর না হয় ভিক্ষা-বৃত্তিই ভরসা রাখে।

সমাজ-বিরোধী বা চোর জোচ্চর হয় অল্প কয়েকজনই, বাকীরা সরল, সিদে ও সাদা মাটা

জীবনই পছন্দ করে। ওদের মেয়ে-পুরুষ কেউ-ই বসে যায় না বা সে চিন্তা করে না। শিক্ষার কোন সুযোগ পায়না ওরা, পেলে নিশ্চয় ওদের মঙ্গল হতো। দুমুঠো অন্নের জন্যই যেন ওরা কোন মতে বেঁচে আছে। মনুষ্যত্বের এই অপমৃত্যু যে দেশের পক্ষে দারুণ একটা সমস্যা তা বোধহয় কেউ-ই তলিয়ে দেখার চেষ্টা করে না বা এ নিয়ে প্রকৃতই চিন্তা-ভাবনার প্রয়োজন আছে যে, জনস্বার্থে ও দেশস্বার্থে, তা বোধ হয় নেতৃস্থানীয়দের মগজে এখনো ঢোকে নি এই স্বাধীনদেশে।

বৃটিশ ধনিক বণিক শ্রেণীর শাসনের ও শোষণের হাত থেকে আজ আমরা মুক্তি পেলেও, এদেশীয় বৃহৎ ধনিক বণিক শ্রেণীর শোষণের হাত থেকে ভারতবাসী মুক্তি তো পায় নি, বরং আরো অধিক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত এবং বিপন্ন বোধ করছে প্রতি মুহূর্তেই। নির্বাচনে সব রাজনৈতিক দলই ঐ সব দেশীয় ধনিক-বণিকদের দ্বারস্থ হয় অর্থের জন্য। ওরা অর্থ দেয় নিজেদের কায়েমী অর্থনৈতিক স্বার্থ বজায় রাখার হীন উদ্দেশ্যে আর নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে যে টাকাটা দেয় তার প্রায় চার গুণ কি পাঁচ গুণ ওরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এদেশীয় জনগণের কাছ থেকে আদায় করে নেয় ভোগ্য পণ্যের অস্বাভাবিক দাম বাড়িয়ে দিয়ে। সরকার নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে থাকতে বাধ্য হয়, কারণ গদীতে বসাবার ও গদী থেকে নামাবার আসল মালিক ওরাই। জনগণ শুধু স্লোগান দেয় ও হৈ চৈ কোরে অবসন্ন হয়ে পড়ে ধীরে ধীরে। ওরা ওদের সুযোগ ও সুবিধা পুরামাত্রায় সরকারের কাছ থেকে আদায় করে কেন্দ্রে ও রাজ্যে সর্ব্বত্রই। স্বাধীন দেশের আসল মালিক ওরাই, কারণ ওদের টাকার জোরে নির্ব্বাচনে জয়-পরাজয় নির্ণীত হয়।

এদেশের সরকার পক্ষ ও বিরোধী পক্ষ সবাই ওদের কাছে হাত পেতে টাকা নেয় বলেই, ওদের বিরুদ্ধে কিছু বাদ-প্রতিবাদ করার শক্তি উভয় পক্ষের অত্যন্ত সীমিত। কেউ ই ওদের স্বার্থে ঘা দিতে সাহসী হয় না, আর ওদের স্বার্থ সর্ব্বক্ষেত্রেই জনস্বার্থ ও দেশস্বার্থ বিরোধী—এটা সবাই উত্তম রূপেই জানে। দারিদ্র মোচাতে সতত চেষ্টা করে সরকার, কিন্তু উক্ত ধনিক-বণিকরা সে পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রায় ক্ষেত্রেই। ওদের দাপটে সরকারও পদে পদে নাজেহাল হয়, কিন্তু ওদের প্রাধান্য বা প্রভাবকে খর্ব করতে পারে না কোন ক্রমেই। অর্থনৈতিক ক্ষমতা উক্ত ধনিক-বণিকদের হাতে এত প্রচণ্ড রকম অধিক যে ওরা মনে করলেই যে কোন সময়েই সরকারের পতন ঘটাতে পারে—তা সে যে দলের বা দল সমষ্টির সরকারই হোক না কেন।

বৃহৎ ধনিক-বণিক গোষ্ঠী সংঘবদ্ধ একই স্বার্থে, তাই তাদের প্রকৃত শক্তি দারুণ দৃঢ়। ফলে ওদের সম্মিলিত শক্তির কাছে সরকারী শক্তি প্রায়শই পরাভূত হতে বাধ্য হয় এদেশে। কিন্তু ওদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বীতায় যখন ওদের ঐ সম্মিলিত শক্তি কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, তখনই যদি সরকার ওদের সেই বিচ্ছিন্নতার সুযোগ নিয়ে কাউকে কাউকে ধাতস্থ করার চেষ্টা করে, তবে তা সম্ভব হয় বাস্তবে; অন্যথায় ওরা অনমণীয়। উপরোক্ত দ্রব্যমূল্য ঊর্দ্ধগতিতে বেড়েছে ও আরো বাড়ার আশংকা দেখা দিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধের চেষ্টায় সরকার সদা অতি যত্নবান, তথাপি মাঝে মাঝে মুদ্রাস্ফীতি ঘটে এদেশে এমন অধিক মাত্রায় যে সরকারও বিচলিত হতে বাধ্য হয়। ভারতে এখনো প্রায় শতকরা চল্লিশভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। দেশবাসী জানে, কিন্তু তারা তো অসহায়। দেশের চল্লিশ ভাগ নরনারীর অশ্রুসিক্ত এই না পাওয়ার বেদনা বিপ্লবী মনকে দারুণ ভাবে নাড়া দেয়।

পথের দাবির লেখক শরৎচন্দ্র

কালীপদ সরকার

বাংলা উপন্যাস জগতের সম্রাট শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয় এমন এক সময়ে যখন বঙ্কিম চন্দ্রের উপন্যাসগুলি খুব পুরাতন হয় নি এবং আকাশ আলো করে রবীন্দ্রনাথ দীপ্তিমান। অসাধারণ সৃজনী প্রতিভা থাকলেই শুধু একজন সহায় সম্বল-হীন অপরিচিত লেখকের পক্ষে এ উদয় সম্ভব ছিল। শরৎ চন্দ্রের প্রথম লেখা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি খ্যাতির আসরে বসেছেন। একেবারে সেই 'veni, vidi, vici,' এলাম, দেখলাম, জয় করলাম। এ সম্বন্ধে একটি মজার ইতিহাস আছে।

শরৎ চন্দ্রের 'বড় দিদি' গল্পটি ছাপা হয় বাংলা ১৩১৪ সালে 'ভারতী' মাসিক পত্রিকায় বে-নামে। এটিই ছিল তাঁর লেখার প্রথম প্রকাশ। শরৎ চন্দ্র নিজে গল্পটি ছাপতে দেন নি। তখন তিনি বার্মায় চাকুরি করছেন। সাহিত্যিক সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়ের সহিত শরৎ চন্দ্রের পরিচয় ছিল। সৌরিন্দ্র মোহন ভাগলপুর থেকে শরৎ চন্দ্রের দুখানা খাতা নিয়ে এসেছিলেন। সেই খাতা থেকে 'বড়-দিদি' গল্পটি নকল করে তিনি 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপতে দেন।

গল্পটির কিছু অংশ ছাপা হওয়া মাত্র 'বঙ্গ দর্শনের সম্পাদক শৈলেশ মজুমদার, 'বঙ্গ দর্শনের' তদানীন্তন পৃষ্ঠপোষক রবীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে অনুযোগ করেন—আপনি আর উপন্যাস লিখবেন না বলেছেন, অথচ এই তো 'ভারতীর' জন্য উপন্যাস লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথ কথা শুনে অবাক। তিনি ভারতী পত্রিকায় 'বড়দিদি' উপন্যাসের যতটা ছাপা হয়েছিল পড়ে শৈলেশ চন্দ্রকে বলেছিলেন—আমার লেখা নয়, তবে খুব শক্তিশালী কোন লেখকের রচনা।

চিরন্তন সাহিত্য বলে যে উপন্যাসগুলি স্বীকৃতি পেয়েছে, সেগুলি কেবল রসসৃষ্টি এবং সমকালীন পাঠক মনোরঞ্জনের জন্য রচিত হয় নি. গ্রন্থগুলি একটি না একটি লক্ষ্যের বা আদর্শ অনুশীলনের উদ্দেশ্য সম্বলিত। সমাজের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার ও অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ যে শরৎ-সাহিত্যের মর্ম বাণী, তার আলোচনা এ প্রবন্ধের বিষয় নয়, স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা এবং বিপ্লবী ভাব-ধারার প্রবক্তা শরৎচন্দ্রকে তাঁর ১০৭ তম জন্মদিবস, ১৫ই সেপ্‌টেম্বরে, প্রণাম নিবেদন এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের লক্ষ্য।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে দেশবন্ধুর আহবানে সাড়া দিয়ে শরৎ চন্দ্র কংগ্রেসে যোগ দেন এবং হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি হন। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা ১৬ বছর তিনি সেই সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তখন শরৎ চাটুর্জে অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় কথাশিল্পী, বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর উপন্যাসের সমাদর এবং বাংলার সীমানা পার হয়ে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়েছে সারা ভারতের সাহিত্য জগতে। এই সময় শরৎ চন্দ্র থাকতেন বাজে শিবপুরে, এখানে থাকা কালেই তিনি তাঁর বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। সময়টাকে শরৎ-সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়।

কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও, মতাদর্শে শরৎ চন্দ্র ছিলেন স্বতন্ত্র এবং বিপ্লববাদের সমর্থক। খাদি প্রচার নিয়ে গান্ধীজীর সহিত শরৎ চন্দ্রের একবার কিছু কথাবার্তা হয়। গান্ধীজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন:

"Why don't you believe that attainment of swaraj will be helped by spinning ? "

শরৎ চন্দ্র উত্তরে বলেছিলেন :—"I think attainment of swaraj can be only helped by soldier and not by spiders."

তরুণ সুভাষচন্দ্র শরৎচন্দ্রকে আকর্ষণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র তখন সবেমাত্র কংগ্রেসে এসেছেন। তিনি তখন ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অবস্থিত জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ, প্রদেশ কংগ্রেসের প্রচার সচিব এবং কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক। শরৎ চন্দ্র প্রায়ই আসতেন জাতীয় বিদ্যাপীঠে তাঁর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে সুভাষের কাছে। দুজনে নিভৃতে কথাবার্তা হত। মানুষ চেনার জহুরি সাহিত্যিক তখনই চিনে ফেলেছিলেন যুবক সুভাষকে। সেই সূত্রে উভয়ের মধ্যে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল। ১৯৩৮ সালে ৬১ বৎসর বয়সে শরৎ চন্দ্র তাঁর প্রিয় ধরার ধূলিতে শেষ নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়েন। তখনো সুভাষ চন্দ্রের শিখর-চুম্বী দীপ্তি প্রকাশ পায় নি। তার আগেই সুভাষ চন্দ্রের প্রতি 'একটি নমস্কারে' শরৎ চন্দ্র লিখেছিলেন - "তুমি তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সর্বস্ব দিয়াছ—তাইতো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মাপার হইতে হয়। তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়। • • • তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার ? • • • দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পারো বলিয়াই তো ভগবান এতবড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন।

মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের রাজ-বিদ্রোহী, তোমাকে শতকোটি নমস্কার।'

এই হলেন আমাদের শরৎচন্দ্র। যিনি বাঙ্গালী জীবনের মর্মকেন্দ্রে উপস্থিত, যিনি তাঁর গল্পের নায়ক, নায়িকা এবং পার্শ্বচরিত্রের অনবদ্য ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে, বাঙ্গালী জীবনের আনন্দ, বেদনা ও আশাকে অনন্ত কালের জন্য বই-এর পাতায় জীবন্ত করে রেখে গিয়েছেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের লেখার হাত ছিল কিন্তু অস্থিরচিত্ত ভবঘুরে প্রকৃতির মানুষ, মতিলাল তাঁর সাহিত্য কৃতির যেমন কোন খাতাপত্র রক্ষা করে রাখেন নি, তেমনি কর্মজীবনে কিছুমাত্র সাফল্য লাভও করতে পারেন নি। ফলে স্ত্রী, পুত্র-কন্যাদের শৈশব অভাব-অনটনের মধ্যে কাটে। শরৎচন্দ্র পড়াশুনা করেন, ভাগলপুরে মাতামহের গৃহে থেকে। মাতামহের মৃত্যু হলে শরৎচন্দ্র একেবারে নিরাশ্রয় হন এবং কি যোগাড় করতে না পারায় এফ-এ পরীক্ষা দিতে পারেন না।

বিপ্লব মনোজগতের বিষয়। কেবল নীতি বচন বর্ষণ অথবা গায়ের জোর প্রদর্শনে সে জগতে পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। পরিবর্তন আনতে পারে সাহিত্য-কাব্য। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুই মহাকাব্য ভারতীয়দের যে ভাবে ধর্ম শিক্ষা দেয় এবং জাতীয় সংস্কৃতিগঠনে সাহায্য করে, মনুস্মৃতি কিংবা ভৃগু সংহিতা কি কখনো তা করতে পারে।

শরৎ চন্দ্রের 'পথের দাবি' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ এর আগস্টে। উপন্যাসখানির পটভূমি প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধ কালীন ভারতীয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রয়াস এবং নায়ক সব্যসাচী অনেকাংশে বিপ্লবী নায়ক রাস-বিহারী বসুর প্রতিচ্ছবি। উপন্যাস হলেও বইটিতে

ব্রিটিশ বিদ্বেষ এবং বিপ্লবী জীবনের মহত্ব আকর্ষণীয় ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ব্রিটিশ সরকার বইখানির প্রকাশ ও প্রচার নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করেন। ১৯২৯ সালে প্রকাশিত হয় শরৎ চন্দ্রের 'তরুণের বিদ্রোহ' বইখানি তাঁর লেখা প্রবন্ধ সংগ্রহ। এটিও ছিল জাতীয় জাগরণের সহায়ক।

শরৎ চন্দ্র সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান নি খুব সম্ভব দুটি কারণে (১) তাঁর উপন্যাসগুলির ভাল ইংরাজি অনুবাদের অভাবে এবং (২) তাঁর ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব সৃজনে। শরৎ সাহিত্য যথাকালে পাশ্চাত্য সমাজে প্রচারও হয় নি। স্বল্পবিত্ত উদাসীন প্রকৃতির মানুষ শরৎ চন্দ্রের পক্ষে তা করা সম্ভব ছিল না। তা না হোক, শরৎ চন্দ্র বাংলা সাহিত্য জগতে অপরাজেয় কথা শিল্পী রূপে চিরকাল অধিষ্ঠিত থাকবেন। তিনি বাঙ্গালী সমাজের নারী চরিত্রের-যে মহিমাময় অপূর্ব ব্যঞ্জনা করেছেন তার জন্য শরৎ চন্দ্রের নিকট আমাদের দেব-ঋণ অপরিশোধ্য।

যে যুগে বিপ্লব সাধনা ছিল এক হাতে জীবন অন্য হাতে মৃত্যুকে নিয়ে চলার মত, অনেক সময় সে চলা ছিল আবার আঁধার রাতে বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে একলা চলার দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা, যখন ভয়ে কবি সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই দুয়ার দিতেন ঘরে, তখন শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় এবং আচরণে যে সাহসিকতা ও দেশ প্রীতি দেখিয়েছিলেন, তার জন্য বিপ্লবী মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে চিরকাল মনে রাখবে।

(৬ষ্ঠ পৃঃ পর)

পর্যন্ত সকলেই ভারতীয় ধর্ম, ইতিহাস-চেতনা এবং জাতীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতিকে স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহার ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা যে বিপ্লবের ধারণা পোষণ করতেন তা ছিল মানব-মুক্তির আদর্শ ভাবিত, রাইফেল-বেয়নেট-কামানের সাহায্যে দলীয় অধিকারকে দেশবাসীর ওপর চাপিয়ে দেবার অভিসন্ধির কথা স্বপ্নেও তাঁদের মনে আসে নি। তাই তাঁরা চিরন্তন। সেদিন ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত জেনেও যে দেশ প্রেমিকের দল আমৃত্যু সংগ্রাম করেন তাঁদের সম্বন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

'দেহ দুঃখের হোমানলে যে অর্ঘ্য দিল সে আহুতি
জ্যোতিষ্কের তপস্যায়
তার কি তুলনা আছে কোথা।
এমন অপরাজিত বীর্যের সম্পদ
এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা
এমন উপেক্ষা মরণেরে,
হেন জয়যাত্রা—
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে .... ।'

চাষবাও সংগ্রাম সেই মরণজয়ী বীরের জয়-যাত্রার প্রতীক। সেই পক্ষ বিপ্লবী দেশপ্রেমিক বীরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। বন্দে মাতরম / জয় হিন্দ।

সংবাদ বিচিত্রা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ॥

কোচবিহার জেলার শীতলকুচি গ্রামে সি, পি এম এবং ফ: ব: সমর্থকদের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধে চার ব্যক্তি নিহত হন। সংঘর্ষের কারণ কৃষিভূমিতে একদলের বর্গাচাষীর বদলে আর এক দলের বর্গা-চাষীদের পত্তনের চেষ্টা। বর্তমানে এরই নাম কৃষক আন্দোলন। সাম্প্রতিক এই হত্যাকাণ্ড বামফ্রন্টের উপরতলাকে নাড়া দিয়েছে। সি, পি, এম এবং ফ: ব: নেতারা কোচবিহারে ছুটে গিয়েছেন এবং ফ্রন্ট-ঐক্য বাঁচাতে উঠে পড়ে লেগেছেন। কিন্তু যতদূর জানা যায় তাতে বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না যে, মধুমত্ত ভোমরাদের ঐক্যতান, দুই দলের লড়াকু তৃষ্ণার্তদের বিরোধ মেটাতে সফল হয় নি।

অবস্থা বুঝে পরিবহন উপ-মন্ত্রী শিবেন চৌধুরি এ সম্পর্কে একটি নতুন থিসিস দিয়েছেন, ফ: ব: সমর্থকরা নাকি ২৫০ জন বাংলাদেশীকে সীমান্তের ওপার থেকে এনে লড়াই বাধিয়েছিল। পুলিসের ডি-জি গোলক মজুমদার অবশ্য বলেছেন এ ধরণের খবর তাঁর জানা নেই। স্থানীয় বিধান সভার সদস্য সুধীর প্রামাণিক 'তথ্য গোপনের' অভিযোগ করেছেন। ব্যাপারটা সহজ নয়, তাই উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে না চাপলে মুখরক্ষা করা যায় কি করে।

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান প্রমোদবাবু বলেছেন কোচ-বিহারে প্রকৃত প্রস্তাবে কোন ফ্রন্টই নেই। সি, পি এম এর শিবেন চৌধুরি এবং ফ: ব: এর কমল গুহ দুজনই কোচবিহার থেকে নির্বাচিত ফ্রন্ট নেতারা ঠিক করেছেন, এই দুই নেতা কোচবিহার ঘটনা সম্পর্কে কোন বিবৃতি দিতে পারবেন না, যা বলার তা উপরতলা থেকেই বলা হবে। তাহলে তথ্য রন্ধনে ও পরিবেশনে কোন গোল থাকবে না। কিন্তু শীতলকুচির চেলাদের তাতে কি শীতল করা যাবে ?

* * *

॥ রাজনীতিতে বে-হাল যারা ভাগ্য করে সার
গ্রহরত্ন' পেয়ে ভাবে চিন্তা নাহি আর ॥

কিছু ব্যর্থ মনোরথ রাজনীতিক মানেকা গান্ধীকে গ্রহরত্ন করে গলায় ঝুলিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের ফিকিরে আছেন। শাশুড়ীর আশ্রয় থেকে পুত্রবধূ এবং শিশু পৌত্র বরুণকে সরা পরামর্শ দিয়ে বের করে এনে রাজনৈতিক মকে তোলার পিছনেও তারা ছিলেন। চক্রান্ত ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। চক্রান্তের জাল কতদূর থেকে পাতা হয়েছে তা অনুমান নির্ভর। তবে লক্ষ্য যে পুত্রশোক সন্তপ্তা জননীকে আঘাত হানা ও হেনস্তা করা সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে এই দুষ্ট চক্রান্ত যে জনসাধারণ বরদাস্ত করবে না তার প্রমাণ ইতিমধ্যেই প্রকাশ পাচ্ছে। ঢিলটা মারলে পাটকেলটাও যে খেতে হয় একথাটা তাদের জেনে রাখা ভাল।

* * *

॥ ডান হাতে তোর মধুর ভাণ্ড, বিষ-ছোরা বাম হাতে ॥

গত ২৭শে আগস্ট কারাকোরাম সড়ক খুলে দিয়ে পাকিস্থান ঘোল মেজাজে চীনের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। (অমৃত বাজার ২৮/৮/৮২) সড়কটি পাকিস্থান কর্তৃক অবৈধভাবে অধিকৃত কাশ্মীরের অঞ্চলটির ওপর দিয়ে গিয়েছে। পাকিস্থান ও চীন উভয়ই বলছে, সড়কটি খোলার উদ্দেশ্য হল বানিজ্য বৃদ্ধি। আসলে কিন্তু চীনের সামরিক পরিবহনের সুযোগ করে দেওয়াই সড়কটি খোলার লক্ষ্য। কারণ এ অঞ্চলে পাক-চীন বানিজ্যের কোন গুরুত্বই নেই।

ভারত পাকিস্থান ও চীনের কাছে আপত্তি জানিয়েছে। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের অংশটি আইনত ভারতের এবং অস্থায়ীভাবে মীমাংসা সাপেক্ষে পাকিস্থানের দখলে থাকলেও, সেই অঞ্চলের ওপর দিয়ে আন্তর্জাতিক সড়ক খুলে দেওয়ার কোন একতিয়ার পাকিস্থানের নেই। পাকিস্থান একদিকে ভারতের সহিত 'যুদ্ধ নয়' চুক্তি সম্পাদনের জন্য অনেক মিষ্টি কথা বলে, অন্যদিকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, বিমান, সাবমেরিন প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং তার ত্রিশ ডিভিসন সৈন্যবাহিনীর মধ্যে পচিশ ডিভিসন ভারতের সীমান্ত বরাবর মোতায়েন রেখেছে। সম্প্রীতি স্থাপনের খুব ভাল ব্যবস্থা নিশ্চয়ই!

* * *

॥ কাজের বেলা কাজি কাজ ফুরালে পাজি ॥

কেরলে মার্কসবাদীরা দুজন আর এস এস কর্মীকে পুড়িয়ে হত্যা করেছে। নিহতদের নাম সুব্রানীয়ম (২৪) এবং রাজন (২০)। স্থান ত্রিচুর জেলার অন্তর্গত কজিমপারম গ্রাম। তারিখ ২২/৭/৮২। (অর্গানাইজার ২২/৮/৮২)

বিগত ১৯শে মে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে কেরলে যে বিধানসভার নির্বাচন হয় তাতে মার্কসবাদী চালিত বামফ্রন্ট. কং (ই) চালিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের নিকট হেরে ক্ষমতাচ্যুত হয়। এই নির্বাচনে কেরলের ভারতীয় জনতা পার্টি দুই ফ্রন্টের কোনটিতেই যোগ দেয় না। আর এস এস হল ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন শাখা। সি পি এম এবং কংগ্রেস (ই) থেকে সমদূরবর্তী স্থানে অবস্থানের বি জে পি নীতি প্রকারান্তরে যে সি পি এম-কেই সমর্থনের নামান্তর এ কথা সকলেই বোঝে। কারণ বি জে পি যে অ কমিউনিস্ট ভোটগুলি নিজেদের প্রার্থীর অনুকূলে টানে, সেগুলি কং (ই) চালিত ফ্রন্টের পক্ষেই যেত এবং অনেক ক্ষেত্রেই সি পি এম প্রার্থীর পরাজয় ঘটাতো।

বি জে পি-র ভ্রান্ত নীতি কেরলে সি পি এম প্রার্থীদের সাহায্য করে এবং অ-কমিউনিস্ট ভোট ভাগাভাগির ফলে, সি পি এম কিছু বেশি আসন পেয়ে যায়, নতুবা তাদের পরাজয় আরো বড় রকমের হত। নির্বাচনের আগের সি পি এম—বি জে পি সম্পর্ক আর নেই. দুদলের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়ে গেছে। তবে কেরলের পুলিস প্রশাসন বর্তমানে তো সি পি এম চালিত নয় তাই খুন করে সেখানে দণ্ড থেকে অব্যাহতির উপায় নেই। খুনের রাজনীতি সেই কারণে একটু চেপেচুপে চলছে।

বি জে পি-র নেতারা কেরল নিয়ে ভাবনায় পড়েছেন। আর এস এস-দের পক্ষ হয়ে সি পি এম-এর নিন্দা করতেও বাধে, আবার দলের কর্মী খুন হতে থাকলে চুপ করেই বা কতদিন থাকা যায়।

* * *

আবার খুন (অমৃতবাজার ৩০ ৮/৮২)

গত ১১ই আগস্ট বাকুড়ায় খুন হয়েছেন, সুপরিচিত স্বাধীনতা সংগ্রামী মানিক চন্দ্র রায়। দুস্কৃতকারীরা তাঁর বাড়ি লুট করতে চেষ্টা করে। শ্রীরায় ছাদে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁকে লক্ষ্য করে ক্রাকার ছুড়লে, তার আঘাতে শ্রীরায় মারা যান।

আজকের তীব্র আর্থিক সংকট বামফ্রন্টের নিজেরই সৃষ্টি

নিখিল চক্রবর্তীর বিশ্লেষণ

["বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা আজকের এই শূন্য রাজকোষের সঙ্কট দশায় কেমন করে উনপীত হলো ?" এই প্রশ্ন করে দিল্লীর প্রখ্যাত কমিউনিষ্ট সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী উত্তরে বলেছেন, 'এর কারণ দুটো রাজনৈতিক হিসাবে ভুল এবং প্রাধান্য দেবার ক্ষেত্রে ভুল'।

১৯৮১-৮২ সালের বাজেটে বামফ্রন্টের ঘাটতি ছিল ৬৫ কোটি টাকা। পে-কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকর করতে আরও খরচ বেড়ে যায় ১২০ কোটি টাকা। অর্থাৎ বামফ্রন্টের চলতি বছর শুরু হয় ১৮৫ কোটি টাকা ঘাটতি নিয়ে। ৮২-৮৩ সালের ভোট অন এ্যাকাউন্ট বাজেটে দেখা যাচ্ছে ঘাটতির পরিমাণ ৩৫৯ কোটি টাকা।

রাজকোষের এমনই দশা যে রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের মাইনে দেওয়া দায় হয়ে উঠেছে রাজ্যের উন্নয়নের চিন্তা তো দূর অস্ত।

রাজ্য সরকার এই ভয়াবহ দেউলিয়া অবস্থা সম্পর্কে, বামফ্রন্টের প্রতি সব সহানুভূতি নিয়েই নিখিল চক্রবর্তী নব প্রকাশিত 'দি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় এক কার্য করণ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছেন।]

॥ ওভারড্রাফটের কেলেঙ্কারী ॥

নিখিলবাবু লিখেছেন, 'এই সঙ্কটের আশু কারণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক রাজ্যের ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নেওয়াকে ঋণ গ্রহণ হিসাবে দেখার ঘোষণা অর্থাৎ এ যাবৎ রাজ্যগুলি যেভাবে নিতো, যা বহু ক্ষেত্রেই ছিল দায়িত্বহীন কাজ, তা বন্ধ করে দেওয়া। পশ্চিমবাংলা নিয়েছে সবচেয়ে বেশী টাকা, সম্ভবত: ২০০০ কোটি টাকারও বেশী'।

তিনি লিখেছেন 'কেন্দ্র পশ্চিমবাংলার প্রতি এক্ষেত্রে কোন বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করেনি কারণ, দুটি রাজ্যই সর্বদা ওভারড্রাফটের দিকে হাত বাড়িয়ে ছিল। যাইহোক প: বঙ্গের স্থান তালিকায় সর্বোচ্চ। কেন্দ্র যদি অবিলম্বে জরুরী ভিত্তিতে রাজ্যকে কোন বিশেষ সহায়তা না দেয় তবে রাজ্য সরকারের ক্ষমতা নেই যে আগস্ট মাসে তার কর্মচারী ও শিক্ষকদের বেতন মিটিয়ে দেন—সঙ্কট আজ এমনই ভয়ঙ্কর।

॥ বামফ্রন্টের সুবিধাজনক অবস্থা ॥

এই ভয়াবহ সঙ্কটের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নিখিলবাবু লেখেন, 'অন্যান্য রাজ্যের তুলনায়, প: বাংলায় বামফ্রন্টের পরিচালনায় দীর্ঘ ৫ বছর একটা স্থায়ী সরকার ছিল। এবারের নির্ব্বাচনও দেখিয়েছে যে এই রাজ্যের ব্যাপক মানুষের সমর্থনও সরকারের পিছনে ছিল। এই ধরনের চমৎকার একটা রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রেক্ষাপট বামফ্রন্ট সরকারের পশ্চাতে থাকা সত্বেও কেমন করে এই সরকার শূন্য তহবিলের সম্মুখীন জড়িয়ে পড়লো ?

তিনি আরও লিখেছেন, 'প: বাংলায় বামফ্রন্ট প্রশাসনের মত সুবিধা হলো কেবলমাত্র আমলাতন্ত্রের উপরে তাদের নির্ভর করতে হয় না, এর আছে পার্টি কর্মীদের এক সুবিস্তৃত সংগঠন, আছে এর সমর্থনে এক শক্তিশালী ও গতিশীল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন। এর পরিচালনায় আছে বিশাল বিশাল গণ-সংগঠন।

রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ ও রাজ্য সরকারের ইচ্ছা অনুযায়ী যে কোন কর্মসূচীকে কাজে রূপায়িত করার এমন চমৎকার ব্যবস্থা থাকা সত্বেও কেন বামফ্রন্ট সরকার এমন দেউলিয়া হয়ে পড়লো ?

।। ভুল রাজনীতি, ভুল কার্যক্রম ।।

নিখিলবাবু এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছেন 'এর কারণ হলো দুটো—রাজনৈতিক হিসাবে ভুল এবং (অর্থনীতিতে) প্রাধান্য দেবার ভুল।

'১৯৮০ সাল পর্যন্ত প: বাংলায় সম্পদ আহরণ হয়েছে চমৎকার ; কিন্তু তারপরেই অর্থাৎ ইন্দিরা গান্ধীর ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তনের পরে মনে হয় যে বামফ্রন্ট আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এই আতঙ্কে যে ইন্দিরা গান্ধী বামফ্রন্ট সরকারকে অবশ্যই পদচ্যুত করবে। তার ফলেই সম্পদ আহরণের গুরুত্বপূর্ণ উপায়গুলি সব অকার্যকর হয়ে পড়লো, কারণ সম্পদ আহরণ মানেই হলো ভোটারদের কোন না কোন অংশের উপরে ট্যাক্সের বোঝা চাপান।

গত বছর থেকে, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো যে নির্ব্বাচন যথা নির্ধারিত সময়েই হবে এবং তখন বামফ্রন্ট ধরেই নিল যে রাষ্ট্রপতি শাসন আসন্ন কারণ ইন্দিরা বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় রেখে নির্ব্বাচন হতে দিতে পারেন না। এই ধারণা যা প্রায় তাদের গ্রাস করে ফেলেছিল তা আরও বদ্ধমূল হয় প্রদেশ কংগ্রেস নেতাদের চিৎকার চেঁচামেচিতে। তারা বুঝতেই পারেনি যে বাংলার রাজ্যপালের বিজ্ঞ পরামর্শ ও প্রণব মুখার্জির একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে নির্বাচনের আগে বামফ্রন্ট সরকারকে বাতিল না করে দেবার সিদ্ধান্ত কেন্দ্র গ্রহণ করে।

'রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে বামফ্রন্ট সরকারকে বাতিল করে দেওয়া হবেই - এই ধারণার বশবর্তী হয়ে বামফ্রন্ট সরকার ভবিষ্যৎ চিন্তা জলাঞ্জলি দেয় এবং মনের সুখে খরচ বাড়িয়ে যেতে থাকে—একথা চিন্তা না করেই যে এর ফলাফল তাদেরই ভোগ করতে হবে, রাষ্ট্রপতি শাসন তাদের সৃষ্ট এই সঙ্কটের বোঝা বহন করতে এগিয়ে আসবে না।

।। বামফ্রন্টের লোক-ভোলান খরচের বহর : ।।

'খরচের ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকার এমন এক চটকদার ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করে যা লোক ভোলানর পক্ষে চমৎকার কিন্তু রাজ্যের উন্নয়নের প্রশ্নে যার মূল্য খুবই সামান্য। কৃষকদের বার্ধক্যভাতা, রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের কেন্দ্রের সমতুল্য বেতনমান বৃদ্ধি, ব্যাপকভাবে শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনা বেতনে শিক্ষা—এগুলি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় ব্যবস্থা কিন্তু এগুলি একটুও রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের কাজে আসবে কি না সে বিষয়ে কেউই গভীরভাবে চিন্তা করলো না।

আজকের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্গিন। বিরাট পরিমাণ ওভারড্রাফটের টাকা যা কিনা বছরে ২০০ কোটি টাকা, এর তিন চতুর্থাংশ খরচ হয়েছে নিরুৎপাদক

ব্যয় বাড়ে। ফল দাঁড়িয়েছে এই যে যদি কেন্দ্র এই খরচের বহর মিটাতে টাকা দেয়ও তবুও তা রাজ্যের উন্নয়নের কাজে লাগবে না।

॥ কেন্দ্রকে দোষারোপ না করে বামফ্রন্ট
সঙ্কট সমাধানে কঠোর ব্যবস্থা নিক : ॥

নিখিলবাবু বামফ্রন্টের প্রতি আশা ও সহানুভূতি নিয়েই লিখেছেন, 'প: বাংলার বামফ্রন্টের পক্ষে উচিৎ হবে না কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করার সহজ পথ নেওয়া, দূর থেকে দেখে এই ধারণা হয় যে মুখ্যমন্ত্রী এটা বেশ ভালই বুঝতে পারছেন যে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানর চেষ্টা হবে নির্বুদ্ধিতা।'

তিনি মনে করেন বামফ্রন্ট সরকার নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে অর্থনীতিকে ঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যথেষ্ট সক্ষম। রাষ্ট্রিয় মালিকানাধীন সংস্থার প্রতি বামপন্থীদের সমর্থনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা দেখে অত্যন্ত দুঃখ হয় যে প: বাংলায় প্রতিটি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রকল্প পরিচালিত হচ্ছে বিরাট লোকসানে। রাষ্ট্রীয় পরিবহন পরিচালনা একটা বড় কেলেঙ্কারী। এক একটি বাসের জন্য নিযুক্ত আছে ২৭ জন কর্মী।

'তাদের বিশাল সমর্থকদের মনে দায়িত্ববোধ সৃষ্টি করে এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন সংস্থাগুলির সুস্থ পরিচালনার ব্যবস্থা কি করা যায় না ? সরকারী কর্মচারীরা যখন উচ্চতর বেতন পাচ্ছেন তাদের কাছ থেকে কি উচ্চতর কাজ আশা করা যাবে না ?

'বামফ্রন্ট পরিচালিত সংস্থায় উৎপাদন বৃদ্ধিকে একটা ঘৃণ্য কিছু বলে বিবেচনা করার যুক্তি নেই।'

—সোশালিষ্ট ফোরামের সৌজন্যে

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৬ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার. সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

লেবাননে ইজরাইলী বর্বরতার পরিপ্রেক্ষিতে হিরোশিমা দিবসের গুরুত্ব

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

৩৭ বছর আগে ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসিকি সহরের নিরস্ত্র জনগনের ওপর বর্ষিত হয়েছিল পরমাণু বোমা। বোমা বর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান কারণ মার্কিন সামরিক বিভাগের সর্বোচ্চ সেনাধ্যক্ষও এই বোমা বর্ষণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ছিলেন না। পরমাণু বোমার ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার খবর রাখতেন মার্কিন সরকারের কয়েকজন সর্বোচ্চ পদাধিকারী মাত্র। যে বিমান থেকে এই বোমা বর্ষিত হয়েছিল সেই বিমানের একজন চালক পরবর্তিকালে এই বোমার ধ্বংস ক্ষমতা দেখে উন্মাদ হয়ে যায়। কয়েকজন বৈমানিক পাপবোধের গ্লানিতে এখন পর্যন্ত তাদের পেনশনের অর্থ দিতেছেন হিরোশিমা পুনর্গঠন তহবিলে। শুধু হিরোশিমা সহরে বোমা বর্ষণের ফলে এবং পরে পরবর্তী তেজস্ক্রিয়ায় মোট ১,৫১,৬৮৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট হতে মাত্র তিনমাসের মধ্যে মৃত্যুর কুলে ঢলে পড়ল প্রায় ২৮ হাজার মানুষ পরমাণু তেজস্ক্রিয়ার কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল ২,০২,৪৯১ জন। নাগাসাকির ধ্বংসলীলাও প্রায় অনুরূপ।

প্রতি বছরই জাপানের হিরোশিমা নাগাসিকিতে ৬ আগস্ট যুদ্ধ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এই বছরও অনুষ্ঠিত হল বোমায় নিহতদের জন্য প্রার্থনা সভা। লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশ। এবছর হিরোশিমা দিবসে দেশ দেশান্তর থেকে অর্ধলক্ষাধিক নরনারী সমবেত হয়েছিল হিরোশিমার শান্তি উদ্যানে ভোরের আলোর আগে। শান্তি বেদ্যা শিল্পী পিকাসোর আঁকা শান্তি কপোতের প্রতীক হিসাবে ঝাঁকে ঝাঁকে কপোত উড়িয়ে দেওয়া হয় নীল আকাশে। ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট সকাল সোয়া আটটায় হিরোশিমায় বর্ষিত হয়েছিল পরমাণু বোমা। ৩৭ বছর পর সেই ৬ আগস্ট সোয়া আটটায় হিরোশিমার বেজে উঠে যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির ঘন্টা ধ্বনী। নীরবে সুরু হয় পরমাণু বোমায় নিহত হতভাগাদের স্মরনে প্রার্থনা সভা। প্রার্থনা সভার পর ঘৃনা ও ধিক্কারে আপ্লুত নিস্তব্ধ সমাবেশের সামনে দাড়িয়ে হিরোশিমার মেয়র তাকেসি আয়াকি সমবেত জনতার পক্ষ থেকে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রস্তাবটী হল পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী রাষ্ট্রনেতা ও অন্যান্য রাষ্ট্রনেতাদের আমরা হিরোশিমা সফরে আসতে আহবান জানাই, সরেজমিনে এসে তাঁরা উপলব্ধি করুন মহাবিপর্যয়ের প্রকৃতি। পরমাণু বোমার প্রথম পরীক্ষাস্থল এই হিরোশিমাতে অনুষ্ঠিত হউক নিরস্ত্রীকরণ শীর্ষ সম্মেলন।

এবছরের হিরোশিমা দিবসের বিশেষ তাৎপর্য ইজরাইলের প্যালেস্তিনিদের ওপর বেইরুটে আধুনিক মরনাস্ত্র প্রয়োগের মহড়া দেখে হিরোশিমা ও নাগাসিকিতে ধ্বংসলীলা দেখেও শক্তিধর রাষ্ট্র পরমাণু বোমা নিষিদ্ধ করেন নাই বরং আরও শক্তিশালী ও বিধ্বংসী করার প্রয়াস চালাচ্ছেন। ৩৭ বছরে পরমাণু বোমার ধ্বংস ক্ষমতা বহুগুণবৃদ্ধি পেয়েছে, নতুনতর ভয়াবহ মরনাস্ত্র আবিষ্কৃত হতেছে। এখন তৈরী হতেছে চিরচরিত যুদ্ধাস্ত্র নয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অসাধারণ অগ্রগতি মানব কল্যাণে নিয়োগ না করে প্রয়োগ হতেছে পরমাণু নিউট্রন

হাইড্রজেন, রাসায়নিক বিষাক্ত বীজাণুবাহী বোমা ভ্যাকোরাম বোমা আন্তমহাদেশীয় মারণাস্ত্র ইত্যাদি নিত্য নতুন প্রচণ্ড বিধ্বংসী মরণাস্ত্র তৈরীর কৌশল আয়ত্বে। এই মরণাস্ত্রের মজুত স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠেছে।

লেবাননে আমেরিকার তৈরী ভ্যাগোরাম বোমার ভয়াবহ কার্যক্ষমতা প্রমানিত হয়েছে ইজরাইলী বাহিনীর কৃপায়। পশ্চিম এশিয়ার সুরম্যনগর লেবাননের রাজধানী বেইরুট। আমেরিকার দেওয়া ইজরাইলী ভ্যাগোরাম বোমা বেইরুটের দাত তালা দশ তলাবাড়ী তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ছে। এই বোমার কার্যকারিতা পরীক্ষার জন্যই আমেরিকা ইজরাইলকে তা ব্যবহার করতে দিয়েছে। মার্কিন কংগ্রেসের এক প্রতিনিধি দল এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন। আশ্চর্যের বিষয় সারা পৃথিবী এতবড় ধ্বংস ও বিপর্যয়ের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। প্রতিবাদ বা প্রতিবিধানের যা এদিক ওদিক থেকে উঠেছে তা অতি ক্ষীণ ও আন্তরিকতা বিহীন। কিন্তু বেইরুট বিধ্বস্ত হওয়ার চেয়েও বড় আশংকা প্রকাশ করা হয়েছে রাষ্ট্রসংঘের পর্যাবেক্ষক মহল থেকে। ভিয়েনা থেকে প্রচারিত ৭ আগস্টের খবর লেবাননে অবস্থানকারী রাষ্ট্রসংঘের কর্মকর্তারা বলেছেন পানীয় জল ও ঔষধের সরবরাহ অনিশ্চিত হয়ে পড়ায় বেইরুট শহরে যে কোন সময়ে কলেরা, টাইফয়েড ও আরও অনেক রোগ মহামারী হয়ে দেখা দিতে পারে। রাষ্ট্রসংঘের ত্রান ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা লেবাননের সাতটী শহর পর্যাবেক্ষণ করে বলেছেন ঐসব শহরের প্রায় সব শিশু পেটের অসুখে ভুগছে। ইজরাইলীরা বিদ্যুৎ ও জলের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার জন্যই শিশু, বৃদ্ধ ও অক্ষমদের মধ্যে নানা পেটের রোগ ছড়িয়ে পড়ছে। বেইরুট শহরে পশ্চিমাঞ্চলে পি, এল ও গেরিলারা অবরুদ্ধ হয়ে থাকায় সেই এলাকায় ইজরাইলীদের নিষ্ঠুর আচরণ বেশী। তাই অসামরিক ব্যক্তি অসহনীয় অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে শহরের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে বেইরুট শহরের অন্যান্য এলাকার স্বাভাবিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে।

এই অবস্থায়ও ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেগিন জানিয়ে দিয়েছেন শুধু বেইরুটই নয় সমগ্র লেবাননে একজনও পি এল ও গেরিলা থাকা পর্যন্ত ইজরাইলের বেইরুট অবরোধ সামান্যতম শিথিল হবে না। লেবানন ত্যাগ না করার জেদ বজায় রাখতে যদি সব পি, এল ও গেরিলা খতম হয় তাতেও ইজরায়েলের কিছু করার নাই। ক্ষুদ্র ইজরাইলের এই দম্ভ আমেরিকার প্রকাশ্য প্রশ্রয় ছাড়া কিছুতেই সম্ভব হত না। নিরাপত্তা পরিষদে গত ৭ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তাব এনেছিল লেবানন থেকে সৈন্য প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত ইজরাইলকে পৃথিবীর সব দেশ সব রকম অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ রাখুক। কিন্তু আমেরিকার ভেটোয় সেই প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। নিরপত্তা পরিষদের ১৫ সদস্যের মধ্যে শুধু আমেরিকা প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট দেয়। ভোট দেয়নি বৃটেন ও দুইটী দেশ। ফ্রান্স সোভিয়েত প্রস্তাব সমর্থন করে। এই থেকে বোঝা যায় ন্যাটো পরিবার আর সুখী পরিবার নেই। আরব দেশগুলির মধ্যে যারা আমেরিকার পক্ষে তারাও নীরব নয়। সবচেয়ে নির্ভরশীল মার্কিন মিত্র সৌদি-আরবও আমেরিকার নাম না করে বলেছে যে সব শক্তি ইজরাইলকে অস্ত্র দিয়ে সমর্থন জানিয়ে মদৎ দিতেছে আমরা তাদের নিন্দা করি।

অতলান্তিক তীর থেকে পারস্য উপসাগর

পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলি বিভিন্ন কারণে দুভাগ হলেও মরক্কো রাজা হাসান মরক্কোর ফেজ সহরে উত্তর আফ্রিকার ও পশ্চিম এশিয়ার আরব দেশগুলির যে বিদেশ মন্ত্রীর সম্মেলন ডাক দিয়েছেন তাতে বেশ সাড়া মিলেছে। ১০ আগস্ট মরক্কোর প্রতিনিধিরূপে মহম্মদ তাজি জানিয়েছেন আরব লিগের ১১টী দেশ এই সম্মেলনে যোগ দিবে। মিশরকে এই সম্মেলনে ডাকা হয় নাই কারণ ইজরাইলের সঙ্গে মিশর সতন্ত্রভাবে চুক্তি করায় তাকে আরবলীগ থেকে বহিস্কার করা হয়। সুদান মিশরের ইজরাইলী নীতি সমর্থন করায় সুদানও আরব লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত। কিন্তু দুইটী দেশই বর্তমানে সম্পূর্ণরূপে এই আরব গোষ্টির সঙ্গী।

গত নবেম্বরে ফেজ শহরে আরব শীর্ষ সম্মেলন হয়ে যায় কারণ সৌদি আরব ঐ সম্মেলনে ইজরাইলকে প্রস্তাব সত্য বলে মেনে নেবার প্রস্তাব এনেছিল। সে প্রস্তাব মেনে নেবার উপযোগী রাজনৈতিক পরিবেশ সেদিন ছিল না। কিন্তু এখন প্যালেস্তাইনের নেতা ইয়াসের আরাফৎ স্বয়ং ইজরাইলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবী পেশ করায় আরব দুনিয়ার রাজ নীতিতে এক নতুন রকমের মোড় নিয়েছে। ফেজ শীর্ষ সম্মেলনে যদি ইজরালকে মেনে নেবার প্রস্তাব অনুমোদিত হয় তা হলে মিশর ও সুদানও আরব লিগের অন্তর্ভুক্ত হবে। সুতরাং দেখা যায় আরব দুনিয়ার ১৩টী রাষ্ট্র এখন এক শিবিরে জোট বাঁধছে। এদের পিছনের শক্তি আমেরিকা হলেও প্যালেস্তিনিদের সমস্যা সমাধানে এই দেশগুলি আমেরিকাকে চাপ দিবে। অপর দিকে রইল আলজেরিয়া, লিবিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ইমেমেন আর সিরিয়া। সিরিয়া ইতিমধ্যে পি, এল, ও গেরিলাদের আশ্রয় দান সম্পর্কে তার পূর্বমত বদলিয়েছে। নিকোসিয়া সম্মেলনে সিরিয়ার বিদেশ মন্ত্রী বলেছিলেন কোন পি, এল, ও গেরিলাকে তাঁর দেশে স্থান দেওয়া সম্ভব হবে না। মার্কিন প্রতিনিধি ফিলিপ হবিবের মধ্যস্থতার পর সিরিয়া পি, এল, ও গেরিলাদের একটা বড় অংশকে স্থান দিতে সম্মত হয়েছে। পি, এল, ও গেরিলারা অন্য যে দেশগুলিতে স্থান পেয়েছে তারাও ফেজ শীর্ষ সম্মেলনের শরিক। কাজেই ফেজ শীর্ষ সম্মেলনের তৎপরতায় আরব রাষ্ট্রগুলির ঐক্যবদ্ধ দাবী আমেরিকার পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হবে না। মার্কিন প্রতিনিধি ফিলিপ হাবিব এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত যথাসম্ভব ইজরাইলের পক্ষে করার কৌশল করবে।

পি, এল, ও নেতা ইয়াসের আরাফৎ ইজরাইলের অস্তিত্ব মেনে নিয়ে প্যালেস্তাইন রাষ্ট্র গঠনের দাবী জানালেও পি, এল, ও ইজরাইলের নিকট আত্মসমর্পণ করে নাই, মরণজয়ী লড়াই করেই চলেছে। প্যালেস্তিনী মুক্তি যোদ্ধারা লেবাননের জনবলের সাহায্যে ও বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের সহযোগিতায় মৃত্যুর মুখে মুখে দাঁড়িয়ে যে প্রচণ্ড প্রতিরোধের লড়াই চালিয়েছে তাতে ইজরাইলও কম ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। সম্প্রতি এ, এফ, পি, এবং জনযুগ ত্যাগ এবং সিনহুয়ার মারফৎ বেইরুট যুদ্ধে ইজরাইলের ক্ষয় ক্ষতির সামান্য কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। এই সব সূত্রের খবর থেকে জানা যায় বেগিন-শারণ-চক্র আশা করেছিল সপ্তাহখানের মধ্যে তারা বেইরুট দখল করে লেবাননে খৃষ্টানদের সাহায্যে একটা তাঁবেদার সরকার বসিয়ে দিতে পারবে এবং পি, এল, ও র মূল ঘাঁটি চুরমার করে দিবে। সে হঠকারি প্রচেষ্টা ও সাধ তাদের সকল

হয়নি। সর্বাধুনিক মরণাস্ত্র সুসজ্জিত অকৃপণ ও অবাধ মার্কিন অস্ত্রশস্ত্র পরিপুষ্ট ইজরাইলী বাহিনী নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়ে দ্রুতবেগে বেইরুটের দিকে এগিয়ে আসছিল, গণহত্যার বিভীষিকায় সন্ত্রস্ত করে দিতে চেয়েছিল পি এল. ওকে। কিন্তু পি, এল, ও লেবাননের দেশ প্রেমিক যোদ্ধাদের পাশে নিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে থাকে হাজার হাজার শিশু নারী বৃদ্ধ ও তরুণদের মৃতদেহকে বারিকেডে রূপান্তরিত করে।

এই দেখে আন্তর্জাতিক এবং রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে ইজরাইল ও তার মুরুব্বি রেগন প্রশাসনের বিরুদ্ধে। এর পরিণতিতে রেগন সাহেব পর্যন্ত বেগিন সারণকে প্রকান্তে ধমক দিতে বাধ্য হয়েছেন তাদের বেপরোয়া মনোভাবের জন্য। জনযুগ জানিয়েছে সেনাবাহিনীকে কোথায় যুদ্ধ করতে পাঠান হচ্ছে ইজরাইলের উঁচু পর্যায়ের অফিসাররা ছাড়া আর কেউ জানত না। ইজরাইলী বাহিনীর সাধারণ সৈনিকরা যখন অনেক পরে জানতে পারলেন যে বর্বর হত্যাকাণ্ডের জন্যই তাদের বেইরুটে পাঠান হচ্ছে তখন তাদের মধ্যে অনেকেই শারণ চক্রের বিরুদ্ধে ধিক্কার ও বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার ইজরাইলী সৈন্যকে কোর্ট মার্শাল করা হয়েছে। ইজরাইলী সৈন্যদের বাবা মা-স্ত্রী সন্তানরা জেরুসালেমের পথে পথে বিক্ষোভ জানায়েছে। লেবানন থেকে তাদের প্রিয় স্বজনদের ফিরিয়ে আনার জন্য ইজরাইলের যুদ্ধ দপ্তরের যে জুলাইয়ের মাঝামাঝি পর্যন্ত ৩৭৭৪ জন সৈন্য নিহত হয়েছে বেইরুট প্রাঙ্গণে আহত হয়েছে ১২৩৯১ জন। হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশী জানায়েছে সিনহুয়া ও এ, এফ, পি, তাদের হিসাবে প্রায় হাজার এগারো ইজরাইলী সৈন্য নিহত হয়েছে।

জুলাইয়ের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত ইজরাইলের ১২০টী ট্যাঙ্ক, ৬৭টী জঙ্গী বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে। জনযুগের রিপোর্ট অনুসারে এই যুদ্ধে জুলাই মাস পর্যন্ত ইজরাইলের শ দুই ট্যাঙ্ক, শতাধিক জঙ্গী বিমান এবং ১৮ টী জঙ্গী বোট ধ্বংস হয়েছে। এই যুদ্ধে ইজরাইলের অর্থনীতির ওপর ও এসেছে প্রচণ্ড আঘাত। যুদ্ধ যত দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ইজরাইলের ক্ষতি হচ্ছে তত বেশী। সৈন্য বাহিনীতে নিয়োগের মারফৎ বেকারি সমস্যার সাময়িক সমাধান করা গেছে বটে কিন্তু বাড়তি খরচের ব্যবস্থা কি করে হবে। লেবানন যুদ্ধের আগেই ইজরাইলের অর্থনীতিতে মুদ্রাস্ফীতির হার ছিল ২৮·৪ শতাংশ, ৭০/৭৫ দিনের যুদ্ধের ফলে এই হার উঠেছে ৪১ শতাংশেরও বেশী। নিরাপত্তার জন্য ইজরাইলীদের কাছ থেকে বাড়তি কর আদায় করা হয়েছে আরও বেশী ইজরাইলের অধিবাসী আরবদের কাছ থেকে। নির্ধারিত কর দিতে ব্যর্থ হলে বিষয় সম্পত্তি ক্রোক করা হচ্ছে।

এদিকে দেশের বাইরে থেকে বিশেষ করে আমেরিকা থেকে বিত্তশালী ইহুদী শিল্পপতিদের কাছ থেকে সাহায্যের পরিমাণও কমে যেতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইহুদীদের মধ্যেও বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে। বিক্ষোভ ইজরাইলের খোদ ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেও। বেগিন-শারণ বিরোধ এখন তুঙ্গে। বিরোধী দলগুলি এই সঙ্কটজনক পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য সোজাসুজি বেগিন-শারণ চক্রকে দায়ী করে প্রায় প্রতিদিন জেরুজালেমের পথে পথে বিক্ষোভ মিছিল বার করছে। উগ্র-জাতীয়তাবাদের ভাঁওতা দিয়েও ইজরাইলের বিদ্রোহী তরুণদের ভুলান যায় নাই। তারা যুদ্ধ

বিরোধী মিছিল বার করছে, বিক্ষোভ প্রকাশ করছে মার্কিন দূতাবাসে গিয়ে। ইতিমধ্যে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে ৪৮ হাজার ইহুদীকে জেলে আটক করা হয়েছে। যুদ্ধাভিযান এবং দেশের অভ্যন্তরে অত্যাচার যত বাড়ছে ততই বাড়ছে বিক্ষোভ। তবুও বেগন-শারণ প্রশাসনের দম্ভ ও হুমকি কমেনি।

একদিকে আরব দেশগুলি, সোভিয়েত ইউনিয়ান এবং বৃটেন ছাড়া অন্যান্য পশ্চিমী দেশসমূহের সহানুভূতি ও আন্তরিক সমর্থনে পি. এল, ও'র মরণজয়ী সংগ্রাম অন্যদিকে ইজরাইলের সৈন্যবাহিনীতে ও জনগণের মধ্যে বিক্ষোভের মুখে বেগন শারণ প্রশাসন বেশীদিন লড়াই চালাতে পারবে না আমেরিকা বুঝেছে এবং এই বিরোধের মীমাংসার সূত্র খুঁজছে। পরিস্থিতি যা তাতে বিরোধের মীমাংসা না হলে কোন পক্ষেরই অন্যপথ নেই।

পি, এল, ও পরাজয় স্বীকার না করলেও রাষ্ট্রসংঘের চাপে রাষ্ট্রসংঘের তত্ত্বাবধায়ক ফৌজের ব্যবস্থাপনায় অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হল। ওদের বিভিন্ন আরব দেশগুলিতে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। পি, এল, ও নেতা আরাফতের স্থান হল তিউনিসিয়ায়। পরের ইতিহাস এখনও অনিশ্চিত হলেও বেগন-বেগন চক্র প্যালেস্তিনীদের বস-বাসের স্থায়ী স্থান করে দিতে হবে ওদের রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

এই লড়ায়ের মধ্য দিয়ে আমেরিকার যে চরিত্রের প্রকাশ পেয়েছে তা হল সাম্রাজ্যবাদী লালসা চরিতার্থ করার জন্য আনবিক বোমা অথবা যে কোন ধরণের মানব-বিধ্বংসী বোমা প্রয়োগ করতে দ্বিধা করবে না। আমেরিকা প্রশাসনের এই মনোবৃত্তির বিরুদ্ধে সারা দুনিয়ার মানুষ নীরব দর্শক হলে মানবজাতির ধ্বংস অনিবার্য্য। ছোট বড় সমস্ত রাষ্ট্রের একযোগে আমেরিকা প্রশাসনকে পরমাণু বোমা ও আধুনিক মানবধ্বংসী বোমা ব্যবহার ও তৈরী নিষিদ্ধ করার দাবী তুলতে হবে। সোভিয়েত কে এর সামিল হতে হবে।

গত ৬ আগষ্ট হিরোশিমা দিবসে দেশ-দেশান্তরের প্রায় লক্ষ মানুষের শপথ সারা দুনিয়ার মানুষের শপথে পরিণত করতে হবে। আমেরিকা প্রশাসনের মানবসভ্যতা ধ্বংসের রাজনীতি ও প্রস্তুতি রুখতে হবে।

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

"রাষ্ট্রপতির শাসনের এই যে কার্যসূচী [illegible] সামগ্রিক উন্নয়নের গোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কোন ক্ষেত্রে কতটা জোর দিয়ে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সম্ভব হবে উন্নয়ন এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দলে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী বাস্তবায়ন প্রত্যেকের স্বার্থে, আমাদের দেশের স্বার্থে, এ দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সমৃদ্ধ আমরা করতে চাই, সেবা করতে চাই, গড়া তুলতে চাই।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

davp 82/208

বৈপ্লবিক সাহিত্যের অধোগতি

—বীরেণ দে

স্বাধীনোত্তর ভারত তথা পশ্চিম বাংলায় গত ২৫ বৎসর ধরে 'বিপ্লবী বাংলা' স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দেশ সেবার আদর্শকে সাহিত্যের মাধ্যমে বহন করে নিয়ে চলেছে। অতি উত্তম কথা। কিন্তু সংগ্রামীদের কর্তব্য নির্ধারণ ও কর্ম সম্পাদনের নির্দেশ ও পরিকল্পনায় বৈপ্লবিক সাহিত্য কতটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে তার হিসাব-নিকাশের দিন আজ সমুপস্থিত। বিপ্লবী লেখক সম্প্রদায়ের এ বিষয় অবহিত ও সংগঠিত হওয়া সময়োচিত বলে বিবেচিত হয়।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যেই রাজনৈতিক স্বাধীনতা আবশ্যক। সুতরাং স্বাধীনতা লাভের পর সেই উদ্দেশ্য সাধনের দিকেই কর্মীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া দরকার। কেননা রাজনৈতিক তৎপরতা তখন পরিবর্তিত এবং দেশ ও সমাজগঠনের কাজে পরিবর্ধিত। তার জন্যই কর্মীদের নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করা সমিচীন। স্বরাজলাভের মধ্যেই স্বাধীনতার মৌলিক ভিত বর্তমান। কিন্তু আমরা দেখছি কি, 'এই আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে সেদিন যারা চীৎকার করে দেশের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়েছে। তারাও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আজাদী আচ্ছা হ্যায় স্বীকৃতির ফলে অনেকেই ক্ষমতাশীলদের ন্যায় বিত্তবান ও খ্যাতিমান হচ্ছেন। বস্তুত নীতি বা আদর্শের কথা একটা ভাঁওতা মাত্র, উদ্দেশ্য ক্ষমতালাভ। এই ক্ষমতালাভকেই যখন পবিত্র বলে গ্রহণ করা হয় এবং ভাঁওতার অবিশ্রম্ভাবী পরিণতি অন্তর্দ্বন্দ্বের কদর্যতায় আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাকে বলা হয় অপচিকীর্ষা, জনকল্যাণকে ব্যাহত করবার জন্য স্বার্থান্বেষীদের চক্রান্ত। বর্তমান রাজনীতির বিশেষ করে আমাদের দেশে ইহাই প্রচলিত চরিত্র। যদিও অন্য কোন দেশ বা জাতির ক্ষেত্রে আজ তা ব্যতিক্রম নয়। অবশ্য আমাদের কথা বিপরীত বিষয়ে আলোচিত।

বৈপ্লবিক সাহিত্যই যদি বৈপ্লবিক চরিত্র গঠনের হাতিয়ার তা হ'লে স্বাধীনোত্তর কালে তার অবহেলা কেন! শুধু কি প্রাকস্বাধীনতা যুগের ঘটনাবলির এলোমেলো ইতিহাস রচনায় দেশগঠনের উপযোগী বৈপ্লবিক চরিত্র গঠিত হবে? এই অবসরে কিন্তু মার্কসীয় সাহিত্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা সুদূর প্রসারিত ও ব্যাপক প্রচারিত হয়ে চলেছে। জাতীয় বুদ্ধিমত্তার এই অনীহা বড়ই করুণ। সেইজন্যই স্বামিজী থেকে আরম্ভ করে রাসবিহারী, নেতাজী প্রমুখ মনীষী ও নেতৃগণ এ বিষয়ে আক্ষেপ করেছেন। হায়, সবেধন নীলমণি 'বিপ্লবী বাংলা' সাহিত্য-ইতিহাস মিলিয়ে তাও নব কলেবরে মশালটি জ্বালিয়ে রেখেছে মাত্র। বড়ই দুর্ভাগ্য যে বিপ্লববাদী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা এই গুরুতর বিষয়ে তেমন মনোনিবেশ করেন নি।

উপায় স্বামিজী বাতলে দিয়ে গেছেন। তিনি আমেরিকা থেকে আলাসিঙ্গাকে ৬ই মে ১৮৯৫ সালে লেখেন— এখন তোমাদের কাছে আমার নূতন আবিষ্কারের কথা বলছি। ধর্মের যা কিছু সব বেদান্তের মধ্যেই আছে, অর্থাৎ বেদান্তদর্শনের দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত—এই তিনটি স্তরে আছে, একটির পর একটি এসে থাকে। এই তিনটি

মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির তিনটি ভূমিকা। এদের প্রত্যেকটিরই প্রয়োজন আছে। এই হ'ল ধর্মের সার কথা। ভারতের বিভিন্ন জাতির আচার ব্যবহার মত ও বিশ্বাসে প্রয়োগের ফলে বেদান্ত যে রূপ নিয়েছে, সেইটি হচ্ছে হিন্দুধর্ম ; এর প্রথম স্তর অর্থাৎ দ্বৈতবাদ—ইওরোপীয় জাতিগুলির ভাবের ভেতর দিয়ে দাঁড়িয়েছে খ্রীষ্টধর্ম, আর সেমেটিক (Semitic—ইহুদী, আরব প্রভৃতি) জাতিদের ভেতর হয়ে দাঁড়িয়েছে মুসলমান ধর্ম; অদ্বৈতবাদ উহার যোগানুভূতির আকারে হয়ে দাঁড়িয়েছে বৌদ্ধধর্ম প্রভৃতি। এখন ধর্ম বলতে বুঝায় বেদান্ত। বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রয়োজন, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে তার প্রয়োগ অবশ্যই বিভিন্ন হবে। (বাণী ও রচনা ৭ম খণ্ড; ৩য় সংস্করণ, পৃ: ১৫৭)। এই প্রসঙ্গে তিনি দেখান যে, মূল দার্শনিক তত্ত্ব যদিও এক, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিশেষ ধর্মমত ও অনুষ্ঠানপদ্ধতির ভেতর তাকে রূপায়িত করে নিয়েছে। তিনি পরামর্শ দেন যে, ঐ তিনবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে ওদের মধ্যে একটি অপরটির পর আসে, এইভাবে সামঞ্জস্য দেখাতে ও আনুষ্ঠানিক ভাবটা একেবারে বাদ দিতে বলেন, লোকে তাদের বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপাদিতে লাগিয়ে নিবে। বৈপ্লবিক সাহিত্যের এটাই তো মূল কথা। আমরা স্বামিজীকে উপেক্ষা করেছি।

তিনি ইওরোপীয় সমাজতন্ত্রিকতা ও সাম্যবাদের উত্তরে অদ্বৈত-বেদান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন—প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে অদ্বৈতবেদান্তকে তাহার ভিত্তিরূপ মানিয়া লইতে হইবে, আর সে সাম্য স্থাপনের উপায় হইবে উচ্চস্তরের মানবকে নিম্নগামী করিয়া নহে, প্রত্যুত নিম্নবর্তী সকলকে উন্নত করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা ও সংস্কৃতির অধিকতর প্রসারের ব্যবস্থা করিয়া। ... পাপ কিছু মানুষের মজ্জাগত নহে, উহা আগন্তুক মানসিক বস্তু। অদ্বৈত বাদ আকাশের ন্যায় বিশাল ও উদার আবার সমুদ্রের ন্যায় গভীর ও অনুভূতি রসপূর্ণ। এই অদ্বৈতবাদ অবলম্বনেই নৈতিকতা বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি যত কিছু উত্তম ভাব আছে সমস্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। বেদান্ত মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি করে, একত্ব ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত করে, জগতে শান্তি স্থাপন করে।

(যুগনায়ক বিবেকানন্দ, পৃ: ৩৪৪-৪৬)

কামনা করি এই বাণীই বিপ্লবী বাংলার সাহিত্যে সুবর্ণ জয়ন্তী কালের উদাত্ত আহ্বান হোক।

বঙ্গ সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাসে— দশবর্ষ পূর্তি ঃ—

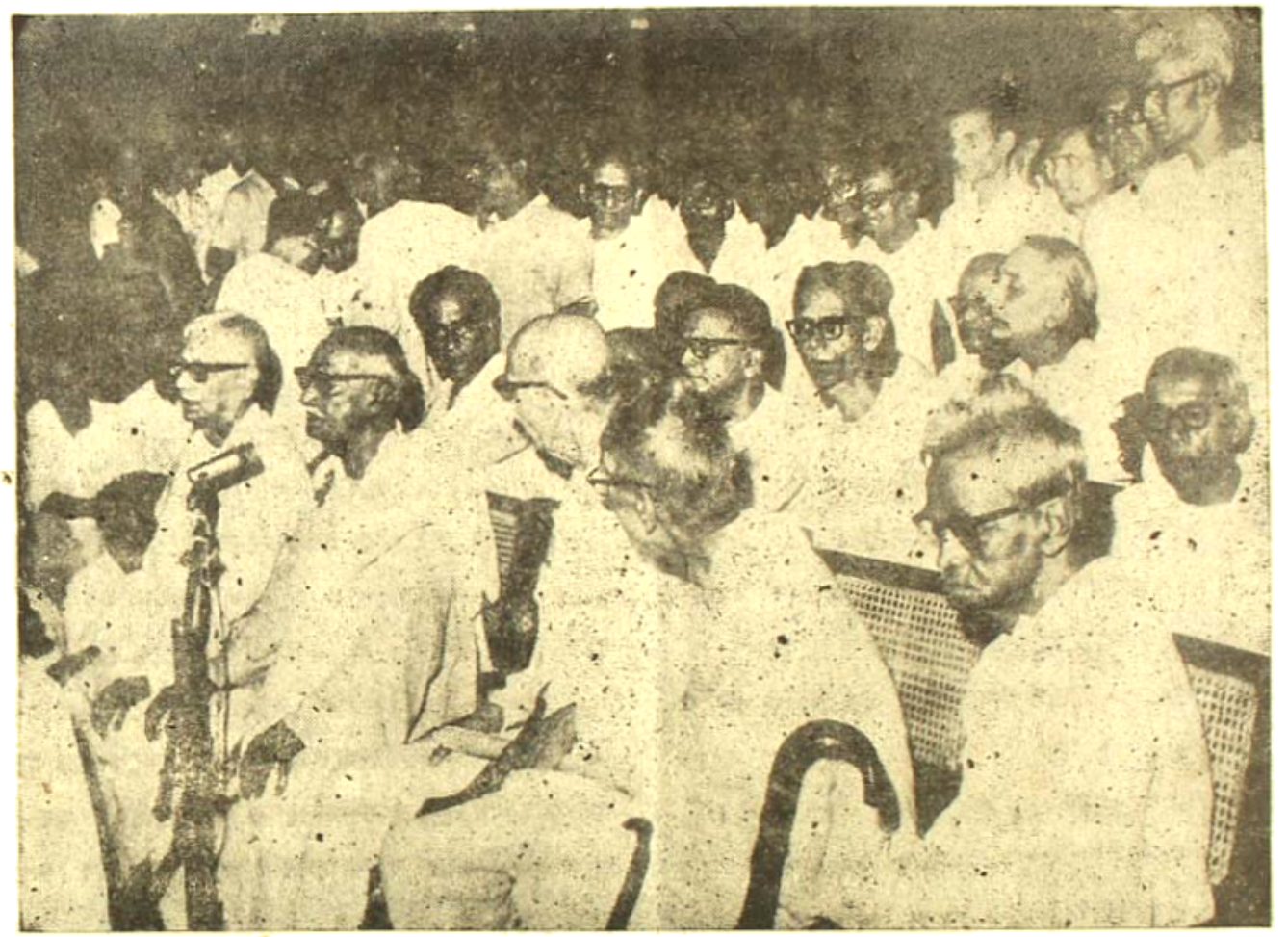

১৯৭২ সালের এইদিনে স্বাধীন বাংলার বিপ্লব তাপস মহারাজ ত্রৈলক্য চক্রবর্ত্তীর সম্বর্ধনা সভার মুক্তদৃশ্য। চিত্রে সভাপতি ভূপতি মজুমদার, ত্রৈলক্য মহারাজ ভাষণরত, নলিনী কিশোর গুহ, হেম চন্দ্র ঘোষ; সর্বশ্রী শিবনাথ ব্যানার্জি, ডাঃ ভূপাল বসু, সম্পাদক বীরেন দে, সৌমেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোরঞ্জন গুপ্ত ও ত্রিগুনা সেন। বিপ্লবী বাঙ্গালীর এই প্রতিকৃতির পরিকৃত সপ্তর্ষিমণ্ডল।

['বিপ্লবী বাঙ্গালীর জন্মলয় থেকে সম্পর্কিত শ্রীবীরেন দের সৌজন্যে সংগৃহিত]

স্বাধীনতা আন্দোলনের বর্ষপঞ্জী

১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ। বৃটিশ শাসনের গোড়া পত্তন। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

১৭৫৯—জুলাই : গভর্ণর হলওয়েলকে লিখছেন মেজর ওয়াট্‌স্‌ বর্ধমান থেকে, এখানকার ৫০০০ প্রজা বিদ্রোহ করেছে। তারা কোম্পানীর কোষাগার দখলের চেষ্টা করেছিল।

১৭৬০—বীরভূমের জমিদার আসাদ জামানখান বিদ্রোহ করেন। বর্ধমানের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে বিদ্রোহী বাহিনী মুর্শিদাবাদের দিকে অগ্রসর হয়।

১৭৬১—জানুয়ারী, মেজর ওয়াট্‌স্‌ এবং হোয়াটারের নিকট আসাদ পরাজিত।

১৭৬৪—কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট গভর্ণর ভ্যান্সিটার্টের পত্র "খাজনা আদায়ের ব্যাপারে মেদিনীপুরের জমিদারগণ আমাদের প্রবল বাধা দিচ্ছে। আমাদের শত্রুদের সঙ্গে মিলে তাঁরা বিদ্রোহ করছে। স্থানীয় অধিবাসীরা তাদের পক্ষে।

১৭৬৫—নদীয়ার রাজা কর দেওয়া বন্ধ করেন। কোম্পানীর এজেন্ট মিঃ লিউক প্রস্তাব করেন, রাজার জাতি নাশ করে কর আদায় করা হউক।

১৭৬৫—ঘাটশীলার রাজার বিদ্রোহ। বাড়গ্রামের রাজারা তার সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। বিদ্রোহ দমনে লেফটেনাণ্ট ফাগুর্সন প্রেরিত। ঘাটশীলার রাজা বললেন, "আমার রাজ্যে আমি ফিরিঙ্গিদের প্রবেশ করতে দেব না।"

১৭৬৭—২রা মার্চ, প্রবল বাধাদানের পরে ঘাটশীলার পতন।

১৭৬৮—ঘাটশীলার সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি। পূর্ব্ব রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র জগন্নাথ ধল নূতন রাজা। তিনি কর দেওয়া বন্ধ করলেন।

১৭৬৮—জুন, জেনারেল কুক এবং ক্যাপ্টেন মর্গাণ ঘাটশীলা আক্রমণ করেন। প্রজারা সকলে রাজার পক্ষে যুদ্ধ করে। জেনেরল "গণ" কলকাতায় লিখছেন "শত্রুসৈন্য ভীমরুলের ঝাঁকের মত হানা দিয়েছে।"

১৭৭৪—শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজ কর্তৃপক্ষ জগন্নাথকেই রাজা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

১৭৭১-৮৪—মানভূমে চুয়াড় বিদ্রোহ। বিদ্রোহী নেতা সুবল সিংহকে দমনের জন্য ক্যাপ্টেন কার্টামর লেফটেনাণ্ট "গণ" ও লেফটেনাণ্ট ইয়ং এবং মেজর একোর্ডের চেষ্টা। ১৭৮৪ সাল পর্য্যন্ত বিদ্রোহ চলে।

১৭৮৩ ১৮ই জানুয়ারী রংপুর বিদ্রোহ কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট মিঃ হল্যাণ্ডের পত্র—"বিভিন্ন অঞ্চলের প্রজাগণ সমবেত হয়ে তেপা নামক স্থানে দীর্জ্জেনারায়ণকে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে আপনাদের রাজা বলে নির্ব্বাচিত করেছে।"

১৭৮৪—২রা এপ্রিল, বড়লাট ওয়ারেন হেষ্টিংস কোম্পানীর নিকট লিখলেন "বঙ্গার থেকে বারানসী পর্য্যন্ত আমি শুধু জনসাধারণের অসন্তোষের গুঞ্জনই শুনেছি। পরিপূর্ণ ধ্বংসের ছবি ছাড়া আর কিছুই দেখছি না।"

১৭৮৪—কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট হেষ্টিংসের কাউন্সিলরদের পত্র "দেশের সত্যিকার অবস্থা আর গোপন করা চলে না। কোম্পানীর কর্ম্মচারীদের অসদাচরণের জন্য এই সমৃদ্ধ ও ঐশ্বর্য্যপূর্ণ রাজ্য ধ্বংস ও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছে।"

১৭৮৭—শ্রীহট্টের রাজা রাধা রায়ের বিদ্রোহ।

১৭৮৯—বিষ্ণুপুরের রাজা প্রজার মিলিত বিদ্রোহ।

১৭৯৯—অযোধ্যার নবাব ওয়াজীর আলির বিদ্রোহ। ঢাকার নবাব এবং মুর্শিদাবাদের নবাব বিদ্রোহের সামিল। বিদ্রোহে সাহায্য করার অপরাধে সারনাথের জগৎ সিংহ এবং বারানসীর শিবদেবের ফাঁসী।

১৮০৮—১২—বুন্দেল খণ্ডে বিদ্রোহ।

১৮১০—৯১—বারানসীতে কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন।

১৮১৭—১৮—উড়িষ্যায় পাই বিদ্রোহ।

১৮২৯—৩৩—আসামে খাসিয়া বিদ্রোহ।

১৮৩২—মানভূমে বিদ্রোহ।

১৭৮০—১৮২০—বিক্ষিপ্ত গণবিদ্রোহ, বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ও খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহে-ঝাড়গ্রাম, বিষ্ণুপুর, কণগড়, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ বরকন্দাজ বিদ্রোহ, পিণ্ডারী যুদ্ধ, তিতুমীরের বিদ্রোহ নীলকর বিদ্রোহ এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ।

১৮২৭—বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে শিক্ষিত যুবক শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ। জুরী আইন পাশ—বিধান খ্রীষ্টান জুরী হিন্দু মুসলমান অপরাধী সম্পর্কে অভিমত জ্ঞাপন করতে পারবে কিন্তু খ্রীষ্টান অপরাধী সম্পর্কে হিন্দু মুসলমান জুরী অভিমত জানাতে পারবে না।

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন রামমোহন তিনি বললেন, "রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে এ বৈষম্য মেনে নেওয়া হিন্দু মুসলমানের পক্ষে অসম্ভব। বৈষম্য যদি চলতে থাকে, তবে ইউরোপীয় জ্ঞানলাভের ফলে শতবর্ষ পরে হলেও এমন একদিন আসবে, যখন ভারতবাসী একযোগে এই অন্যায়ের ও গর্হিত আইনগুলির বিরুদ্ধে লড়বে। এবং সে লড়াইএ তারা জয়যুক্ত হবে। ভারতবর্ষ আয়ার্ল্যাণ্ড নয় যে দুই-চারখানা রণতরীতে সৈন্য পাঠিয়েই তাদের সায়েস্তা করা যাবে"। ডিরোজিও কর্তৃক নব্য ভাবধারা প্রচার। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার আদর্শে উৎসাহদান। "ফকির অব জাঙ্গিরা" ইংরেজী কাব্য প্রকাশ।

স্বদেশ আমার। কিবা জ্যোতির মণ্ডলী
চুম্বিত ললাট তব। অস্তে গেছে চলি
সেদিন তোমার হায়, সেই দিন যবে।
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে।

ইংরেজী থেকে বাংলা অনুবাদ করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ডিরোজিও শিষ্যবৃন্দ, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ সিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, হরচন্দ্র ঘোষ—সত্যানুসন্ধিৎসা ও পাপের প্রতি ঘৃণার আদর্শ প্রচার।

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, বাঙ্গালীকে যাহারা স্বদেশ প্রেম শিখাইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ অন্যতম।

১৮৩০—রামমোহনের বিলাত যাত্রা। যাত্রাপথে উত্তমাশা অন্তরীপ পৌঁছেই ফরাসী জাহাজে দেখলেন ফরাসী বিপ্লবের ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা। ভাঙ্গা পা নিয়ে গিয়ে অভিবাদন করলেন।

কলিকাতায় মনুমেণ্টের পাদদেশে রামমোহনের উদ্যোগে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত ফরাসী বিপ্লবের পতাকা উত্তোলন। বাস্তিল দিবস উদযাপন। এই আদর্শেই জাতীয় কংগ্রেসের পতাকা এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা পরিকল্পনা করা হয়।

১৮৩৩—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নূতন সনদ। কোম্পানীর ঋণ ভারতের স্কন্ধে চাপানো হল। সভ্যতা বিস্তারের নামে খৃষ্টান মিশনারীদের হাতে ভারতীয় রাজস্ব থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য অর্থ অর্জন করার ব্যবস্থা হল।

১৮৩৫—২রা জানুয়ারী কলকাতার টাউন হলে প্রথম প্রতিবাদ সভা। রসিককৃষ্ণ মল্লিক বললেন, এই আইন ভারতবাসীর উপকারের জন্য বিধিবদ্ধ হয় নি, কোম্পানীর অংশীদার এবং ইংরেজজাতির উপকারের জন্যই এরূপ আইন করা হয়েছে। কোম্পানীর ব্যবসাগত ঋণের বোঝা ভারতীয় রাজস্বের উপর চাপানোকে আমি সম্পূর্ণ অসঙ্গত মনে করি। আইনে এই মর্মে বলা হয়েছে যে, বড়লাট ইচ্ছা করলে, বিলাতের কর্তাদের অনুমতি নিয়ে চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড ব্যতিরেকে অন্যান্য যাজক সম্প্রদায়কেও এ দেশীয়দের খৃষ্টতত্ত্ব শেখাবার জন্য এবং গির্জাদি নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্য করতে পারবেন। এর দ্বারা কি এই কথাই স্পষ্ট বুঝায় না যে, ভারতবাসীদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে তা এমন একটি খাতে তাদের শিক্ষা দানে ব্যয়িত হবে যে ধর্মকে তারা মোক্ষলাভের পক্ষে সম্পূর্ণ ক্ষতিকর বলে মনে করেন। একি ন্যায্য? একি সঙ্গত? বড়লাটের অবাধ ক্ষমতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মিঃ ডিকেন্স আপনাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন, ইংল্যাণ্ডের আগেকার দিনের সর্বাপেক্ষা স্বেচ্ছাচারী রাজার চেয়েও ইনি ক্ষমতাশালী। তাঁর ক্ষমতা সংযত করার উপায় কি?

১৮৩৫—১৫ই সেপ্‌টেম্বর বড়লাট স্যার মেট্‌কাফ্ মুদ্রাযন্ত্র আইন জারী করে মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দেন।

১৮৩৬—প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির উদ্যোগে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান "বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা" প্রতিষ্ঠা। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর পত্রিকা এই সময়ে প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশে দেশাত্মবোধের উন্মেষে সংবাদ প্রভাকরের দান অসামান্য।

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া।

১৮৩৮—তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাঁদ মিত্র রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির উদ্যোগে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রতিষ্ঠিত।

১৮৪২—এপ্রিল "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত। সংবাদপত্র দ্বারা নিঃস্বার্থ দেশ সেবার প্রথম প্রচেষ্টা।

১৮৪৩—৮ই ফেব্রুয়ারী: জ্ঞানোপার্জিকা সভার অধিবেশনে দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ফৌজদারী আদালত এবং পুলিশ সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ। প্রবন্ধ পাঠ কালেই হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ডসন মন্তব্য করলেন কলেজ ভবনকে আমি রাজদ্রোহের আস্তানায় পরিণত হতে দিব না। ফ্রেণ্ড ইণ্ডিয়া পড়ে States-man পত্রিকা লিখল এরূপ রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা বাটাভিয়া বা যবদ্বীপে দিলে বক্তাকে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হত।

১৮৪৩—২০শে এপ্রিল "বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজ ও ভারতীয়দের যৌথ প্রতিষ্ঠান।

১৮৪৯—বড়লাটের আইন সচিব জন ড্রিঙ্ক ওয়াটার বীটন (বেথুন সাহেব) কর্তৃক মফঃস্বলে ইউরোপীয়দিগকে আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে আনয়নের জন্য নূতন আইন প্রণয়ন, উদ্দেশ্য—ইউরোপীয়দের অধিকারের সীমানা নির্দেশ এবং সরকারী কর্মচারী-দের সংরক্ষণ। অধিকার সংকোচের আভাসে এদেশীয় ইউরোপীয় সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায়, তারা নূতন আইনের নাম দিল ব্ল্যাক এ্যাক্ট (Blakc Act) বা

কালো আইন। প্রতিবাদের ফলে আইন বিধিবদ্ধ হইল না।

নীলকর আন্দোলন অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি।

১৮৫৬—যশোহরে বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস এবং দিগম্বর বিশ্বাস দুই ভাই-এর নেতৃত্বে ৫০ লক্ষ চাষী এক-যোগে নীল চাষ বন্ধ করল। হরিশ্চন্দ্র নীলকরদের দুষ্কৃত দুর্দশার কথা জনসমক্ষে প্রচার করেন। অক্ষয় কুমার দত্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রচার করতে থাকেন। ফলে নীল কমিশন বসল এবং নীলচাষ বন্ধ হল।

১৮৫০—৬৬—নীলকর আন্দোলনের সময়। ১৮৬১ সালে হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী কবিতায় তারা দুঃখ প্রকাশ করল।

নীলকরে সোনার বাংলা করাল এবার ছারেখার।

অসময়ে হরিশ মরল লঙ এর হল কারাগার।

১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ। ব্যারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসী, দুই বৎসর ধরে ইংরেজের সঙ্গে সংগ্রাম।

১৮৫৮—রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মিনী কাব্য প্রকাশ।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়
হে কে বাঁচিতে চায়
দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়
হে কে পরিবে পায়।

১৮৬০—দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ প্রকাশ। মেঘনাথ বধ প্রকাশ।

১৮৬১—জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা। সুপ্রভাত, সুরজনী প্রভৃতি দ্বারা সন্তাষণ আরম্ভ। নব্যদলে বাংলা কথনকালে ইংরেজী কথা উচ্চারণ নিষিদ্ধ হল। অমান্যে ১ পয়সা অর্থ দণ্ড। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি। সাহিত্যের বিকাশ। সঙ্গীত অনুশীলন, দেশীয় কুস্তী প্রভৃতির পুনর্বিকাশ।

১৮৬২—১৮ই জানুয়ারী বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদ গঠিত।

১৮৬৪—বঙ্কিম সাহিত্যের আবির্ভাব।

১৮৬৭—হিন্দুমেলা ঠাকুর বাড়ীর উদ্যোগে। কলিকাতার বেলগাছিয়া পাতিপুকুরে প্রথম অধি-বেশন। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক প্রথম জাতীয় সঙ্গীতের পরিকল্পনা—"মিলে সব ভারত সন্তান এক তান এক প্রাণ গাও ভারতের যশো গান"।

হিন্দু জাতিকে এক করা এবং ভারতীয়দের সর্বতোভাবে আত্মনির্ভর করা ছিল হিন্দু মেলার উদ্দেশ্যে মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর এর উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলেন 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে। কোন বিষয় সুখের জন্য নহে। কোন আমোদপ্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য ইহা ভারতভূমির জন্য।' এই অধিবেশনেই নাট্যকার মনমোহন বসু বলেন, ভারত-বাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি। তাঁদের সামাজিক উন্নতি, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য প্রভৃ-তির, উন্নতি মেলার লক্ষ্য। আর এ সকলের লক্ষ্য রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ।

১৮৭০—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারত সঙ্গীত প্রথম প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের এডুকেশন গেজেট পত্রিকায়।

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে
সবাই স্বাধীন এই বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

কবি এই কবিতায় ভারতের পরাধীনতার মুক্তির উপায়ও বলে দিলেন।

দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না হবে না, খোল তরবার।
এই সব দৈত্য নহে তেমন
তূণীর কৃপাণে করগে পূজা।

১৮৭২—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সিভিল সার্ভিস থেকে বিতাড়িত।

১৮৭৬—ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথম গুপ্ত সমিতি। সঞ্জীবনী সভা প্রতিষ্ঠিত। গুপ্ত সাংকেতিক ভাষায় নাম হাফ্ পামু হাফ। সভাপতি রাজনারায়ণ বসু। সভা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্তৃক ম্যাটসিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী প্রকাশিত। I am avowed discipline of magazine সুরেন্দ্রনাথ।

১৮৭৭—অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা—দীক্ষাদাতা শিবনাথ শাস্ত্রী। দীক্ষিত—বিপিনচন্দ্র পাল, সুন্দরী মোহন দাস, তারা কিশোর রায় প্রভৃতি।

অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ করে বক্ষরক্তে স্বাক্ষর করে আজীবন স্বাধীনতার ব্রত পালনের অঙ্গীকার। লোকশিক্ষা প্রচারের ব্রত গ্রহণ। সরকারী চাকুরী গ্রহণ না করার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন বা রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বৃটিশ বিরোধী প্রকাশ্যে আন্দোলন। নূতন সিভিল সার্ভিস আইনের বিরোধীতা। সুরেন্দ্রনাথ সমগ্র উত্তর ভারত ভ্রমণ করে আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করেন। এরপর সুরেন্দ্রনাথের উদ্যোগে কলকাতায় সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সূচনা।

১৮৭০—৮০—ভারতীয় জীবনে এক কর্ম চাঞ্চল্যের যুগ। হেমচন্দ্রকে অনুসরণ করে বহু বঙ্গ কবি ও নাট্যকার ভারতমাতার দুর্দশার কাহিনী ছন্দে এবং কথায় গ্রথিত করেন।

১৮৭৪—মনমোহন বসু লিখেছেন—

দিনের দিন সবে দীন, ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে জীর্ণ, চিন্তা জ্বরে জীর্ণ, অনশনে তনুক্ষীণ।

এলাহাবাদ প্রবাসী কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় গাইলেন—

কতকাল পরে বল ভারতরে
দুঃখসাগর সাঁতারী পার হবে?

১৮৭৫—'অবলাবান্ধব' দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বীর নারী প্রকাশিত হয়।

কবি গাইলেন— সোনার ভারত আজি যবনাধিকারে
ভারত সন্তান বক্ষ ভাসে অশ্রুধারে।

উপেন্দ্রনাথ দাস বিরচিত সুরেন্দ্র বিনোদিনী নাটকও প্রকাশিত হয়।

কবি গাইলেন—

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল।

১৮৭১—ওয়াহারী নেতা আবীর আমীর খাঁ তিন আইনে যাবজ্জীবন নির্বাসিত।

১৮৭২—বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন প্রকাশিত। বাঙ্গালীর মোহনিদ্রা ভঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'যতদিন দেশী বিদেশীতে বিজিত-জেতৃ সম্বন্ধ থাকবে ততদিন আমরা পূর্ব গৌরব মনে রাখিব। ততদিন জাতিবৈর সমতার সম্ভাবনা নাই। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি। এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিনী, অনন্ত রত্নভূষিকা এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভূজার দশভূজ দশদিকে প্রসারিত। এস ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে

ঝাঁপ দেই। এস আমরা দ্বাদশ-কোটী ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়]কোটী মাথায় বহিয়া ঘরে আনি।'

বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা। বরিশাল অতিরিক্ত ষড়যন্ত্র মামলা।

১৮৭৪—সে যুগের প্রসিদ্ধ লেখক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুবার্জীন ম্যাগাজিন' বিলাতী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেন। 'আসুন, বিলাতী দ্রব্য ক্রয় করব না এই সঙ্কল্প আমরা সকলে গ্রহণ করি। সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতবর্ষের উন্নতি ভারত-বাসীরই সাধ্য।'

১৮৭২—গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রভৃতির উদ্যোগে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত।

১৮৭৮ কাড়কের বিদ্রোহ। বাসুদেও বলবন্ত কাড়কে শিবাজীর অনুকরণে পার্বত্য জাতিদের সঙ্ঘ-বদ্ধ করে ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৮৮২—বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত। 'আমরা অন্য মা মানি না, দেশই আমাদের মা।'

১৮৮৫—জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা। প্রথম সভাপতি উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৮৮৬—কলকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধি-বেশন। সভাপতি দাদাভাই নৌরজী, রবীন্দ্রনাথ স্বরচিত গান গাইলেন—

আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
ঘরের হয়ে পরের মতন
ভাই ছেড়ে ভাই কদিন থাকে।

১৮৮৬—১৬ই আষাঢ় রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাপ্রয়াণ।

১৮৮৬-৯৩—স্বামী বিবেকানন্দের ভারত ভ্রমণ।

১৮৯৩—সেপটেম্বর : স্বামীজী শিকাগোতে বিশ্ব ধর্ম সভায় বক্তৃতা করেন।

১৮৯৬—স্বামীজীর কলকাতা প্রত্যাবর্তন।

১৮৯৩-৯৬ পাশ্চাত্য জগতে স্বামীজী কর্তৃক ভারত, ভারতীয়তা এবং হিন্দুধর্মের বিষয় ঘোষণা।

১৮৯২—মহারাষ্ট্রে সার্বজনীন গণপতি উৎসব।

১৮৯৫—শিবাজী উৎসব। চাপেকার সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা।

১৮৯৭—র‍্যাণ্ড এবং আয়ার্স্ট হত্যা। কলকাতায় আত্মোন্নতি সমিতি প্রতিষ্ঠা। চাপেকার ভ্রাতাদের ফাঁসী।

১৯০১—ডিসেম্বর : জাপানী মনীষী ওকাকুরা কলকাতায় আসেন। বৃটিশ বিরোধী সক্রিয় আন্দোলনকে উৎসাহ দান।

১৯০২—অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা, সভাপতি পি. মিত্র। উদ্যোক্তা ভগিনী নিবেদিতা, চিত্তরঞ্জন দাস, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বামীজীর দেহত্যাগ। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন করতে হবে। বিধাতার রুদ্রমূর্তিই আজ আমাদের পরিত্রাণ।

১৯০৩—সরলা দেবী কর্তৃক বীরাষ্টমী ব্রত প্রব-র্তন। ডিসেম্বর কলকাতা গেজেটে বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার প্রস্তাব।

১৯০৪—এই সালের প্রথম থেকে জল্পনা-কল্পনা। বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব এবং কার্জনের ইউনিভার্সিটি বিল নিয়ে আন্দোলন সুরু। রবীন্দ্রনাথ বললেন, বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে।

১৯০৫—২০শে জুলাই : সরকারী ঘোষণা বঙ্গভঙ্গ স্থির সিদ্ধান্ত। ১৬ই অক্টোবর বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হবে। ঐ দিনই রাখীবন্ধনের সিদ্ধান্ত। রবীন্দ্রনাথ

রাখীবন্ধনের সঙ্গীতে বাঙ্গালীর দুর্জয় সংকল্প প্রকাশিত হয়।

"ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে
মোদের বাঁধন টুটবে।"

"বাংলার মাটি বাংলার জল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান।"

"ও তোর মরা গাঙ্গে বান এসেছে
জয় মা বলে ভাসা তরী।"

১৯০৫— জুলাই : ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ—

ফুলার করলে হুকুম জারি
মা বলে যে ডাকবে তার
শাস্তি হবে ভারী।

১৯০৬—মার্চ : 'যুগান্তর' কাগজের মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের আত্মপ্রকাশ।

এপ্রিল : বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন বন্ধভঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার। মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার দল।

১৯০৭—'সন্ধ্যার' রাজদ্রোহ মামলায় ব্রহ্মবান্ধবের বিবৃতি 'স্বরাজ আন্দোলন বিধাতৃ নির্দিষ্ট।' 'বিদেশী গভর্ণমেণ্টের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নই।' কংগ্রেসে নরমপন্থী চরমপন্থী সংঘর্ষ। রাজদ্রোহ মূলক প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য যুগান্তর সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দণ্ডিত। চন্দননগরে ২ বার বাংলার লেফ্‌ট লাট এণ্ড্রু ফ্রেজার ট্রেন লাইন-চ্যুত করার চেষ্টা। ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেনকে গুলি।

১৯০৮—৩০শে এপ্রিল : মজঃফরপুরে বিপ্লবীদের বোমা বিস্ফোরণ। ১লা মে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার। প্রফুল্ল চাকীর আত্মহত্যা। ২রা মে অরবিন্দ, বারীন্দ্র প্রমুখ গ্রেপ্তার। আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা আরম্ভ।

১৯০৯—আগষ্টোর বিশ্বাস হত্যা। লণ্ডনে কার্জন ওয়াইলী হত্যা।

১৯১০—শামসুল আলম হত্যা। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১১—রাজকুমার রায় হত্যা, ময়মনসিংহ। মনমোহন ঘোষ হত্যা, বরিশাল।

১৯১২—রতীলাল হত্যা। বড়লাট হার্ডিঞ্জ হত্যাপ্রচেষ্টা দিল্লির, চাঁদনীচকে করপরেশন প্রশেসনে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ

১৯১৩— মৌলভী বাজারে গভর্ণর হত্যাপ্রচেষ্টা। কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে হরিপদ ঘোষ নিহত। ইন্সপেক্টর বঙ্কিম চৌধুরী নিহত, ময়মনসিংহ।

১৯১৪—বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার চেষ্টা। গোয়েন্দা রামদাস নিহত। বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ। জার্মানীর সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের চুক্তি। বার্লিনে বিপ্লবী সংস্থা গঠিত। বজবজে কামাগাটা মারু সংঘর্ষ। বহু শিখ নিহত। দিল্লী ষড়যন্ত্র মামলা। রাজাবাজার ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯১৫—রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা। বালেশ্বর সংগ্রাম।

১৯১৬—বসন্ত চ্যাটার্জীকে হত্যার চেষ্টা, হরিশ পার্কে। বসন্ত চ্যাটার্জী নিহত।

১৯১৮ জানুয়ারী : গৌহাটী সংঘর্ষ। ১৫ই জুন ঢাকা কলকত্তাবাজার সংগ্রাম। বিপ্লবী তারিণী মজুমদার এবং নলিনী বাগচী নিহত।

১৯১৯—বিপ্লব আন্দোলন দমনের জন্য রাউলাট আইন পাশ। জনসাধারণের প্রতিবাদ। ১৪ই এপ্রিল জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড। খিলাফত ও জালিয়ানওয়ালাবাগের অন্যায়ের প্রতিবাদে গান্ধীজীর আবির্ভাব এবং অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব।

১৯২০—গান্ধীজীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্তৃক আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত। দেশে বিপুল গণ-জাগরণ।

১৯২১—সমগ্র দেশে সহস্র লোকের কারাবরণ।

১৯২২-২৩—দেশবন্ধুর নেতৃত্বে স্বরাজ্যপার্টি গঠিত।

১৯২৪ · গোপীনাথ সাহা কর্তৃক টেগার্ট হত্যার চেষ্টা, সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক।

১৯২৭—জেলে ভূপেন চ্যাটার্জীকে হত্যার অপরাধে অনন্তহরি মিত্র এবং প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীর ফাঁসী। কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলায় রাজেন লাহিড়ী, আসফাকুল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল এবং রৌশন সিংহের ফাঁসী।

১৯২৮—কলিকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন।

১৯২৯—লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনে যতীন দাসের মৃত্যু। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার শপথ গ্রহণ।

১৯৩০—এপ্রিল : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। গান্ধীজী কর্তৃক লবণ আইন অমান্য। ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ সংগ্রামে বহু বিপ্লবী নিহত। বিনা বিচারে বিপ্লবীদের আটক আরম্ভ। কলকাতায় টেগার্ট হত্যা প্রচেষ্টায় বোমাবিস্ফোরণে অনুজা সেন নিহত।

১৯৩১—দীনেশ গুপ্তের ফাঁসী, রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের ফাঁসী হিজলী বন্দী শিবিরে পুলিসের গুলিতে সন্তোষ মিত্র। তারকেশ্বর সেন নিহত। জজ গার্লিককে হত্যা করে কানাই ভট্টাচার্য্য স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেন। মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট পেডিকে হত্যা।

১৯৩২—আইন অমান্য আন্দোলনে সহস্র সহস্র ব্যক্তির কারাবরণ। চট্টগ্রামে বলবাট সংঘর্ষ। নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত। ঢাকার পুলিসের নির্মম প্রহারে অনিল দাস নিহত। কলকাতার ওয়াটসন্ হত্যা প্রচেষ্টা—অতুল সেনের ইচ্ছামৃত্যু। চট্টগ্রামে পাহাড়তলী বিপ্লবী প্রচেষ্টায় ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার।

১৯৩৩—মেদিনীপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট ডগলাস নিহত প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। মুন্সীগঞ্জে কালীপদ মুখার্জীর ফাঁসী। আন্দামানে অনশনে মৃত্যু মহাবীর সিং, মানকৃষ্ণ দাস এবং মোহিত মৈত্র। কলিকাতায় দীনেশ মজুমদারের ফাঁসী, জামালপুরে পুলিশের প্রহারে নিহত ধীরেন দে। মেদীনিপুরে পুলিসের গুলিতে নিহত অনাথ পাঁজা, মৃগেন দত্ত, মেজিষ্ট্রেট বার্জ নিহত। ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, নির্মল জীবন ঘোষ এবং রামকৃষ্ণ রায়ের ফাঁসী।

১৯৩৪—চট্টগ্রামে বিপ্লবী নেতা সূর্য্য সেন ও তারকেশ্বর দস্তিদারের ফাঁসী। কুমিল্লায় অসিত ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। ফরিদপুরের মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী। আন্ত প্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা। বাংলার লাট এণ্ডারসনকে হত্যার প্রচেষ্টায় ভবানী ভট্টাচার্য্যের ফাঁসী।

১৯৩৫—হেজলী বন্দী শিবিরে হরিপদ বাগচী ও সন্তোষ গাঙ্গুলীর মৃত্যু।

১৯৩৩—ফরিদপুরে পুলিসের প্রহারে নগজীবন ঘোষের মৃত্যু। টিটাগর ষড়যন্ত্র মামলা।

১৯৩৭—মেদিনীপুর জেলে ধনেশ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু।

১৯৩৮—ঢাকা জেলে অনশনে হরেন মুন্সীর মৃত্যু।

১৯৩৯—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ।

১৯৪১—সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী ছদ্মবেশে সুভাষ চন্দ্র বসুর (-নেতাজী) ভারত হতে পলায়ন।

১৯৪২—ভারত ছাড়ো আন্দোলন। বিভিন্ন থানা অভিযানে মেদিনীপুর ও বালুরঘাটে বহু লোক নিহত।

১৯৪২—মাদ্রাজ উপকূলে রক্ষী বাহিনীর বিদ্রোহ। মানকুমার বসু ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, দুর্গাদাস চৌধুরী প্রভৃতি ন,জনের ফাঁসী।

১৯৪৩—সালের ২১ অকটোবর সিঙ্গাপুরে নেতাজী ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন, রাসবিহারী বসু হন প্রধান উপদেষ্টা।

১৯৪৩—সালের ২৯ ডিসেম্বর নেতাজী আন্দামান নিকোবর দীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে জাতীয় ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করেন। নেতাজী আন্দামান ও নিকোবরের নাম দিলেন শহীদ ও স্বরাজ দীপপুঞ্জ।

১৯৪৪—সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারত অভিমুখে মার্চ শুরু করে।

১৯৪৫—সালের ২৯ মার্চ আজাদ-হিন্দ ফৌজ ভারতবর্ষে নাগাল্যাণ্ড রাজধানী কোহিমায় স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ পতাকা উত্তোলন করে।

১৯৪৬ ৪৭—কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় শান্তিকামী প্রচারকালে নিহত ননী সেনগুপ্ত, শচীন মিত্র, সুশীল দাসগুপ্ত, স্মৃতিশ ব্যানার্জী, বীরেশ্বর ঘোষ।

১৯৪৭—১৫ই আগস্ট—ভারতের স্বাধীনতা।

বিপ্লবী বাংলার আগামী সংখ্যা ২৫শে সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হইবে। —সঃ বিঃ বাঃ

কংগ্রেসের নেতৃত্বে কি সমাজতন্ত্র হতে পারে ?

কল্যাণ রায়

জহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী প্রমুখ কংগ্রেসী নেতারা সমাজতন্ত্রকে জাতীয় কংগ্রেসের ও পরবর্তী-কালে ভারত রাষ্ট্রের জাতীয় লক্ষ্য হিসাবে বারে বারে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু সত্যিই কি কংগ্রেসের মত একটা অ মার্কসবাদী পার্টির পক্ষে দেশে সমাজ তন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব ?

এদেশের মার্কসবাদী ও বামপন্থী পার্টিগুলি, যাদেরও লক্ষ্য সমাজতন্ত্র—তারা একবাক্যে বলে থাকেন 'না তা কখনই সম্ভব নয়'। তাদের মার্কস-বাদী ভাষায় তাঁরা বলেন "কংগ্রেস আমলে একটা বুর্জোয়া পার্টি, নেহরু, ইন্দিরা—এঁরা বুর্জোয়া নেতা। একমাত্র বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধ্বংস করেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হতে পারে। বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে কখনও সমাজতন্ত্র হয় না। সুতরাং কংগ্রেস ও তার নেতা নেহরু ইন্দিরাদের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র আসবে এ একেবারে অসম্ভব কথা।"

আমাদের দেশের মার্কসবাদীরা যা, বলেন তা যদি অভ্রান্ত হ'তো তবে নেহরু, ইন্দিরার ঘোষণা ভ্রান্ত বলে ধরে নিতে আপত্তি থাকত না। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে ভারতের কমিউনিষ্টরা স্বাধীনতা সংগ্রামের আমলে এবং তার পরবর্তী কালে ও বারে বারে, মারাত্মক ভুল করেছেন, ভুল কথা বলেছেন।

ওঁরা দৃঢ় প্রত্যয়ে বলতেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে, গান্ধী, নেহরুর মত জাতীয়তা বাদীদের নেতৃত্বে ভারতে স্বাধীনতা আসবে—এ অবাস্তব ভাবনা। সাতচল্লিশ আটচল্লিশ সালে ওঁরা ঘোষণা করেছেন 'ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়'। পরে তাঁরা এসব মারাত্মক ভুল যদিও শুধরে নিয়েছেন কিন্তু তাদের ভুলের বহর দেখে একথা মেনে নেওয়া যায়না যে তারা মার্কসবাদ ঠিক ঠিক বোঝেন বা তারা অভ্রান্ত।

এই কারণে আমাদের মার্কসবাদীদের বক্তব্য আপাতত সরিয়ে রেখে জাতীয় কংগ্রেস এবং, নেহরু, ইন্দিরা—এঁদের মত ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্র হতে পারে কিনা তা আমরা স্বাধীন ভাবেই বিচার করার চেষ্টা করবো, আর বিচারটা করবো মার্কস-বাদের নিরিখেই।

দেশে দেশে সমাজতন্ত্র কি ভাবে আসবে তার কি কোন বাঁধা ছক্ কার্ল মার্কস কি লেনিন দিয়ে গেছেন ? সব দেশে কি একই ভাবে, একই পথে, একই প্রক্রিয়ায় সমাজ তন্ত্রে উত্তরণ ঘটবে ?

আমাদের দেশের অনেকের ধারণা তাই। অনেকের নিজের এ বিষয়ে কম পড়াশোনা থাকা এবং নেতাদের আওড়ান কয়েকটা স্লোগান শুনে শুনে এমন একটা ধারনা হয়ে গেছে যে মার্কস লেনিন এঁরা এমন কথাই বোধহয় বলে গেছেন যে সমাজতন্ত্রে পৌছনর পথ বোধহয় একটাই আর তা হলো কতকটা এরকম—কমিউনিষ্টরা শ্রমিক কৃষক শ্রেণীকে জবরদস্তভাবে সংগঠিত করে একটা সশস্ত্র গৃহযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা দখল করবে, আর এইভাবে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে।

আসলে কিন্তু মার্কস, লেনিন এমন কথা কখনই বলেননি যে সব দেশে একই ভাবে সমাজতান্ত্রিক

বিপ্লব হবে। বরঞ্চ অত্যন্ত স্পষ্ট করেই বারে বারে এর উল্টো কথাটাই বলেছেন। সমাজ তান্ত্রিক বিপ্লবের পথ বা উপায় সম্পর্কে লেনিনের একটা বক্তব্য শুনুন। "বামপন্থী কমিউনিজম একটা শিশু সুলভ রোগ"—তাঁর এই বিখ্যাত পুস্তিকায় লেনিন লিখেছেন—

"আমাদের পরিষ্কার বুঝতে হবে যে সংগ্রামের জন্য ছক বাঁধা, যান্ত্রিক ও একই ধরনের ভিত্তিতে কোন নেতৃত্বমূলক কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় না। যতদিন জাতি ও দেশগুলির মধ্যে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত পার্থক্য আছে ততদিন সমস্ত দেশের কমিউনিষ্ট আন্দোলনের আন্তর্জাতিক কৌশল দাবী করে না যে বৈচিত্রের অবসান ঘটুক বা জাতীয় পার্থক্য বিলুপ্ত হোক। বরং তার দাবী হলো কমিউনিজমের মূলনীতিকে এমন ভাবে প্রয়োগ করতে হবে যাতে করে কতকগুলি বিষয়ে এই নীতি সঠিকভাবে পরিবর্তিত করে জাতীয় ও জাতীয় রাষ্ট্রগত পার্থক্যের সঙ্গে খাপ খাওয়ান যায়। সুনির্দিষ্টরূপে যে অনন্য ও বিশিষ্ট জাতীয় অবস্থার মধ্যে দিয়ে" একটা দেশকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে "অগ্রসর হতে হবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষন তাকে জানবার চেষ্টা, অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে ধরতে পারা, সমাক উপলব্ধি করা—এই হলো এই ঐতিহাসিক যুগের প্রধান কর্তব্য।

....এখন আমাদের সকল প্রচেষ্টা, সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হবে শ্রমিক বিপ্লব (বা সমাজতন্ত্রে) রূপান্তরের বা তাতে পৌঁছবার নানারূপের অনুসন্ধানের প্রতি।"

লেনিন এই বক্তব্য রেখেছিলেন সারা বিশ্বের কমিউনিস্টদের সভায়। খুব সহজেই এর থেকে আমরা টেনে নিয়ে বলতে পারি যে—

১) বিপ্লবের জন্য মার্কসবাদ কোন যান্ত্রিক ছকবাঁধা কর্মকৌশল বা কাজের ধারার নির্দেশ দেয় না।

২) বিভিন্ন দেশের নানা বৈচিত্র ও জাতীয় পার্থক্য আছে।

৩) এই পার্থক্যকে অস্বীকার করার কথা মার্কসবাদ ত বলেই না বরং বিপরীত ভাবে, কমিউনিজমের মূলনীতিকে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজের ধারাকে এমন ভাবে পাল্টে নিতে বলে যেন তা জাতীয় ও জাতীয় রাষ্ট্রগত অবস্থার সঙ্গে খাপ খায়।

৪) এই সব পরিবর্তনগুলো বা দেশে দেশে সমাজতন্ত্রে উত্তরনের নানারূপ ঠিক কেমন হবে লেনিন মনে করতেন যে আগে থাকতেই মার্কসবাদ তা বলে দিতে পারে না। তাই তিনি প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্টদের বলেছেন যে "সমস্ত প্রচেষ্টা আর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত" নিজ নিজ দেশে নিজ নিজ পথ তোমাদের খুঁজে বার করতে হবে। আর এটাকেই তিনি বলেছেন "এটাই হলো এই ঐতিহাসিক যুগের প্রধান কর্তব্য।"

লেনিনের বক্তব্য সম্পর্কে কিছু ভুল বললাম কি? যে সব চিন্তাশীল পাঠক এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে চান তাঁদের অনুরোধ করবো "বামপন্থী কমিউনিজম একটি শিশুসুলভ রোগ" পুস্তিকাটির "কয়েকটি সিদ্ধান্ত" শির্ষক অধ্যায়টি একটু কষ্ট করে পড়ে দেখুন।

প্রশ্ন আসতে পারে কোন কোন বিষয়ে এই জাতীয় বৈশিষ্টের কথা লেনিন বলেছেন? ঐ একই বক্তব্যের মধ্যেই লেনিন বলেছেন "প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র দেশ তার আর্থিক রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক জাতিগত উপাদান, তার উপনিবেশ ধর্মীয় ভেদাভেদ

ইত্যাদি বিশেষ অবস্থানুযায়ী সংগ্রামের যে বৈশিষ্ট-গুলি অর্জন করেছে ও অনিবার্যভাবেই করবে—এ দুটিকেই হিসাবের মধ্যে ধরতে হবে।

ভারতের কতগুলি অনন্য বৈশিষ্ট আমাদের জাতীয় নেতাদের লেখায় বার বার ধরা পড়ে।

ভারতের আছে এক সুপ্রাচীন সভ্যতা—যার ধারা হাজার বছরের ঘাত প্রতিঘাত, রাজনৈতিক উত্থানপতন সত্ত্বেও আজও তার জীবনী শক্তি হারিয়ে ফেলেনি। ভারতীয় ঐতিহ্যগত চিন্তাধারার সঙ্গে বহু পরিমানে মিশে গেছে পশ্চিমী আধুনিক চিন্তা। জাতীয় চিন্তা-চেতনার গর্ভথেকে জন্ম নিয়ে গান্ধিবাদ ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব উদ্ভাবন করেছিলেন অসহযোগ, আইন অমান্য, সত্যাগ্রহের মত শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা সংগ্রামের এক বিচিত্র ধারা—যার প্রভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের চিন্তাধারাও স্তিমিত হয়ে যায়। আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার প্রতিভূ জহরলাল, সুভাষচন্দ্র, দেশবন্ধু, জয়প্রকাশ প্রমুখ নেতাদের উদ্যোগে সুদূর ত্রিশের দশক থেকে জাতীয় মুক্তি চিন্তার সঙ্গে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িয়ে যায় সমাজতন্ত্রবাদ ও আধুনিক গণতান্ত্রিক ভাবধারা।

সুদীর্ঘ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম ভারতীয় জাতীয় মানসিকতা ও তার সকল নেতৃত্বকে দিয়েছে ধনতন্ত্র-বিরোধী ও সমাজতন্ত্র অনুযায়ী চিন্তাচেতনা। এই চেতনার ফলে, স্বাধীন ভারতের পররাষ্ট্র নীতি স্বাভাবিক ভাবেই ইঙ্গ-মার্কিন জোটের কাছ থেকে সরে এসে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে।

স্বাধীন ভারতের শিল্পনীতি ব্যক্তি পুঁজিকে শিল্পক্ষেত্রে উপযুক্ত ভূমিকা পালনের সুযোগ দিলেও তাদের অবাধ সুযোগ কখনও দেয়নি। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্পোদ্যোগ পরিকল্পিত ভাবে গড়ে তোলা হয়েছে এবং তা ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্পকে অনেক দূর ছড়িয়ে গেছে। আজ ভারতের শিল্প পুঁজির শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আর বাকী মাত্র ২৫ ভাগ ব্যক্তি মালিকানাধীন। সেই সঙ্গে ভারী ও মূল শিল্প আজ সবই প্রায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন। উপরন্তু M R T P Act. বৈদেশিক বাণিজ্যের উপরে সরকারী নিয়ন্ত্রণ, ব্যাঙ্ক ও ঋণ দান সংস্থাগুলির উপরে সরকারী অধিকার এ সব ক্ষমতা রাষ্ট্রকে অনেক বেশী করে ব্যক্তি পুঁজির উর্দ্ধে স্থাপন করেছে।

ভারত আজ বিশ্বের প্রধান দশটি শিল্পোন্নত দেশের অন্যতম এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়র, টেকনিসিয়ান, ডিজাইনার প্রভৃতির দিক থেকে ভারতের স্থান আজ বিশ্বে তৃতীয়।

খাদ্যে আজ ভারত স্বয়ম্ভর এবং অতি দ্রুত আরও বেশী কৃষিপণ্য উৎপাদনের সম্ভাবনা আজ ভারতের আয়ত্তাধীন।

এই সব বৈশিষ্টগুলি বিচার-বিশ্লেষণ করে এ কথা আজ চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করতে হবে যে ভারত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট অনুসরণ করে খুঁজে নিয়েছে, অন্ততপক্ষে বহুদূর পর্যন্ত সফলতার সঙ্গে গড়ে তুলতে সফল হয়েছে জাতীয় অগ্রগতির এক নিজস্ব পথ। সে পথের সঙ্গে বিকাশের ধনতান্ত্রিক পথের যেমন বহু অমিল আবার মিলও আছে তেমনই ঠিক অনুরূপ ভাবে রাশিয়ার অনুসৃত বিকাশের সমাজতান্ত্রিক পথের সঙ্গে যেমন বহু অমিল আবার মিলও অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যাবে।

ঘোষিত নীতি অনুসারে ভারতের অর্থনীতি সমাজতান্ত্রিক নয়, সমাজতান্ত্রিক প্যাটার্ণ বা ধরণের

যার গতি সমাজতন্ত্র অভিমুখে।

এই অবস্থায় এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে নেহরু ইন্দিরা পরিচালিত কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতে যে রাজনৈতিক ও অর্থ-নৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছে তাকে সঠিক ভাবে ও দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে গেলে ভারতের সমাজতন্ত্রে উত্তরণ অসম্ভব নয়।

দৃঢ় রাজনৈতিক ইচ্ছা নিয়ে অবশ্যই কালো-টাকার কারবারী অসৎ ব্যবসায়ীদের আজ সায়েস্তা করা যায়; দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করার জন্য সারা দেশ জুড়ে সরকারী বা আধা-সরকারী নিয়ন্ত্রনে বিক্রয় কেন্দ্র চালু করা যায়; দায়িত্বশীল ট্রেড-ইউনিয়নের সহায়তায় শ্রমিক-কর্মচারীদের মধ্যে উপযুক্ত দেশপ্রেম সঞ্চার করে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্পগুলিকে আরও বেশী কার্যকরী ও লাভজনক করে তোলা যায়; M R T P Act কে দৃঢ়তার সঙ্গে কার্যকরী করে একচেটিয়া পুঁজির অতি মুনাফা ও ট্যাক্স ফাঁকি বন্ধ করা যায়; ব্যাঙ্ক, ইন্সিওরেন্স প্রভৃতি সংস্থা ছোট ছোট শিল্পপতি, ছোট ছোট ব্যবসায়ী ও গরীব চাষীদের ঋণ দিয়ে শিল্প ও কৃষির আরও দ্রুততর বিকাশ সম্ভব করতে পারে; রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রকে ক্রমেই আরও বিস্তারিত করে ব্যক্তি পুঁজি মুনাফা লোভি চরিত্রকে আরও খর্ব করা সম্ভব।

হ্যাঁ, এ পর্য্যন্ত যেমন অনেক কিছুই হয়েছে প্রগতি অভিমুখে, সমাজতন্ত্রের অভিমুখে এই কংগ্রেসের নেতৃত্বেই, একটা রক্তক্ষয়ি, বিপ্লব না ঘটিয়েও আইন ও গণতন্ত্রের পথে তেমনই বাকী এ কাজগুলিও হওয়া সম্ভব।

কিন্তু তার জন্য শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর একান্ত ইচ্ছা বা প্রচেষ্টা, তা যত দৃঢ়ই হোক—যথেষ্ট নয়। তার সমাজতান্ত্রিক ভাবনাকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য প্রয়োজন একটা উপযুক্ত পার্টির—আজকের কংগ্রেস যে চরিত্র হারিয়েছে। প্রয়োজন সমাজ-তন্ত্রে বিশ্বাসী সমস্ত দল ও চিন্তাশীল মানুষের সক্রিয় সহযোগীতা—যারা সরকারের প্রতিটি ভুলও ব্যর্থতার যেমন সমালোচনাও করবে তেমনই আবার সঠিক জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য সক্রিয় সাহায্য করবে।

ভারতের মহান জাতীয় নেতা নেহরু ইন্দিরার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অগ্রগতির যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তা অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রে উত্তরন কেবলমাত্র সম্ভবই নয় এক নতুন উদাহরণ সৃষ্টিও সম্ভব। প্রয়োজন আজ জাতীয় নেতৃত্বের এক উপযুক্ত দেশপ্রেমিক দল আর তার সঙ্গে বিরোধী দল গুলি ও সাধারন মানুষের সচেতন সহযোগীতা।

বিপ্লবী ননী সেনের জীবনাবসান

গত ১লা জুলাই ১৯৮২ বিপ্লবী ননী সেন পরলোকগমন করেন।

১৯১৯ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্কুল জীবনেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং অতি অল্প সময়ে বরিশালে অনুশীলন সমিতির একজন কৃতি কর্মির পরিচয় দেন। বিপ্লবী নায়ক সতীশ চন্দ্র পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, জগদীশ চ্যাটার্জি প্রমুখের নেতৃত্বে বিপ্লব প্রচেষ্টার আয়োজনে ননী সেন ছিলেন বরিশালে একজন দায়িত্বশীল কর্মি। ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হন, তখন তার বয়স মাত্র ১৭ বছর, দীর্ঘ ৭।৮ বৎসর কারা জীবনের গ্লানি তাকে সামান্যতম বিপ্লবী পন্থা হতে নিষ্ক্রীয় করতে পারে নাই। কারাজীবনেই মার্কসবাদে শ্রদ্ধাশীল হন। ১৯৩৮ সালে জেল হতে মুক্তি লাভ করে মার্কসবাদী কর্মধারা বেছে নেন, নকসাল পন্থীদের চিন্তাও তাঁকে শেষদিকে আকৃষ্ট করেছিল। অত্যন্ত ধীর স্থির সংযত কথাবার্তা তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট ছিল।

আমরা তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত তার বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা শ্রদ্ধা-সহকারে স্মরণ করি।

শহীদ যতীন দাসের অনশন-আত্মাহুতির ৫৩তম দিবস

১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮২, সোমবার

অনুষ্ঠান সূচী

সকাল ৮ টায়—শহীদ যতীন দাস পার্কে শহীদের মূর্ত্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ।

সকাল ৮-৩০ মিঃ— কেওড়াতলা শ্মশানে শহীদ মূর্ত্তিতে মাল্যদান ও সময়োচিত সঙ্গীত পরিবেশন।

এই অনুষ্ঠানে সর্ব্বসাধারণের সক্রিয় সহযোগীতা এবং সবান্ধব উপস্থিতি প্রার্থনীয়। জয়হিন্দ।

শহীদ যতীন দাস স্মৃতি সমিতি

শ্রীপূর্ণানন্দ দাসগুপ্ত – সভাপতি

শ্রীশম্ভুনাথ বসু, শ্রীগৌরহরি চট্টোপাধ্যায়—যুগ্ম-সম্পাদক

১, অমিতা ঘোষ রোড, কলি-২৯ ফোন : ৪৭ ২৬৭৬

মা দুর্গাকে

প্রদ্যোৎ কুমার ভট্টাচার্য্য

একটি অসুর বধ করে মা
বছর বছর পান পূজা,
দেখ চেয়ে মা হাজার হাজার
ঘুরছে অসুর ভরতাজা !
ঘুষখোর আর মুনাফাখোর
দাপিয়ে বেড়ায় দেশ সারা,
দশের ছাতে জমছে রসদ
নব্বুই জনই সব হারা।
সব হারাদের করতে মদৎ
নেতা সাজে দশের চাঁই,
মুখে বানী গান্ধী জওহর
সুযোগ পেলেই বাড়ছে খাঁই।
মহিষাসুরকে যা মা ভুলে
অনেক শিক্ষা হয়েছে তার,
বঞ্চিত যত সন্তান তোর
নেই কি মা তার প্রতিকার !
দিস না মা তুই কোন কিছু
কর মা শুধু আশীষ দান,
সংগ্রাম করে ঘুচাবো বিভেদ
যায় যদি যাক তুচ্ছ প্রান।

শহীদ স্মরণে

দোলিয়া চ্যাটার্জি

দেশের কাজে সঁপল যাঁরা
দেহ মন ও প্রাণ
স্বাধীনতার জোয়ার এনে
রাখল দেশের মান।

তাদের—
কেউ বা উজল স্মৃতি
আজও স্মরি সকল কাজে
কাউকে শুধু নামেই জানি
অমর কথা আর ইতিহাসে।

অর্ঘ সাজায়ে 'শহীদ স্মৃতি'র
এই যে করেছি আয়োজন
এই তো সময় এই মুহূর্তে
আছে যে তাহার প্রয়োজন ॥

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

(সম্পাদক –)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০·০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলকাতা বাঙার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৩ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—·৭০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৮০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ বাঙের তোলেনি (১)—১·০০, ১৪। দেশ বাঙের তোলেনি (২)—২·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৯নং বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

বৈশালী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

Regd No R. N. 24511/71
DAV R
Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
P. Regd. WB/NC 77
বার্ষিক :—সডাক ১৮.০০ টাকা
ষাণ্মাষিক :—১০.০০ টাকা

490

হাতের কাছেই বই

SEP 1982

এ [illegible] মানব ইতিহাসে এক অতি প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এমন একটা সময় ছিল, যখন আ[illegible] রাজ্যে গণশিক্ষার এই অতি প্রয়োজনীয় মাধ্যমটি সুষ্ঠু পরিচালনার সুযোগ পেত না।

বর্তমান সরকার বিষয়টির ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে বিগত পাঁচ বছরে গ্রন্থাগার কার্যক্রমকে অগ্রগতির পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছেন। পাঁচ বছর আগে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ছিল ৭৬২, আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৪১০। ১৯৭৯ সালে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তন করে বামফ্রন্ট সরকার পাঠাগারগুলির পরিচালন ব্যবস্থা ও অনুদান পাবার অধিকারকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করেছেন।

শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ রূপকার—একথা স্মরণ রেখে ৮৩৬টি পাঠাগার শিশুদের জন্য স্বতন্ত্র বিভাগ খোলা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে থাকা মানুষেরা যাঁরা সময় মত শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিলেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়েছে পাঠাগার ব্যবহারের সুবিধা। সর্বত্র সমভাবে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেবার পথে এ এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

গ্রন্থাগারের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা ও কৃষ্টিকে সম্প্রসারিত করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

নং ৭৪০৯ / ৮২ (তথ্য)

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ৮ই আশ্বিন ১৩৮৯ ২৪ শে সেপ্টেম্বর ১৯৮২	২য় সংখ্যা

দুঃখ-সহার তপস্যাতেই হোক্ বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়,
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে, মৃত্যু তারেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয়, বাঁচতে তারাই জানে।

—রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদকীয়

রাজনীতি যূপকাষ্ঠে মিশনের বিদ্যাপীঠ

গত কয়েকদিন ধরে পুরুলিয়াস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি স্কুলে যে সব কাণ্ডকারখানা ঘটে চলেছে, সেটা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির মুখে কলঙ্কের কালিমা লেপন করা হচ্ছে। এই রাজ্যে আইন শৃঙ্খলার কি শোচনীয় অবক্ষয় ঘটেছে, সেটা তুলে ধরেছে জগৎ সমক্ষে। সামান্য কয়েকটি অর্বাচীন তাদের তথা কথিত দাবী দাওয়ার শ্লোগান তুলে মিশনের নিয়োজিত লোকদের হাত থেকে প্রবেশ-চাবিটা জোর করে কেড়ে নিয়েছে। অথচ সেখানে জেলাম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের প্রধানরা ঘুরে বেড়াচ্ছেন কিন্তু তাদের থেকে চাবিটা আদায় করতে সক্ষম হননি অথবা আদায় করেন নি। আইন শৃঙ্খলা রক্ষক-দের এমন অপদার্থতা কিসের জন্য? এই লোকগুলি বিশেষ কোন দলের সভ্য এবং প্রশ্রয়পুষ্ট বলেই কি তাদের কোমল অঙ্গে কোন আঘাত করছে না? নিজেদের অযোগ্যতার জন্য, না কারো নির্দ্দেশে, এমন অভাবনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে পারছে না?

বেশ কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছিলেন, যাকে তার নির্দ্দেশ বলে গণ্য করা যেতে পারে, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও হাসপাতালগুলিতে কোন প্রকার হুল্লোড়বাজি বরদাস্ত করবেন না সরকার এবং এই অবাঞ্ছনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন কঠোর হস্তে। মুখ্যমন্ত্রীর এই নির্দেশ অমান্য করার দুঃসাহস পাচ্ছে কোথা থেকে কয়েকটী উচ্ছৃঙ্খল যুবক? পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ কার্যকরী করছে না কেন জেলা প্রশাসন কর্তৃপক্ষ? তবে কি ধরে নিতে হবে যে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্যে যা নির্দেশ দিয়েছেন, সেটাকে কার্যকর না করার জন্য কোন গোপন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে কোন স্থান থেকে? পশ্চিমবাংলার মত একটি ঐতিহ্যপূর্ণ সংস্কৃতিবান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এমন দু-মুখো নীতি অনুসরণ করবেন এটাও ভাবাই সম্ভব নয়। তবে কি দলীয় প্রভাবের জন্য কোন কঠোর ব্যবস্থা নিতে রাজ্য সরকার দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছেন? বিধান সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এর পেছনে কোন রাজনৈতিক দল সক্রিয় নয়। যদিও এই অপরাধীদের মধ্যে পাণ্ডাস্থানীয় একজন বলেছেন যে সিট যদি তাদের পক্ষে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করে, তবে তার কিছু বলার নেই। সংবাদে প্রকাশ, এই নিন্দনীয় অভিযানের নেতা ওখানকার সি. পি. এম দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ পঞ্চায়েতের একজন সদস্য। এত কাণ্ড ঘটে যাবার পর জেলা কর্তৃপক্ষের রিপোর্টের অপেক্ষা করছেন মুখ্যমন্ত্রী কোন্ যুক্তিতে? পুরুলিয়া কিছু সাত সমুদ্র তের নদীর পারে অবস্থিত কোন স্থান নয়। কলকাতা থেকে কোন দুরধিগম্য স্থানও নয়। যে কোন ব্যবস্থা ইচ্ছা থাকলে কয়েক ঘন্টার মধ্যেই নেওয়াটা কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই অস্বাভাবিক বিলম্ব ঘটার পেছনে কোন রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করছে বলে মনে করলে কোন ভুল বলা হবে কি? সরকারের কাছ থেকে একটা বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ করতে যতই দেরী হবে, ততই জন মনে নানাপ্রকার সন্দেহ ঘনীভূত হতে বাধ্য।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশেষ সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে শুধু সারা ভারতেই নয়, সারা বিশ্ব এদের সেবা কার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অথচ বারবার এই মিশন পরিচালিত সংস্থাগুলিতে গণ্ডগোল সৃষ্টি করা হচ্ছে। পুরুলিয়ার ঘটনাটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা একটি সুপরিকল্পিত প্ল্যানের একটি অঙ্গ মাত্র। বহুজায় এমন কাণ্ড ঘটেছে এমনকি এদের প্রতিষ্ঠিত হাস-পাতাল ও অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই হামলাবাজির পরিচয় মিলেছে।

কিন্তু কেন? রামকৃষ্ণদেব- স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত সেবাব্রতী এই সন্ন্যাসীদের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি? তারা ঈশ্বরবিশ্বাসী বলে? Religion is the opium of the people ধর্ম মানুষের জীবনে আফিং এর কাজ করে, এই বস্তাপচা বুলির শিকার এঁরা? যেহেতু সরকারে কমিউ-নিষ্টরা সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে এই পরহিতব্রতে নিবেদিত প্রাণ সন্ন্যাসীদের হাতে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার থাকলে কমিউনিজম এর প্রচার সম্ভব হবে না বলেই কি এদের বিরুদ্ধে এই অভিযান? এ সম্বন্ধে সরকার পক্ষ থেকে তাদের বক্তব্য। এ সম্বন্ধে তাদের অনুসৃত নীতির একটা পরিচ্ছন্ন বিবৃতি, দাবী করে এই রাজ্যের চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মানুষ।

রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত সব প্রতিষ্ঠানই পরিচালনা করা হয় একটা আদর্শের ভিত্তিতে। বিশেষ করে, এদের পরিচালিত স্কুলগুলির পরীক্ষার ফলাফল সমীক্ষা করলে, দেখা যাবে এদের কৃতিত্ব দেশের পক্ষে গর্বের এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে বিশেষ ভাবে অনুকরণীয়। এই প্রতিষ্ঠান-গুলিকে ধ্বংস করার অর্থ হবে দেশের ছাত্রদের ভবিষ্যৎ ধ্বংস করা। এমন সর্বনাশা পরিস্থিতির যদি কঠোর ভাবে মোকাবিলা করা না হয়, তবে এই সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ একদিন বিস্ফো-রণের সম্ভাবনাকেই ত্বরান্বিত করা হবে, একথা ভুলে গেলে সরকার নিজের বিপদ নিজেরাই ডেকে আনবেন নিশ্চিত ভাবে।

এই প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার জন্য শুধু পশ্চিমবাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ছাত্ররা এসেছেন ও ওখানকার হষ্টেলে আছেন। তারা কি রকম মানসিক উদ্বেগের মধ্যে আছেন, সেটা যে কেউ অনুভব করতে পারেন। এদের অভিভাবকদের ওখানে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের মানসিক অবস্থাটাও দুর্বিসহ। যে সন্ন্যাসীদের উপর দায়িত্ব আছে, তারাও নিজেদের জন্যও যেমন, তেমনি এদের জন্যও বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। তারা শারীরিকভাবে নিগৃহীত হতে পারেন, এমন সম্ভা-বনার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায়না। কোন দেশে এমন অদ্ভুত পরিস্থিতি হতে পারে, এটা ভাবাই কষ্টকর। অথচ এটাই ওখানকার বর্তমান পরিস্থিতি। রাজ্য সরকার উদাসীন। দেশটা কি সত্যই মগের মুল্লুকে পরিণত হয়েছে। এ প্রশ্নের জবাব চায় সমগ্র বাঙ্গালী জাতি, তথা সমস্ত ভারতবাসী।

卐

শের-ই কাশ্মীর-শেখ আবদুল্লা

—কালীপদ সরকার

শেখ মহম্মদ আবদুল্লা চলে গেলেন। জন্ম ১৯০৫, মৃত্যু ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৮২। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কালের মহারথীদের মধ্যে অবশিষ্ট রইলেন মাত্র একজন, আবদুল গফর খাঁ। তিনি দেশ থেকে নির্বাসিত। শেখ আবদুল্লার মত এমন ঘটনা বহুল, উত্থান-পতন সচকিত, জনপ্রিয় রাজনৈতিক জীবন ইতিহাসে বিরল। আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস, সি শেখ সাহেব জীবন আরম্ভ করেন স্কুল শিক্ষক রূপে। ১৯৩২ সালে স্কুল মাষ্টারি ছেড়ে দিয়ে কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতিরূপে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাতেই তিনি অভিমগ্ন ছিলেন। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী রূপেই তাঁর মহাপ্রয়াণ।

শেখ সাহেব গত অর্ধ শতাব্দী ব্যাপী কাশ্মীর রাজনীতির সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁকে বাদ দিয়ে কাশ্মীরের কথা ভাবাই যেত না। তাঁর শূন্য স্থান সহজে পূর্ণ হবার নয়। শেখ আবদুল্লা এখন সকল বিতর্ক ও সংশয় আলোচনার ঊর্ধ্বে স্মৃতিলোকে বিরাজমান। দেশবাসীর শোক দুঃখের অশ্রু এখনো শুকায় নি, এসময়ে শেখ সাহেবের রাজনীতির মূল্যায়ন উচিত হবে না, তা থেকে তাই বিরত হয়েছি।

ব্রিটিশ সরকার আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গড়েছিল তরুণ ও মেধাবী মুসলিম ছাত্রদের সাম্প্রদায়িকতার পাঠ দিতে, যার উদ্দেশ্য ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বকে পাকা পোক্ত করা। অর্থাৎ মুসলমান ও ইংরেজ রাজত্বের প্রথম শতবর্ষে ভারতীয়দের মধ্যে যে এক জাতীয়তার মনোভাব গড়ে উঠেছিল, তাকে সমূলে ধ্বংস করে মুসলমানদের মনে বিভেদের বীজ বোনা। শেখ আবদুল্লা আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হয়েও, সাম্প্রদায়িকতার দ্বারা প্রভাবিত হন নি। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবাদের তিনি ঊর্দ্ধে ছিলেন একথা বলা অবশ্য ঠিক হবে না। কারণ শেখ আবদুল্লার ক্ষেত্রে কাশ্মীরের স্বাতন্ত্র্য এবং মুসলিম স্বাতন্ত্র্য এক অর্থবোধক ছিল। জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের মোট জনসংখ্যার নব্বুই শতাংশ মুসলমান। সেজন্য দ্বিজাতিতত্ত্ব তাঁর কাছে অর্থহীন ছিল। তা নিয়ে তাঁর মাথা ব্যথাও ছিল না।

শেখ আবদুল্লা নিঃসন্দেহে একজন আপসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামী, তবে তাঁর এই সংগ্রাম ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ছিল না। সে সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল কাশ্মীর ও জম্মুর হিন্দু রাজত্ব উচ্ছেদ করে স্বাধীন কাশ্মীর প্রতিষ্ঠা বা কার্যতঃ মুসলিম রাজত্ব প্রতিষ্ঠার নামান্তর। সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে কাশ্মীরে গণতান্ত্রিক সরকার স্থাপন যে লক্ষ্যের ছিল বহিরাবরণ ও প্রচার শৈলী। তার পিছনে ছিল হয়ত কাশ্মীর আন্দোলনের অনুকূলে প্রগতিপন্থী ভারতীয়দের সমর্থন লাভের প্রয়োজন বোধ। সেই কারণে এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সমর্থন ও সাহায্য লাভের জন্য ১৯৩৮ সালে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্সের নাম পালটিয়ে কাশ্মীর জাতীয় কনফারেন্স রেখেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় নি। কাশ্মীর ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে তিনি তাঁর পাশে পেয়েছিলেন। জওহরলাল তখন কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা।

সেই সুবাদে শেখ সাহেব লাভ করেছিলেন গান্ধীজীর আশীর্বাদ এবং অনেক কংগ্রেসপন্থীদের

বন্ধুত্ব, যাঁদের মধ্যে ধনী কন্যা কুমারী মৃদুলা সারাভাই এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। কংগ্রেস কর্তৃক শেখের কাশ্মীর রাজ বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন শেখকে কিছুটা কংগ্রেসের দিকে টানলেও, কংগ্রেসের প্রতি কাশ্মীরের মহারাজা হরিসিংকে বিরূপ করেছিল। যার দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি হয়েছিল কাশ্মীর রাজ্যের ভারতে যোগদানে বিধা ও শংকার হেতু এবং কাশ্মীর সমস্যার অন্যতম কারণ। মহারাজা হরি সিং যদি ব্রিটিশ কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যোগদানের সিদ্ধান্ত নিতেন তাহলে কাশ্মীরে গণভোটের প্রশ্ন উঠত না, কাশ্মীরের একাংশও ভারতের অধিকারচ্যুত হত না। যাক সে কথা।

শেখ আবদুল্লা তাঁর আন্দোলনে মুসলিম লীগকে পান নি। তিনি মিঃ জিন্নার রাজনীতির স্বরূপ বুঝে নিয়েছিলেন। দেশ বিভাগের পর, স্বাধীন স্বতন্ত্র কাশ্মীর রাজ্য স্থাপনের যে স্বপ্ন শেখ সাহেব মনে মনে পোষণ করতেন, পাকিস্তানে যোগ দিলে তা যে কোনমতে সফল হবে না তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও বাস্তববাদী আবদুল্লার পক্ষে তা অনুধাবন করা কষ্টসাধ্য ছিল না। কাশ্মীরের ওপর তাঁর একাধিপত্য ও নেতৃত্বরক্ষাও আশংকামুক্ত ছিল না।

পক্ষান্তরে উদারপন্থী ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস শাসিত ভারতে যোগ দিলে তাঁর নেতৃত্ব ও কাশ্মীর রাজ্য স্থাপন সম্ভাবনাময় ছিল। শেখ আবদুল্লার ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রের আদর্শ প্রবণতা এই পটভূমিতে বিচার্য। এর বেশি আজ বলব না। কাশ্মীরের ভারতে যোগদান যে সংকট পূর্ণ পরিবেশে ঘটেছিল এবং কাশ্মীর বিরোধকে নিরাপত্তা পরিষদে টেনে নেওয়া যে কত বড় ভুল ছিল সে আলোচনাও আজ নয়।

আজ এই কথাই স্মরণ করব যে শেখ আবদুল্লা তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছিলেন এবং স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতে সর্বাধিক কারাভোগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা বিফল হয় নি। কাশ্মীর সমস্যা সমাধানে শেখ সাহেব তাঁর অপরিহার্যতা প্রমাণ করেছিলেন এবং জীবনের শেষভাগ পর্যন্ত কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীরূপে কাটিয়েছিলেন। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতিপত্তি এবং জনপ্রিয়তা অক্ষুন্ন ছিল। পুত্র ডাঃ ফারুক আবদুল্লাকে কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের সভাপতিরে হিসেবে এবং রাজ্য মন্ত্রীসভায় এনে তাঁকে মুখ্যমন্ত্রীরূপে নিজের স্থলাভিষিক্ত করার ব্যবস্থাও শেখ সাহেব পাকা করে গিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর শেষ অভিলাষও অপূর্ণ থাকে নি।

জীবন সুখ দুঃখ, সাফল্য ব্যর্থতাময়। কারো জীবনেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ বিধাতা দেন নি। শেখ আবদুল্লা কাশ্মীরী শের নামে পরিচিত হয়েছিলেন। এই নামের পিছনে একটি পরিহাসময় ইতিহাস আছে। শেখ আবদুল্লা যে সময় দেশীয় রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত, সেই সময় কাশ্মীর মহারাজার প্রধান মন্ত্রী গোপাল স্বামী আয়েঙ্গারের সহিত এক বৈঠকে প্রধান মন্ত্রীর কড়া কথার উত্তরে তরুণ শেখ রেগে গিয়ে বলেছিলেন, "স্যার, মনে রাখবেন আপনি শের-ই কাশ্মীরের সঙ্গে কথা বলছেন।" গোপালস্বামী ঈষৎ হেসে জবাবে বলেছিলেন—"শার্দুলের স্থান বনে অথবা পিঞ্জরে। আপনি কোনটি চান?"

শের-ই কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার জীবনে তাঁর বিচরণ ভূমির ওপর একাধিপত্য এবং পিঞ্জরে বন্দীত্ব দুইই জুটেছিল। মহারথী শেখ আবদুল্লার স্মৃতির প্রতি আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতি

সুবোধ মজুমদার (৫)

সমাজবাসী মানুষের কাজকর্মের ওপর শ্রেয়োনীতির প্রভাব যতই দুর্বল হচ্ছে, মানুষ ততই এগিয়ে যাচ্ছে আত্মহননের দিকে। রাজনীতি ও অর্থনীতির ওপর শ্রেয়োনীতির নিয়ন্ত্রণ যতই শিথিল হচ্ছে, প্রশাসন ও বিচার বিভাগ ততই দুর্নীতি-কণ্টকিত হয়ে উঠেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে একটা দুর্নীতির পাপচক্র গড়ে উঠেছিল বিশ্বময়। এই পাপচক্র উচ্চ পর্যায়ের বিষয় ও উচ্চ পর্যায়ের মানুষ দ্বারা সংগঠিত ছিল। তাই তখন রাজনীতিক নেতাদের ধারণা ছিল এর দ্বারা সাধারণ আইন-প্রণয়ন, বিচার ও প্রশাসন কলুষিত হবে না। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মেই সে সব পাপচক্রীদের ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। আজ সামাজিক জীবনের সর্বস্তরে কর্তব্যে অবহেলা, উৎকোচ গ্রহণ, ভেজাল-মিশ্রণ, গোপন ক্রয়-বিক্রয় ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিয়েছে। এই সর্বব্যাপী দুর্নীতিরই আর একটা দিক হচ্ছে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হত্যা প্রভৃতি। ভারতের মতো বিশাল উন্নয়নশীল দেশের অপেক্ষাকৃত অসংগঠিত পরিস্থিতিতে এসব পাপ সবচেয়ে বেশী প্রকট হয়েছে। এর প্রতিকার করাও সুকঠিন, কারণ এখানে দক্ষিণ বাম সকল রাজনীতিক নেতারাই উচ্চাকাংখী এবং সাম্য-বিরোধী। এরা সকলেই পাশ্চাত্য জড়বাদী আদর্শে বিশ্বাসী।

সর্বপ্রকার সামাজিক অন্যায়কে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তার মূলে রয়েছে একটি মাত্র কারণ। সে-কারণটি হচ্ছে অসাম্যবোধ যা বলে প্রাকৃতিক জগতে কেউ কারও সমান নয়, অতএব সাম্য ব'লে কোনো ধারণা সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারে নিতান্তই অবাস্তব। এই অসাম্যবোধকে গোপন ক'রে জনসাধারণকে শোষণ করার জন্য দুটি কৌশল অবলম্বন করা হয়। একটি কৌশল হচ্ছে রাজনীতিক সমতা, অপরটি হচ্ছে ধর্মীয় সমতা। তথাকথিত রাজনীতিক সমতা ও ধর্মীয় সমতার অন্তরালে চলতে থাকে আর্থিক অসাম্যের কলাও কারবার। এই কারবারের অংশীদাররা সবাই মূলতঃ জড়বাদী হলেও বাইরে বিভিন্ন বেশ ধারণ করে। তারা কেউ বা পুঁজিবাদী, কেউ বা সমাজবাদী, কেউ বা মার্কসবাদী আবার কেউ বা গান্ধীবাদী। কিন্তু সবাই সাম্য-বিরোধী, কারণ সবাই জড়বাদী।

একমাত্র বেদান্ত-দর্শনই মানুষকে সাম্যবোধ প্রদান করে। পরব্রহ্ম থেকে উদ্ভূত সকল মানুষই মূলতঃ সমান। অর্থাৎ দেহগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও সকল মানুষই আত্মগতভাবে সমান। বেদান্তভিত্তিক যে শ্রেয়োনীতি তাও মনে করে সকল মানুষ মূলতঃ সমান। ধরিত্রীকে এবং সমাজকে উপভোগ করার অধিকার সকল মানুষেরই সমান। যে-কোনো আচরণ যা মানুষকে সমান সুযোগ থেকে বঞ্চিত করে তাই দুর্নীতিপরায়ণ। এই বৈদান্তিক শ্রেয়োনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েই জার্মান দার্শনিক কাণ্ট রচনা করেছিলেন তাঁর যুক্তিপন্থী শ্রেয়োনীতি। এই শ্রেয়োনীতির মূল বক্তব্য হচ্ছে :—

১) মানুষের পরম লক্ষ্য সুখ শান্তি তৃপ্তি উদ্ভূত হয় যুক্তির অনুশীলন থেকে।

২) যতক্ষণ মানুষ যুক্তির অধীন থাকে ততক্ষণই সে স্বাধীন। যখনই সে যুক্তিকে অতিক্রম করে কাম ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য ইত্যাদির বশীভূত হয় তখনই সে হয় পরাধীন। আর

পরাধীনতা থেকে উদ্ভূত হয় দুঃখ অশান্তি অতৃপ্তি।

৩) যুক্তি বলে সকল মানুষ মূলতঃ সমান, অর্থাৎ আপাত দৃষ্টিতে একজন মানুষ আর একজন থেকে ভিন্ন হলেও গভীর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান। একজন মানুষের দেহ-মনের বাহ্যিক প্রয়োজন আর একজন মানুষের সংগে না মিললেও আত্মিক দিক থেকে সকল মানুষই এক। সকল মানুষই চায় সুখ শান্তি তৃপ্তি আনন্দ। সকল মানুষই চায় স্নেহ মমতা বিশ্বাস শ্রদ্ধার আদান-প্রদান। কোন মানুষই চায় না দুঃখ অশান্তি অতৃপ্তি বেদনা। কোনো মানুষই চায় না অবজ্ঞা নিষ্ঠুরতা অবিশ্বাস ঘৃণার আদান-প্রদান।

৪) যুক্তি বলে আমি নিজের জন্য এমন কিছু চাইব না যা আমি অন্যের জন্য চাই না; রাজনীতির ক্ষেত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যাপারে, সামাজিক ব্যাপারে সর্বত্র এই নৈতিক সাম্য বজায় থাকলেই মানুষকে বলা চলে স্বাধীন ও কল্যাণার্থী।

এই যুক্তিপন্থী শ্রেয়োনীতির প্রাণ হচ্ছে মানবিক সাম্য। একমাত্র বৈদান্তিক জীবনদর্শনই এই মানবিক সাম্য শেখায়। বেদান্ত মানুষের বাহ্যিক দেহ মনকে মায়া বা অস্থায়ী বলেন এবং আত্মাকে স্থায়ী বলেন। যুক্তি হচ্ছে আত্মারই অংশ। আত্মার অপর একটি অংশ আবেগ। যুক্তি দেয় আলোক আর আবেগ দেয় গতি। যুক্তি ও আবেগের সমন্বয়সৃষ্ট হয় কর্ম। যতক্ষণ পর্যন্ত যুক্তি আবেগের মধ্যে সম্বন্ধ ঠিক থাকে ততক্ষণই আমরা শ্রেয়োনীতি সম্মত কার্য করি। আমাদের স্নেহ, ভালবাসা, বিশ্বাস, সততা, সরলতা, সংযম, শ্রদ্ধা, ভক্তি প্রভৃতি আবেগগুলি যখন যুক্তি-প্রদত্ত মানবিক সাম্যবোধ থেকে বিচ্যুত হয় তখনই তারা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতি দৈহিক ও অস্থায়ী প্রবৃত্তিগুলির দাসত্ব করে।

অতএব সমাজকে এবং প্রশাসন, বিচার, আইন প্রণয়ন, সংবাদ পরিবেশন, দ্রব্য-উৎপাদন, সম্পদ বণ্টন, প্রভৃতিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন হচ্ছে আদর্শবাদী জীবন-দর্শন ও শ্রেয়োনীতির প্রবর্তন। আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি বলবে দুর্নীতি পরায়ণ মানুষ নিজেরই ক্ষতি করে বেশী অপরের চেয়ে। দুর্নীতিপরায়ণ রাষ্ট্রও তেমনি নিজেরই ক্ষতি করে বেশী অপরের চেয়ে। কিন্তু কিছুসংখ্যক ব্যক্তি যখন নিজেরা প্রশাসনের নামে এবং রাষ্ট্রের নামে এবং দলের নামে লাভবান হতে চায় তখনই তারা আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতিকে লংঘন করে।

ধরা যাক আমেরিকার কথা। সেখানকার কিছুসংখ্যক লোক জঘন্য অসাম্যকে প্রশ্রয় দিয়ে অতিধনী হতে চায় বা থাকতে চায়। এই অসম বণ্টন সর্বসাধারণ পছন্দ করে না। অতএব সর্বসাধারণকেও কিছু লভ্যাংশ দেওয়া চাই। সেটা অর্জন করতে হবে বিদেশ থেকে। বিদেশী অর্থ উপার্জনের প্রশস্ত পথ হচ্ছে সমরাস্ত্র উৎপাদন ও রপ্তানী। এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজন হয় বিদেশে যুদ্ধ সৃষ্টি করা এবং সে-যুদ্ধকে চরম পর্যায়ে উন্নীত হতে না দিয়ে একটা উত্তেজনাময় পরিস্থিতি বজায় রাখা। তাই করে যাচ্ছেন আমেরিকার রাষ্ট্রীয় নেতারা। একই কাজ কম বেশী করে যাচ্ছেন রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রীয় নেতারাও। আর তাঁদের সাগ্রহে অনুকরণ ক'রে যাচ্ছেন উন্নয়নশীল দেশের রাষ্ট্রীয় নেতারাও।

অর্থাৎ সর্বত্রই কিছুসংখ্যক লোক প্রকৃতিকে ও সমাজকে সর্বসাধারণের চেয়ে অনেক বেশী উপভোগ করার নেশায় মত্ত হয়ে আছেন। আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতিকে তাঁরা বিসর্জন দিচ্ছেন জড়বাদী শ্রেয়োনীতির যূপকাষ্ঠে। জড়বাদ ও আদর্শবাদের দ্বন্দ্বে জড়বাদ জয়লাভ করছে।

আদর্শবাদী মার্কস ও লেনিন কী পরিস্থিতিতে, কোন্ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়ে যে নিজেদের জড়বাদী কবুল করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং অর্থনীতিক নির্দেশ্যবাদ প্রচার করেছিলেন সে কথা চিন্তা না ক'রে বহু লেখক যান্ত্রিকভাবে মার্কসবাদ ও লেননবাদকে ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন। ফলে মার্কসবাদী নেতারা তত্ত্ব ও প্রয়োগের দ্বন্দ্বে সমন্বয়ের পথে না গিয়ে আপোষের পথে যাচ্ছেন, অর্থাৎ আদর্শবাদকে জলাঞ্জলি দিয়ে জড়বাদী শ্রেয়োনীতিকে বরণ করেছেন। পুঁজিবাদী সাম্যবিরোধী সমাজব্যবস্থার রসটুকু আস্বাদন করতে করতে তাঁরা গণকল্যাণকামী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চান। এটা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তা সম্যক উপলব্ধি ক'রেও তাঁরা অসহায়ভাবে পুঁজিবাদী পাপচক্রের অংশীদার হয়ে আছেন। বিশ্বমানবকে যাঁরা আত্মহননের দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের সংগে তাঁরা নিজেদের যোগ্যতানুসারে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন।

এই কঠিন নির্মম পাপচক্র থেকে সমাজকে মুক্ত করার উপায় কী? সর্বগ্রাসী লোভ ও দুর্নীতির দুষ্টচক্রকে ভাঙার কি কোনো বাস্তব পন্থা নেই? নিশ্চয়ই আছে। মার্কসবাদের মধ্যে প্রকট হয়ে আছে। পন্থাটি হচ্ছে বিকেন্দ্রিকতা। আজকের সমাজে সবচেয়ে বড় অভিশাপ হচ্ছে অতিকেন্দ্রিকতা অতিকেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা, অতিকেন্দ্রিক প্রশাসন ব্যবস্থা, এবং অতিকেন্দ্রিক আবাসন ব্যবস্থা। এই অতিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে আদর্শবাদী শ্রেয়োনীতি বেঁচে থাকতে পারে না। অন্যভাবে বলা যায়, রাজনীতির পক্ষে অতিকেন্দ্রিকতা উপযোগী হলেও শ্রেয়োনীতির পক্ষে নয়। শ্রেয়োনীতির উপযোগী পরিবেশ একমাত্র বিকেন্দ্রিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই থাকতে পারে, যেখানে একটা প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত সম্বন্ধ থাকে উৎপাদক ও ভোক্তার মধ্যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে, শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে, শাসক ও শাসিতের মধ্যে, প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে। রাষ্ট্রীয় প্রশাসন বিচার বিভাগ ও আইন প্রণয়ন বিভাগকে যতটা বিকেন্দ্রিত করলে এই প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে ততটাই হচ্ছে বাঞ্ছিত বিকেন্দ্রিত অবস্থা।

বিকেন্দ্রিত অবস্থায় শ্রেয়োনীতি কার্যকর হওয়ার সংগে সংগে মুদ্রাস্ফীতিও কমে যাবে। কারণ, তখন দ্রব্য-বিনিময় ব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে এবং টাকার প্রয়োজনও কমে যাবে। অধিকন্তু আদর্শবাদী মানুষকে বাস্তব দৃষ্টিভংগি প্রদান করলে তখন সে টাকায় মত্ত না হয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য আগ্রহ।

সংবাদ বিচিত্রা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

।। দুভাবে শুধান যেগে 'গঙ্গা তুমি কার ?'
গঙ্গা বলেন কলধ্বনে 'আমার কথা
আমার মনে, কচকচি তোদের সার' ।।

কলকাতা বন্দরকে বাঁচাতে তৈরি হল ফরাক্কা প্রকল্প। প্ল্যান ইংরাজ আমলের। কোটি কোটি টাকা, ইট পাথর লোহার বাঁধনে, দেশী বিদেশী প্রযুক্তি বিদ্যার অবদানে গড়া ফরাক্কা বাংলাদেশের বাহানা মেটাতে বন্দরের জন্য নিম্নতম যে প্রয়োজন চল্লিশ হাজার কিউসেক জল তাও ভাগীরথী খাতে দিতে পারছে না। বৈঠকের পর বৈঠক বসছে, বরফ তবু গলছে না। নাভিশ্বাস উঠেছে কলিকাতা বন্দরের।

ভাগীরথী হল গঙ্গা। প্রাচীন যুগে কোন এক সময়ে ভূ-প্রকৃতির পরিবর্তন গঙ্গাকে দক্ষিণ থেকে প্রবাহী করে। যার ফলে ভাগীরথী শুকাতে থাকে। বর্তমানে গঙ্গা আবার তার আদি প্রবাহের দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে। মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তরভাগে ভটভূমি গ্রাস করতে করতে গঙ্গা এখন ভাগীরথীর সন্নিকটে। ব্যবধান দু কিলো মিটার মাত্র। গঙ্গার বৈপ্লবিক চরিত্রে এই দূরত্ব কিছুই নয়। সেচ মন্ত্রী ননীবাবু পাথর ফেলে গঙ্গার ভাঙন রোধে সচেষ্ট।

গঙ্গা প্রবাহ ভাগীরথী দিয়ে বইলে যে অঘটন ঘটবে তা ভাবতেও ভয় লাগে। সে হবে এক বিরাট নৈসর্গিক বিপ্লব। বাংলাদেশীরা গঙ্গার পানি খুবই পাবে, আর পশ্চিম বাংলার প্লাবিত ভাগীরথী ভটবাসীরা হবে গৃহ হারা। প্রাসাদ নগরী কলিকাতা ? তার কথা না ভাবাই ভাল। মা গঙ্গা বুঝি তাই চান। কলুষনাশিনী গঙ্গা কলিকাতার পাপপঙ্ক দূর করার কথা ভাবছেন বোধহয়। জয় মা পতিত উদ্ধারিণী গঙ্গে !

* *

।। মাথায় মাকড়সার জালের জট,
সব কাজে তাই বাধায় সংকট ।।

"রাজ্যের রুগ্ন শিল্পসংস্থাগুলিকে পুনর্গঠনের জন্য বড় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি হাতে নিলে বামফ্রন্ট সরকারের আপত্তি নেই"। এ কি কথা শুনি আজি মন্থরার মুখে। মার্কসবাদীরা সদা সর্বদা শিল্প-ব্যবসা রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে জিগির ছাড়েন তাতে হটাৎ এমন ভাঁটার টান কেন · রুশী-চীনী পরিবর্তনের ঢেউ এসে লাগল না কি বামফ্রন্টের কলকল্লোলে ? ওই দুই মহাতীর্থের সংবাদ—কমিউনিজমকে নরম করে তোলা হচ্ছে।

বড় শিল্প সংস্থাগুলি অর্থাৎ বে-সরকারী মালিকানা শাসিত প্রতিষ্ঠান, রাজ্য সরকারের প্রস্তাবে কতটা সাড়া দেবে তারাই জানে।' তবে অবাস্তব অসম্ভব সব দাবি তুলে শ্রমিক জনকে বিপদগামী করে চালু কল-কারখানা গুলিকে অচল করে দেবার মূলে কারা তা কারো অজানা নেই। বিধান সভার খবর পশ্চিম বাংলায় মোট রুগ্ন ও বন্ধ কল-কারখানার সংখ্যা কত সরকার তার সঠিক হিসাব রাখেন না। চমৎকার শিল্প দপ্তরের কাজ !

অনেকে বলেন, রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিবহন, এই দুই দুরারোগ্য ক্ষয়রোগগ্রস্ত সংস্থাকে টাটা-বিড়লাদের হাতে সরকার কেন তুলে দিচ্ছেন না ? সংকট মোচনের সনাতন পথের হদিস তো পেয়েই গেছেন। এতে লজ্জার কি আছে ?

।। ভদ্রলোকের এককথা।
বলেছিলাম হল না, ঘরে গিয়ে খা ।।

তারাপুর আণবিক চুল্লীর জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহিত ভারতের আলানী সরবরাহ চুক্তি মেয়াদ শেষের আগে যুক্তরাষ্ট্র বাতিল করে দিয়েছে। ফ্রান্সকে দেখিয়ে দিয়ে প্রেসিডেন্ট রেগন দায়িত্ব এড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সের আণবিক কমিশন ভারতের প্রস্তাবে সাড়া দিলেও বলেছে তেজস্ক্রিয় আলানী রপ্তানী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক খবরদারির শর্তগুলির সে রদবদল করবে না। বড় দের বেলায় এই খবরদারির দরকার নেই, যত দরকার সব ছোটদের বেলায়। মন্দ নয় তো? অবশ্য এ সম্পর্কে ভারতের সঙ্গে ফ্রান্সের কথাবার্তায় এখনো ছেদ পড়ে নি।

শোনা যায়, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা তারাপুরের জন্য একটা বিকল্প আলানী প্রস্তুত করেছেন, সেটি কেন ব্যবহার করা হচ্ছে না? হে ভারত, কতকাল তুমি পরনির্ভরতার গ্লানি শিরে বহে বেড়াবে।

• •

।। পোলাণ্ড তোমার মৃত্যু নেই যতক্ষণ
আমরা বেঁচে আছি ।।

এই গানটা পোলাণ্ডের পথে প্রান্তরে, গমের খেতে, কারখানার বিশ্রাম নিকেতনে সব সময়ই আপনি শুনতে পাবেন। এ হল পোলদের জাতীয় সঙ্গীত। সম্প্রতি পোলদের জাতীয় শ্রমিক সংগঠন সলিডারিটি সরকারী আদেশ অমান্য করে আবার লড়াই-এ নেমেছে। সলিডারিটির পিছনে আছে মোহমুক্ত ছাত্র, যুবা ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। পোলরা দাবি করছে—পোলাণ্ডে কি ধরণের শাসনতন্ত্র হবে তা ঠিক করা হোক গণভোটের মাধ্যমে। সেখানেই ফাঁপরে পড়েছেন পোলাণ্ডের কমিউনিষ্ট সরকার কারণ কমিউনিষ্ট জমানা চলে বন্দুকের নলের জোরে।

পোলাণ্ডকে কমিউনিস্ট শিবিরে ভর্তি করার সময়, স্তালিন পোলাণ্ডের আনুগত্য সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি জানতেন, পোলদের অদম্য স্বদেশ প্রেম ও ক্যাথলিক ধর্ম বিশ্বাসকে লাল আবর্তে ডুবিয়ে মারা সহজ হবে না। হয়েছেও শেষ পর্যন্ত তাই। জাতীয় সংস্কৃতি সচেতন পোলাণ্ড প্রবাদ-কথিত ফিনিকস পাখির মত ভস্মস্তূপ থেকে আবার গা ঝাড়া দিয়ে উঠেছে।

• •

।। স্বঘাত সলিলে ডুবায়ে সকলে,
মুক্তির পথ খোঁজেন প্রফুল্ল সেন ।।

প্রফুল্ল দা সদলবলে আগামী ১লা অক্টোবর থেকে পশ্চিমবংগের বিভিন্ন এলাকায় প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি, সন্ত্রাস, স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য পদযাত্রা শুরু করবেন। (আঃ বাঃ ১৪।৯।৮২) যাত্রা করবেন মহাজাতি সদন থেকে, পরিক্রমা চলবে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর পর্যন্ত। ছিয়াশি বছরের প্রবীণ নেতার এই অভিযান গান্ধীজীর ডাণ্ডী—পথ যাত্রার মত সফল হোক ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা জানাই। প্রফুল্লদা জিন্দাবাদ।

• •

।। কহ এবে সখা কি তব মনস্কাম? ।।

জেনারেল জিয়া সম্প্রতি এক বিবৃতিতে বলেছেন সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্থানের কোন বিরোধ নেই। তিনি সোভিয়েত—পাকিস্থান সম্পর্কের

উন্নতি চান। আফগানিস্থানে রুশ সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতিকেও তিনি তেমন খারাপ চোখে দেখেন না। কয়েক লক্ষ আফগান উদ্বাস্তুর পাকিস্থানে প্রবেশ একটা সমস্যা বটে, তবে জেনারেল জিয়া জানেন এ সমস্যা সৃষ্টির মূলে তাঁর অবদান নগণ্য নয় এবং সমস্যাটি ক্ষতির কারণ না হয়ে তাঁর অভীষ্ট পূরণের কত বড় সহায়ক হয়েছে। তা না হলে কিসের অনুহাতে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মন ভজিয়ে কোটি কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সম্ভার এবং অত্যাধুনিক এফ—১৬ বিমান বহর হাতাতে সক্ষম হতেন? প্রশ্নটা এখন, এই বিপুল পাক-সমরায়োজন সখা কিসের জন্য? ভারতের সঙ্গেও তো তুমি যুদ্ধ বর্জন চুক্তি চাও, ভারতও তাই চায়। সিমলা চুক্তি যার প্রামাণ্য পটভূমি। তা হলে, তাহলে কি তব মনস্কাম" জিয়া সাহেব, একটা কথা বলতে পারেন, কেন আপনি পাকিস্থানের ত্রিশ ডিভিসন সৈন্যর মধ্যে তেইশ ডিভিসনকে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত বরাবর সন্নিবেশ করেছেন?

* *

। নিধের মায়ের চালে বিঞে।
বৌকে মেরে বাজায় শিঙে। ॥

সেচ মন্ত্রী ননী ভট্টাচার্য বলেছেন, "প্রশাসনকে কর্মদক্ষ করে তুলতে পারলেই দুর্নীতির রন্ধ্রপথে অর্থ বেরিয়ে যাবে না। তাতেই ব্যয় সঙ্কোচ হবে। দুর্নীতি পরায়ন অদক্ষ প্রশাসনই আমাদের কর্ম কাণ্ডের প্রধান প্রতিবন্ধক।" তিনি বিদ্যুৎ ও পরিবহন ব্যবস্থার কড়া সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে বিদ্যুৎ ও পরিবহন যে হালে পৌঁছেছে তা এক রকম ভেঙ্গে পড়ার মুখে। সরকারী বাস প্রতি ২৬ জন কর্মী শুধু ভরতুকি দেবার অঙ্ক বাড়াচ্ছে। (আঃ বাঃ ৬।৯।৮২)

বয়সের ভারে ননীবাবু প্রশান্ত হলেও, তাঁর মনের বিপ্লবী চেতনার আগুন নিভে নাই। এ আগুন নিভে না। জ্যোতিবাবুরা কি তা বোঝেন? তা বুঝলে তিনি খপ করে কি আদেশ দিতেন যে, প্রকাশ্যে অস্ত্রের দপ্তর সম্পর্কে মন্ত্রীরা মন্তব্য করবেন না। (আঃ বাঃ ৮/৯/৮২)। মন্ত্রীদের মুখ বন্ধ করার নোটিশ জারি করেও কিন্তু বামফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কলহ থামানো যায় নি। তাই ১৩ই সেপ্টেম্বর বামফ্রন্ট বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে মন্ত্রীদের মত ফ্রন্টের এম-এল-এ-রাও এখন থেকে প্রকাশ্যে সরকারের সমালোচনা করতে পারবেন না। এমন কি বিধান সভাতেও সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে নিজেদের ইচ্ছামত কথা বলার অধিকার তাঁদের থাকবে না। (আঃ বাঃ ১৪।৯।৮২) অন্যদিকে বাম ফ্রন্টের বিধান-সদস্যদের সমালোচনার অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে কিনা এমন সংশয় অনেকের মধ্যে দেখা দিয়েছে। দেখা যাক কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

এ রহস্যের জবাব কি ?

—ষ্টাফ রিপোর্টার

৪ সেপটেম্বর ১৯৮২ শনিবার বাজেট উত্থাপনের দিন বিধান সভায় প্রচারিত হিসাবে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত মোট ২০টী ব্যবসা ও শিল্পের মধ্যে মাত্র দুইটি ছাড়া ১৯৮১-৮২ সালে বাকী ১৮টীতেই লোকসান হয়েছে এবং ১৯৮২ ৮৩ সালে একই অবস্থা চলবে বলে প্রকাশ করা হয়েছে।

লাভ হয়েছে হাতে তৈরী ইটের কারবারে ১৭ লক্ষ ৪৭ হাজার টাকা এবং ট্যুরিষ্ট বাসে ১ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা। বাকী কয়টীর অবস্থা দুঃস্থ সরবরাহ প্রকল্পে ১৯৮১ ৮২ সালে সাত কোটি ৬ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে, ১৯৮২ ৮৩ সালের বাজেটে দেখা যায় ঐ লোকসান ৯ কোটি ৮০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াবে, ওরিয়েন্টাল গ্যাস কোম্পানীর ১৯৮১ ৮২ সালে লোকসান ১কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং চলতি বছরের শেষে দাড়াবে ১ কোটী ৬৯ লক্ষ টাকায়। ১৯৮১-৮২ সালে লোকসানের পরিমাণ বার্নপুর ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট ১লাক্ষ ৬৫ হাজার টাকা কল্যাণী ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এষ্টেট ৬ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা, ইণ্ডিকাফ চাষ প্রকল্প ৫৯ লক্ষ ২১ হাজার টাকা. হাওড়ার সেনট্রাল ইঞ্জিনিয়ারিং।

করপোরেশন ৩ লক্ষ ৫ হাজার টাকা, কল্যাণী ও দুর্গাপুরে কাঠ শিল্প কেন্দ্র ৮লাক্ষ ৩৮হাজার, শিশল চাষ ৭লক্ষ ৫ হাজার, যন্ত্রে তৈরী ইট শিল্প ৩০ লক্ষ ৯৪ হাজার, মুরগী ও ডিম উৎপাদন ও বিক্রি ২৩ লাখ ৯১ হাজার টাকা দুর্গাপুর দুধ প্রকল্প ৭০ লাখ ৫৪ হাজার, হাওড়া কেন্দ্রীয় তালা কারখানা ২ লাখ ৪৩ হাজার টাকা, হাওড়া শিল্প এষ্টেট ৮ লাখ ৪৮ হাজার টাকা, শক্তিগড় শিল্প এষ্টেট ১ লাখ ৮ হাজার টাকা, সার্ভিসিং ষ্টেশন ৩ লাখ ৭ হাজার টাকা, সিনকোনা চাষ প্রকল্প ১ কোটি ১৯ লাখ ৬৪ হাজার টাকা. শিলিগুড়ি কাঠ শিল্প কেন্দ্র ৭১ হাজার এবং মানিক তলা শিল্প এষ্টেট ৬০ হাজার টাকা।

ষ্টেট বাসের অবস্থা আরও ভয়াবহ। ষ্টেট বাসে প্রতিমাসে লোকসানের পরিমাণ এক কোটি টাকা সরকারী সমীক্ষায় দেখা যায় কলিকাতা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশনের ১৯৭৬ ৭৭ সালে ৭৫টী রুট ছিল, ১৯৭৭-৭৮ সালে তা ৮৬, ১৯৭৮ ৭৯ তে ৯০, ১৯৭৯-৮০ তে ১০১ এবং ১৯৮০-৮১ তে ১০৭টি রুটে দাঁড়িয়েছে।

১৯৭৬-৭৭ সালে যাত্রী সংখ্যা ছিল, ২১,৬৮, ৯৭,০০০ ১৯৭৭-৭৮ সালে ২৬,০৩০০০০০ ১৯৭৮ ৭৯ সালে ২৮,৮৪,০০০০০ ১৯৭৯-৮০ সালে ৩৬,৩৬, ০০০০০ ও ১৯৮০-৮১ সালে ৩৯,৮৯০০০০০, লাভের হার শূন্য। ক্ষতির পরিমাণ বেড়েই চলেছে সমীক্ষায় দেখা যায় ১৯৭৬-৭৭ সালে ১১ কোটি ১৮ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা ১৯৭৭-৭৮ সালে ১৩ কোটি ৮ লক্ষ ৭৬ হাজার টাকা ১৯৭৮-৭৯ সালে ১৪ কোটি ১২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এবং ১৯৭৯-৮০ সালে ১৫ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা লোকসান হয়েছে।

রুট ও যাত্রী সংখ্যা বাড়া সত্বেও ক্ষতির পরিমাণ বাড়ার কৈফিয়ৎ কি ? এ বিষয়ে সরকারী সমীক্ষা নীরব কেন ? এ রহস্যের জবাব কি ?

সমকারী সমীক্ষায় এটাই প্রমাণ করে শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যবসায়ে বামফ্রন্ট সরকার চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই ব্যর্থতা দূর করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেই, কোন সংগ্রাম নেই অথচ রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন সংস্থার সুষ্ঠু পরিচালনার উপরই নির্ভর করে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎকর্ষতা এদিকে নজর না দেওয়া মার্কসবাদকে উপেক্ষ

বামফ্রন্ট সরকার জনগণের লড়াইএর হাতিয়ার, নেতারা বলেন। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের লড়াই এর চরিত্র কি? প্রশাসনে দুর্নীতি চুরি, গাফিলতির বিরুদ্ধে লড়াই নয়। ইহা কি পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের লড়াই কিংবা বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সর্বহারার লড়াই অথবা সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর নায়ক মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে রাজ্যের দেশপ্রেমিকদের ঐক্যবদ্ধ লড়াই। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই ধরণের মূল লড়াইয়ের ধারে কাছেও নেই। বাস্তবে দেখা যায় এদের লড়াই আর্থিক সুযোগ পাওয়ার লড়াই: লড়াই দুই ফ্রন্টে, দিল্লী ও শরীকি ফ্রন্ট, দিল্লী ফ্রন্টে আপাততঃ চলছে আসেপাশে কিছুটা ভাগ পাওয়ার লড়াই আর শরীকি লড়াই-এ সরকারী দপ্তরের সিংহভাগ পাবার লড়াই প্রথম ফ্রন্টে লড়াইএর অস্ত্র তর্জন-গর্জন হতে আবেদন নিবেদনে নেমেছে। দ্বিতীয় ফ্রন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার উদ্দামতা চলছে।

মুখ্যমন্ত্রী দিল্লী হতে জয়তিলক পরে আসেন নি। এসেছেন পরাজিতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে। বাজেটে ও এর ওপর মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে এর প্রতিফলন পড়েছে। পুঁজির বিরুদ্ধে শ্রমের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম আপাততঃ মুলতুবি রেখে সুরু হয়েছে সরকারে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। বেকার ভাতা, কৃষক পেনসন সামান্য সংখ্যককে দিয়ে কৃষকদের চুষিকাঠি দিয়ে ঘুম পাড়ান ছাড়া অন্য কিছু নয়, ওদের নিষ্ক্রীয় করার কৌশল। এতে কোন স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি হয় না, উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থাও হয় না। এটা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন ধাপ হতে পারে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের কাল হতে ত্যাগ ও তিতিক্ষার দ্বারা জনগণের মধ্যে যে চেতনা, ঐক্য ও সংগ্রামী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্যের বিরুদ্ধে যে একতার মঞ্চ গড়ে উঠেছিল সি, পি, এম এর দলবাজির মাদকতায় তা কি নড়বড়ে হতে চলেছে না। সি, পি, এম নেতারা ভেবে দেখবেন কি?

পশ্চিম য়ুরোপে বিশেষ করে ফ্রান্স ইতালীর কমিউনিষ্ট পার্টি ওদের কর্মপন্থায় দেশপ্রেম নিবিড়তর করে সমাজতন্ত্রের নতুন পথে অগ্রসর হতেছে। পোল্যাণ্ডের শ্রমিকরা (সলিডারিটী কমিটী) কমিউনিষ্ট শাসিত রাষ্ট্রেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে। বামফ্রন্ট সরকারের সমাজতন্ত্রের পথে এগিয়ে যাওয়ার পথ কি? পুরা পাঁচ বছর শাসন কায়েম রেখেও প্রশাসনে সামান্যতম দেশাত্মবোধ বা সামাজিকবোধ বা কর্তব্যবোধ কর্মীদের মধ্যে জাগাতে পারেনি; সব তোয়াজই ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু সি, পি, এম এর দায়িত্বশীল কর্মীরা যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার করছেন তা প্রশাসনকে কোথায় নিয়ে যাবে বামফ্রন্ট সরকার ভেবেছেন কি? ২রা সেপটেম্বর ১৯৮২ যুগান্তর দৈনিকে সাম্পাদকীয়তে প্রকাশ সংসদ সদস্য আইনজ্ঞ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর ভাগ্নে অমল দত্ত তাঁর পরিচিত একজন রোগীর ব্যাপারে যে ভাবে এবং যে ভাষায় স্যাশন্যাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সুপারিনটেনডেণ্ট ডাঃ সুজিত মিত্রকে তাঁরই অফিসে বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছেন তা কোন বিবেকবান বা কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন মানুষের কাছে আশা করা যায় না। অমল বাবুর মত বিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল সি, পি, এম নেতা কোন আইন শৃঙ্খলা বা রীতিনীতির তোয়াক্কা করার প্রয়োজন বোধ করে নাই। এই রকম ঘটনা আরও উল্লেখ করা যায়।

এই পরিস্থিতি চললে আইনশৃঙ্খলার যে অধঃপতন হবে তাতে ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ছাড়া অন্যপথ থাকবে না। ১১-৯-৮২ইং

RegdNo.R. N .24911/71 | Biplabi Bangla | P. Regd. W B/NC 77
DAV—Regd | Phone : 34-1795
বার্ষিক :—সডাক ১৮.০০ টাকা | বাষ্মাষিক :—১০.০০ | মূল্য—৩০ পয়সা

॥ সম্পাদকমণ্ডলী ॥

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

(সম্পাদক —)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীকামাক্ষা রায়

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

C/30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। সৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—৭.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামী মা ও মে: ১০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৪ ১১। মহারাষ্ট্র ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ৫ ... বুদ্ধিজীবী—.৭০, ১৩। দেশ বাঘের জোনেনি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের জোনেনি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাতির হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০৫, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বলাই দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

মৈত্রশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বলাই দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত
... লিমিটেড পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

গান্ধী জয়ন্তী সংখ্যা—১৯৮২

বিপ্লবী বাংলা

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ১৫ই আশ্বিন ১৩৮৯ ২রা অক্টোবর ১৯৮২	৩য়/৪র্থ সংখ্যা

SEVEN SINS

Politics Without Principle,

Wealth Without Work,

Pleasure Without Conscience,

Knowledge Without Character,

Commerce Without Morality,

Science Without Humanity,

Worship Without Sacrifice.

—Mahatma Gandhi, 1921

সম্পাদকীয়

মহাত্মা গান্ধী

এই ধূলার ধরণিতে এক একজন মানুষ আসেন যাঁরা বহু দুঃখ কষ্ট, বড় ঝাপটার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠেন যেন ভূমিকম্পের ফলে সহসা উদ্ভিত গিরিশৃঙ্গের মত। তাদের খুব একটা জন্মগত বিশিষ্ট ঐতিহ্য থাকেনা। তাঁরা লোকচক্ষে নিজেদের সম্মানের আসন লাভ করেন নানা প্রকার বাধাবিঘ্ন ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে। তাঁদের কঠোর তপস্যা, আদর্শ, নিষ্ঠা, চরিত্র, বল ও দুর্জয় সঙ্কল্পের মাধ্যমেই পাদপ্রদীপের সামনে আসতে হয়। মহাত্মাগান্ধী এই শ্রেণীর একজন অবিসম্বাদিত নেতা। ভারতবর্ষের গুজরাট প্রদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন ১৮৬৯ সালে ২রা অক্টোবর তারিখে, আজ থেকে প্রায় একশত তের বৎসর আগে। তাঁর এবারের জন্মজয়ন্তীতে সারা ভারত তথা সমগ্র পৃথিবী তাঁকে স্মরণ করবে ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করবে। শুধু তাই নয়, নানাবিধ সমস্যা কণ্টকিত বিশ্বের মানুষ আজ যখন সমগ্র মানবজাতির চরম ধ্বংসের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন, তখন স্মরণ করবে তাঁর শান্তির বাণী। একান্তভাবে অনুভব করবে তাঁর প্রচারিত নীতি ও তাঁর প্রদর্শিত পথে চললে হয়ত মানবজাতির এরকম চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে হত না।

গান্ধীজীকে তাঁর সমসাময়িক বহু মানুষ শুধু বুঝতেই পারেননি বরং বহুক্ষেত্রে তাঁকে ভুল বুঝেছেন এবং তাঁকে উপহাস করেছেন। এমনকি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মধ্যেও অনেকেরই তাঁর সম্বন্ধে একটা বিরূপ ধারণা ছিল। এ সত্যও অনস্বীকার্য, যারা তাঁর জীবিত কালে তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন এবং তখন তাঁর নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে লিপ্ত থেকেছেন তাঁদের মধ্যেও অনেকেই গান্ধীজীর দর্শনকে বুঝতে পারেন নি। তাদের চরিত্রের উপর গান্ধীচরিত্রের যে প্রভাব পড়েছিল, তা তাদের উপর কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারে নি এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ বেদনাহতচিত্তে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, গান্ধীজীর অন্তর্ধানের পরবর্তী কালে। গান্ধীজীর সত্যানুরাগ, গান্ধীজীর ভগবৎবিশ্বাস, মানবীয় মূল্যবোধের উপর গান্ধীজীর অবিচল আস্থা, সর্বোপরি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে মানব কল্যাণ ব্রতে নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে আত্মনিবেদন এই মহৎ আদর্শগুলি থেকে তারা বহুল পরিমাণে বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। নেতৃবৃন্দের এই দুর্বলতার জন্য সারা দেশে আজ নৈতিকতার মান নিম্নাভিমুখী হয়ে চলছে, যার জন্য আজ দেশের চিন্তাশীল দেশপ্রেমিক মানুষ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের উপর অমানবিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে গান্ধীজী সেই উদ্ধত ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে বলতে গেলে তাঁর নিজের আবিষ্কৃত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতীয়দের অধিকার আদায় করেছিলেন। বলাবাহুল্য, বিদেশ বিভূঁইয়ে এককভাবে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য তাঁকে অশেষ নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে গান্ধীজী নিজেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে একান্তভাবে উৎসর্গ করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের গুলি ও রাউলাট অ্যাকটের বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করতে তিনি অগ্রসর হলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ রাজ বিপ্লবী নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করে রাখেন দীর্ঘদিন। অন্যদিকে অন্য কোন আন্দোলনও জোরদার ছিল না। গান্ধীজী নিজের

বিশ্বাস অনুযায়ী তাঁর নিজস্ব চিন্তাপ্রসূত অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের প্রবর্তন করলেন ১৯২১ সালে। বহুলোক তাঁর নেতৃত্বে কারাবরণ করলেন। দেশের মানুষের মন থেকে তিনি ইংরেজ জুজুর ভয় দূর করে দিলেন বহুল পরিমাণে। বিপ্লবীরা অনুভব করছিলেন সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল করতে না পারলে, ইংরেজ শক্তিকে এদেশ থেকে বিদূরিত করা সম্ভব হবে না। গান্ধীজী ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের প্রবর্তক ও পথিকৃৎ। স্বামীজীকে অনুসরণ করে তিনি দেশের মানুষকে অভী:মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। এটা গান্ধীজীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান।

গান্ধীজীর জীবনদর্শ ছিল আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে স্বাধীনতালাভের প্রচেষ্টা করা। কিন্তু বারংবার তাঁর প্রচেষ্টাকে যখন ইংরেজ রাজশক্তি কোন মূল্য দিল না, বরং একে দুর্বলতার লক্ষণ বলে ধরে নিল, তখন গান্ধীজী সংঘর্ষের পথ বেছে নিলেন ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন সুরু করে। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি ভিন্নমতাবলম্বী স্বাধীনতাসংগ্রামীদের সঙ্গে একটা আলাপ আলোচনা করে তাদের কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত করে স্বাধীনতাসংগ্রাম নবোদ্যমে সুরু করলেন। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহ সমগ্র দেশের মধ্যে অকল্পনীয় দেশপ্রেমের বন্যা বইয়ে দিল। গান্ধীজীর এই অবদানকেও সকলেই মেনে নিতে কোন দ্বিধা করবেন না। তারপর কিছুদিন অন্যান্য ক্ষেত্রে ইংরেজ রাজশক্তির বিরোধিতা করার কার্যক্রমও অনুসরণ করা হল। ১৯৪২ সালের বিখ্যাত 'ইংরেজ ভারত ছাড়' ডাক দিয়ে আন্দোলনের একটি দিগন্ত খুলে দিলেন। মনিকাঞ্চনের সংযোগের মত বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু ও নেতাজীর নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজ সশস্ত্র সংগ্রামে সুরু করে পরদেশী শাসনের ভিত্তিমূল শিথিল করে দিলেন। দেশদ্রোহী একটি রাজনৈতিক দল যদি বিশ্বাসঘাতকতা না করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কীর্তি কলাপের কথা দেশবাসীর নিকট থেকে ইংরেজদের ইঙ্গীতে জনসাধারণকে অন্ধকারে না রাখত, তবে দেশের স্বাধীনতার রূপটি হত ভিন্নরকমের। দেশবাসী অবশ্য পরবর্তী কালে বিস্তারিত সংবাদ পেয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার নেতৃবৃন্দকে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছিল। গান্ধীজী স্বয়ং তাদের এই অবদানকে স্বীকার করেছিলেন। এটাই ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার পরিচয়।

গান্ধীজী ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন সমস্ত মানবজাতির কল্যাণ সাধনের জন্য উৎসর্গীকৃত একজন মহামানব। তাই কখনও কখনও তাঁর অনুসৃত নীতির সঙ্গে ভিন্নমত হলেও, তিনি যে মানবজাতির একজন মুক্তিদাতার ভূমিকা গ্রহণ ও পালন করেছিলেন এ সত্য আজ সর্বজনস্বীকৃত। তাই তাঁর সমসাময়িক একজন ভিন্নদেশীয় দার্শনিক বলেছিলেন যে ভবিষ্যৎ কালের মানুষের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হবে যে এমন একজন মানুষ এই ধূলার ধরণীতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং এখানে কাজকর্মে লিপ্ত ছিলেন।

গান্ধীজীকে কেউ কেউ ধনিক শ্রেণীর সমর্থক বলে চিহ্নিত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু গান্ধীজী ছিলেন আত্মস্বার্থশূন্য পরহিতব্রতী। তিনি সকলের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটাতে প্রয়াস চালিয়েছেন আজীবন। নিজস্ব বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। আজ যারা সর্বহারাদের অছি সেজে বাজার গরম করছেন; অথচ নিজেরা ভোগবিলাসে মত্ত আছেন, তাদের নিকট গান্ধীজীর জীবন দর্শনের একটি

উক্তিই প্রমাণিত করবে যে তিনি ধনীদের সমর্থক ছিলেননা। তিনি ছিলেন পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে তিনি পাখীদের জীবনাদর্শকে অনুসরণ করেন। অর্থাৎ প্রতি দিনের প্রয়োজনের চেয়ে একটি কণাও সঞ্চয় করতে চান না পরের দিনের জন্য।

গান্ধীজীর মৌল দর্শন ছিল অহিংসা প্রেম ও মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠা করা। রাজনৈতিক মঞ্চ তাঁর পছন্দমত কর্মক্ষেত্র ছিল না। ঘটনাচক্রে তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তিনি নিজেই বলেছেন রাজনীতি তাঁকে সাপের কুণ্ডলীর মত বেষ্টন করে রেখেছিল। যতই তিনি এই বেষ্টনী থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করেন ততই তিনি এই বেষ্টনীর মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। এটাই হয়ত তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। পৃথিবীর একটি বিরাট অংশের মানুষদের উপর যখন বিদেশী শাসন চরম অত্যাচার, নির্য্যাতন ও নিপীড়ন চালিয়ে একটা ঐতিহ্যপূর্ণ জাতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, মানবতার খাতিরেও তিনি এই অন্যায় মেনে নিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর জীবনদর্শন সাধারণ রাজনীতিবিদদের মত যেকোন উপায়ে উদ্দেশ্য লাভ করার নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। তারই জন্য অনেকেই তাঁকে ভুল বুঝেছেন।

পথ ভিন্ন হলেও, সব দেশপ্রেমিকদের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অকৃত্রিম। অহিংসাবাদের প্রবর্তক গান্ধীজীর নিকট বিপ্লবী ভগৎ সিং, রাজগুরু, শুকদেবের ফাঁসির হুকুম রদ করতে তাঁর নিজস্ব মতবাদ কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারেনি। বস্তুতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় সর্বশ্রী হরিদাস মিত্র, ডাঃ পবিত্র রায়ের ফাঁসির হুকুম স্থগিত হয়েছিল। বিপ্লবীদের প্রতিও তাঁর একটা প্রশংসার মনোভাব ছিল। ইংরেজ রাজশক্তির একটা মানসিক পরিবর্তনের প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ করতে পারবেন বলে তাঁর আশা ছিল। কিন্তু সেই শুভ প্রচেষ্টায় বিফল হতে দেখে ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়, তাতে ভারতবর্ষে যদি নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়, তবুও ইংরেজদের ভারত ছাড়তে বলতে দ্বিধা করেন নি।

গান্ধীজীর সমসাময়িক কালে, তাঁর নতুন মতবাদের উপর বহুলোকের বিশ্বাসের অভাব ছিল। কিন্তু আজকে স্বীকার করতেই হয় যে গান্ধীজীর মতবাদের একটা মূল্য তখনও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে।

গান্ধীজীর চরিত্রের একটি বিশেষ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ না করলে, তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে। ভারতের লক্ষ লক্ষ গ্রামগুলির উন্নয়ন সাধনের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। গ্রামীণ অর্থনীতি তিনি খুব ভালভাবেই বুঝেছিলেন। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে সমানতালে গ্রামীণ অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্যও অভিযান চালিয়েছেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত গ্রামীণ শিল্প প্রতিষ্ঠান, খাদিসংঘ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি আজ স্বাধীন ভারতে তেত্রিশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান করছে। ভাঙ্গা ও গড়ার কাজ তিনি সমানভাবে চালিয়েছেন।

গান্ধীজীর জন্মদিনে আমরা তাঁর উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। প্রত্যাশা করি, ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র বিশ্বে মানবীয় মূল্যবোধের পুর্নপ্রতিষ্ঠা ঘটুক এবং সারা পৃথিবীতে হিংসা, দ্বেষ, হানাহানি সাম্রাজ্যলিপ্সা প্রভৃতির মত মানবজাতির পক্ষে চরম ক্ষতিকর রিপুগুলি চিরতরে সমাধিলাভ করুক। সব মানুষের জন্য সাম্য, মৈত্রী, প্রেম ও ভালবাসার জমানা সৃষ্টি হোক্।

গান্ধীজীর শিক্ষা

অন্নদাশংকর রায়

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজী চরকা কেটে গেছেন। তাঁর কাছে এটা রীতিরক্ষা ছিল না। ছিল তাঁর মতবাদের প্রয়োগ, তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা কাজে পরিণত করতেন।

কিন্তু কেন তিনি চরকায় বিশ্বাস করতেন? এই বৈজ্ঞানিক যুগে এত রকম যন্ত্রপাতি থাকতে চরকায় সুতো কাটতে হবে কেন? তাঁতেরই বা কি দরকার? মানুষকে সেকেলে ধরণে তাঁত চরকার পেছনে সময় নষ্ট করতে হবে কেন? আরো কম সময়ে আরো বেশী উৎপাদন করা যখন সম্ভব তখন কেনই বা উৎপাদনের জন্য চরকাকে সম্বল করা?

গান্ধীজী এ প্রসঙ্গে বার বার বলেছেন, বার বার লিখেছেন। তাঁর কথা আমি কিশোর বয়সে মেনে নিয়েছি। কিন্তু যৌবনে মানতে অস্বীকার করেছি। আমার যুক্তিতর্ক শুনে আমার বাবা বলেন, 'আমি খদ্দর পরি দেশের বেকারদের কাজ যোগাতে। তুমি যদি খদ্দর না পর তবে ওদের কাজ যোগাবে কি করে?'

সেদিন বাবাকে আমি যে উত্তর দিয়েছিলুম তা সেই মামুলী উত্তর। দেশকে প্রথমে স্বাধীন ক'রে তারপরে শিল্পায়ত করতে হবে। তা হলে সবাই কাজ পেয়ে যাবে। কেউ বেকার হবে না।

কিন্তু স্বাধীনতার এত বছর বাদে কি দেখছি? বাবা বেঁচে থাকলে জানতে চাইতেন দেশের বেকারদের কি কাজ আমরা যুগিয়েছি? ওদের সংখ্যা কি কমতির দিকে না বাড়তির দিকে? শিল্পায়ন কি ওদের দিক থেকে হিতকর হয়েছে, না অহিতকর? কলকারখানা কি ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিচ্ছে? না ওদের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে?

এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। তাই গান্ধীজীর যুক্তি এখনো তেমনি জোরদার, যেমন ছিল পঞ্চাশ বছর আগে। যখন তিনি সবাইকে খদ্দর পরতে চরকা কাটতে বলেন। তাঁর মতে দেশের বেকার জনগণকে কাজ যোগাতে হলে আবার ঘরে ঘরে কারুশিল্প প্রবর্তন করতে হবে। গ্রামে গ্রামে তার বাজার থাকবে। কারুশিল্পকে ধ্বংস করে, তার বাজার বেদখল করে যা হবে তাতে জনাকতক লোকের ধনসম্পদ বৃদ্ধি হলেও অগণিত নরনারীর দারিদ্র্য দূর হবে না। স্বরাজ কি তা হলে শুধু জনাকতক লোকের জন্যে—কোটি কোটি লোকের জন্যে নয়?

দেশের সমৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়? সব মানুষের সমৃদ্ধি, না কতক মানুষের সমৃদ্ধি? গান্ধীজী সব মানুষের জন্যে ভাবতেন বলেই ঘরে ঘরে কারুশিল্পের স্বপ্ন দেখতেন। যার প্রতীক হলো চরকা। তাঁর স্বপ্নে তিনি আজীবন একাগ্র ছিলেন। আমরা যদি তাঁর শিক্ষা অগ্রাহ্য করি তবে কর্মহীন জনগণের কাজ জোগানোর দায়িত্ব বহন করব কি করে?

●

মহাত্মা গান্ধী

কালীপদ সরকার

বিরাট সাফল্য এবং বিরাট ব্যর্থতা পরিবৃত, সরলতা এবং দুর্বোধ্যতা বিজড়িত, বিতর্কিত চরিত্রের বনস্পতি তুল্য মহামানব মহাত্মা গান্ধীকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা সহজ সাধ্য নয়। একথা তথাকথিত গান্ধী শিষ্যদের সম্পর্কেও বলা চলে। মহাপুরুষকে সমকালীন ধ্যান ধারণার বিচারে পরিমাপ করা যায় না, তিনি অনাগত দিনের ধূসর দিগন্তের পথচারী। মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে একথা অনেকাংশে সত্য।

সেন্ট জন খ্রীষ্ট সম্বন্ধে বলেছেন, "যদিও তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কিন্তু যখন তিনি এই পৃথিবীতে এলেন, পৃথিবী তাঁকে চিনলো না। এমন কি তাঁর জন্মভূমি এবং স্বজাতীয়গণ তাঁকে প্রত্যাখান করল।"

শুধু কি তাই, খ্রীষ্টের অন্তরঙ্গ পরিকরগণ চরম পরীক্ষা কালে প্রভুকে পরিত্যাগ করেছিলেন। সেন্ট পিটার বলেছিলেন, আমি খ্রীষ্টকে চিনি না। (I know not the man.) অবশ্য খ্রীষ্ট পরিকরবৃন্দ তাঁদের সেই সাময়িক ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন এবং জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তাঁদের আত্মদানের মহিমা—খ্রীষ্টের শিক্ষাকে বিশ্ব বরেণ্য করেছিল।

দেশ বিভাগ মেনে রাষ্ট্রক্ষমতা লাভে উদ্যত গান্ধী শিষ্যগণও গান্ধীজীকে বর্জন করেছিলেন, তবে সেই গুরু বর্জনের অপরাধ তাঁরা স্বীকার করেন নি, কারণ তাঁরা জ্ঞানপাপী।

গান্ধীজী বলেছিলেন, দেশ বিভাগ যদি হয় তবে তা হবে আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে। প্রকৃত পক্ষে হয়েছিলও তাই। নাথুরাম গডসে মহাত্মার লৌকিক মৃত্যু ঘটিয়েছিলেন, কিন্তু গান্ধীজীর আত্মিক মৃত্যু তার আগেই হয়ে গিয়েছিল এবং তা হয়েছিল তাঁর শিষ্যবৃন্দের হাতে। তা না হলে জীবন সায়াহ্নে পরম দুঃখে গান্ধীজী কি বলতেন, "আমার বন্ধু ও শিষ্যেরা যে সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় উঠেছেন তাঁরা সেই সিঁড়িকে এখন পদাঘাতে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন"। (হরিজন/১৯৪৭)

তাই আমরা দেখি, ১৯৪৭ সালের বর্ণাঢ্য স্বাধীনতা উৎসব সমারোহে স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিনায়ক গান্ধীজী অনুপস্থিত। উল্লাস কলরব মুখর নয়া দিল্লি থেকে অনেক দূরে পূর্ব-কলিকাতার এক নির্জন পুরাতন ভবনের মেঝেতে মাদুরে বসে তিনি তখন প্রার্থনারত, আর মন প্রাণ দিয়ে শুনছেন তাঁর প্রিয় গানটি—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে॥"

সব বিপ্লবী জীবনের এই বোধহয় শেষ কথা, শেষ পুরস্কার। মহাজীবনের সেই বেদনার্ত স্বরও বেশিদিন শোনা গেল না। প্রলয় কাল-প্রভঞ্জন তাঁকে চিরদিনের মত নিস্তব্ধ করে দিয়ে গেল।

আজ যদি গান্ধীজীর শিক্ষার প্রভাব জাতীয় জীবন থেকে দূরে চলে গিয়ে থাকে তাহলে তার জন্য দায়ী গান্ধী শিষ্যবর্গ—যাঁরা দীর্ঘকাল কতকগুলি উপগ্রহের মত গান্ধীজীকে ঘিরে একটি কৃত্রিম জ্যোতিষ্ক মণ্ডল গড়েছিলেন।

গান্ধীজী বলতেন, "প্রচার কাজের একটিমাত্র পথ আমি জানি তা হল—আচরণ করে এবং আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর সহিত আলোচনা করে।" এই আচরণ প্রভাবে বেতার ও টেলিভিশন ছাড়াই গান্ধীজী ভারতবর্ষের দীনতম কুটীর বাসীর দ্বারে পৌঁছেছিলেন এবং দেশের মোহনিদ্রার অবসান

ঘটিয়েছিলেন। "পোরা আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়" এই মহাজন বাক্যের প্রেরণা সঞ্চারী দৃষ্টান্ত স্থাপন করে একটি আচরণ ভিত্তিক রাজনৈতিক আদর্শ তিনি গড়েছিলেন যা ছিল প্রকৃতিতে অভিনব এবং শক্তিতে অপরাজেয়।

গান্ধী উপগ্রহ মণ্ডলী নির্দিষ্ট কক্ষপথ পরিত্যাগ করে প্রচারের এমন একটি সহজ পথ বেছে নিলেন যার সারমর্ম হল 'আমরা যা বলি তাই শোন, সেই মত চলো। আমরা যা করি তা দেখ না।' আর তাতেই হল গান্ধীবাদের ক্রম অবলুপ্তি। প্রতি নিয়ত ঢক্কা নিনাদে গান্ধী মহিমা প্রচার করে কোন ফল হল না, রাজঘাটে গান্ধী সমাধি বেদীতে ঘন ঘন পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেও নয়।

গান্ধীজীবনের ভিত্তি ছিল ঈশ্বরে অগাধ বিশ্বাস। তিনি বলতেন, "বর্ণনা বা সংজ্ঞার অতীত ঈশ্বরকে আমরা অন্তরে অনুভব করতে পারি কিন্তু জানতে পারি না। আমার হৃদয়ে ভগবান সত্য ও প্রেমরূপে প্রকট হন—ভগবানই নীতি, তিনিই ধর্ম। বিবেক-রূপে ভগবান আমাদের অন্তরে অবস্থিত।" (গা: র: স:)

গান্ধীজী যে সত্য ও অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন তা অবশ্য নতুন নয়। তবে তিনি তা করেছেন স্বীয় আচরণে, দুঃখ দহনের পরিশুদ্ধতা নিয়ে। গান্ধীজী নিজেই সে কথা বলেছেন, "নতুন কিছু শিক্ষা দেবার স্পর্ধা আমার নেই। সত্য ও অহিংসা চিরন্তনী তত্ত্ব। আমি এই দুই মহাতত্ত্বকে যত বড় ক্ষেত্রে পেরেছি কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি মাত্র।" বলা বাহুল্য, মহাত্মার সেই চেষ্টার বৃহত্তম ক্ষেত্র ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের মুক্তি সংগ্রাম।

মনীষী রোমা রোঁলা বলেছেন, "গান্ধী এসেছেন নতুন মানব সমাজ গড়ার জন্য। • • ইনিই হলেন সেই মানুষটি যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছেন এবং ধর্মের এমন একটি প্রেরণা এনেছেন, মানুষের রাজনীতি ক্ষেত্রে দু হাজার বৎসরের মধ্যে যার তুলনা আমরা দেখি নি।"

আমরা ভাগ্যবান যে, সেই গান্ধীজীকে আমরা কাছে থেকে দেখেছি, তাঁর কথা শুনেছি এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে সত্য ও অহিংসার বিপুলতম পরীক্ষা সাগরে একদিন নিঃশঙ্ক চিত্তে ঝাঁপ দিয়েছি। পৃথিবীতে এত বড় অহিংস প্রতিরোধ সংগ্রাম আর কখনো ঘটে নি।

'End justifies the means' এই অবৈজ্ঞানিক নীতির গান্ধীজীর চিন্তায় স্থান ছিল না। গান্ধীজীর দৃঢ় অভিমত হল "সাধনের পথ ও লক্ষ্য একই বস্তু। পথ হল বীজ লক্ষ্য বৃক্ষ। বীজের সহিত বৃক্ষের সম্পর্ক যেমন অচ্ছেদ্য, পথ ও লক্ষ্যের সম্পর্কও তাই। হিংসার পথে অর্জিত অধিকার হিংসা নির্ভর হওয়াই স্বাভাবিক।" (গা: র: স)

বিপ্লব সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন, "এতদিন 'বিপ্লব' শব্দটি বল প্রয়োগের ধারণার সহিত যুক্ত ছিল। অসহযোগ আন্দোলন অথবা আইন অমান্য সত্যাগ্রহ সশস্ত্র বিদ্রোহ নয়, তবে এগুলিও বিপ্লব। পার্থক্য এই যে এর মধ্যে হানাহানি নেই।" (গা: র: স)

রাশিয়া সম্বন্ধে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'এই মুহূর্তে রাশিয়ার ছবি আমাদের চোখের সামনে নেই। রাশিয়ার এক নায়কতন্ত্র ভেবেছেন তারা রক্তপাতের পথে শান্তির রাজ্যে পৌঁছবেন। আজ কেউই বলতে পারে না রাশিয়ার একনায়কতন্ত্র পৃথিবীতে কি প্রভাব বিস্তার করবে।

অসত্য বা পশুশক্তির প্রয়োগে যথার্থ ব্যক্তি

স্বাধীনতা বা জনতার স্বরাজ আসতে পারে না। কারণ বিরুদ্ধ পক্ষের বিলোপ সাধন অথবা অবসানের দ্বারাই তারা ক্ষমতা লাভ করে। ব্যক্তি স্বাধীনতা বিনষ্ট না করলে তা ঘটতে পারে না। কেবল অনির্বন্ধ অহিংসার আশ্রয়ে ব্যক্তি স্বাধীনতার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব।" (হরিজন/২৫-৫-৩৯)

গান্ধীজীর রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিচার করলে তাদের সঠিক মূল্যায়ন হয় না। কারণ সবগুলিই গান্ধীজীর মৌল জীবনদর্শন সত্য ও অহিংসার ওপর স্থাপিত। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন : "যে অর্থনীতি মানুষের নৈতিক মূল্য স্বীকার করে না তা সর্বৈব ভ্রান্ত। সমাজে শ্রেণী বিরোধের অস্তিত্বকে আমি অস্বীকার করি না কিন্তু শ্রেণী বিরোধকে উসকিয়ে জীইয়ে রেখে কোন লাভ হবে না। শ্রেণী বিরোধের অবসান আমি চাই। হৃদয়ের পরিবর্তনের পথেই তা শুধু সম্ভব। (গান্ধী রচনা সংকলন)

গান্ধীজী চেয়েছিলেন শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ এবং যতটা সম্ভব যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে হস্তচালিত ব্যবস্থার প্রবর্তন। খাদি ছিল তাঁর এই অর্থনীতির প্রতীক। যে সব দেশে শ্রমিকের ঘাটতি আছে, কর্ম প্রার্থীর সংখ্যা কম, শ্রম সাশ্রয়ী যান্ত্রিক ব্যবস্থা সেখানে কল্যাণকর হলেও বিপুল সংখ্যক কর্মপ্রার্থীর দেশে যান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা বেকারের সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য—যার পরিণাম বিপর্যয়কর। গান্ধীজীর অর্থ ব্যবস্থার আর একটি লক্ষ্য ছিল, বে-সরকারী মালিকানা অথবা রাষ্ট্র মালিকানা, উভয়বিধ প্রভুত্বের নিগড় থেকে শ্রমজীবীর মুক্তি। রাষ্ট্র পরিচালিত কৃষি ও শিল্প ব্যবস্থায় নব ভূমি দাস এবং শ্রম দাস সৃষ্টির তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধীজীর সর্বাধিক অবদানের কথা স্বীকার করেও বলতে দ্বিধা নেই যে আপদ রক্ষার বিশ্বাসী গান্ধীজী সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ দিতে পারেন নি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য সাধনেও গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছিলেন। যে অহিংসা ও প্রেমের মন্ত্রকে মূলধন করে তিনি আজীবন মুসলমান স্বাতন্ত্র্য-বাদকে জয় করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন এবং যার জন্য তিনি আত্মবলিদান দিতেও কুণ্ঠিত হন নি, তাকে সাধারণ দৃষ্টিতে তোষণ নীতি বলে। তোষণের ব্যাপারে গান্ধীজী শক্তিমান ব্রিটিশের সহিত প্রতি-যোগিতায় কি করে এঁটে উঠবেন? তাঁর প্রেম ও প্রীতির প্রসারিত হস্ত প্রত্যাঘাত হয়েছিল। খিলাফত আন্দোলন সমর্থন, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতির আড়ালে বাটো-য়ারাকে গ্রহণ, মুসলিম লীগ নেতা জিন্নাকে ব্লাংক চেক দেবার প্রতিশ্রুতি ইত্যাদি মুসলমান স্বাতন্ত্র্য বাদের দাবিকে নরম না করে তীব্রতর করেছিল এবং ব্রিটিশ সরকারও অহিংস পন্থী গান্ধীজীর মানবপ্রেমকে দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। দেশ বিভাগের চক্রান্তকে সেই কারণে সময়মত বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নি, ধাপে ধাপে সেই চক্রান্ত এগিয়ে গিয়ে যখন চরম সংকটের রূপ নিল, তখন অনিবার্যরূপে দেশ বিভাগকে মেনে নিতে হল।

বয়সের ভারে ক্লান্ত এবং ঘনিষ্ট সহযোগী শিষ্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত গান্ধীজী তখন সখেদে বললেন—"Let it not be said that Gandhi was a party to India's viviseetion. Congress has practically decided to accept the partition. they have been handed over a wooden loaf in this new plan. If they eat it, they will die of colic. If they leave it thay starve."

এই হেঁয়ালী ভরা কথা গান্ধী চরিত্রের দুর্বোধ্যতার কারণ। তাঁর অনেক কথাই সেজন্য সঠিকভাবে বোঝা কঠিন ছিল।

১৯৩৯ সালে সুভাষচন্দ্র যখন বিপুল সংখ্যাধিক্যে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হলেন তখন গান্ধীজী প্রকাশ্যে সুভাষ বিরোধিতায় লিপ্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৯-এর ২৮শে এপ্রিল কলিকাতায় এ. আই. সি. সি-র সভায় গান্ধীজীর দুর্বোধ্য অনমনীয় মনোভাবের কারণে সুভাষচন্দ্র সভাপতির পদে ইস্তফা দিলেন। সেদিনকার সেই দৃশ্যটি আজও চোখের সামনে ভেসে আছে।

সংক্ষিপ্ত অধিবেশন, বিতর্ক নেই, ছোটাছুটি নেই। সবই পূর্ব-পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট। নির্বাক পণ্ডিত নেহেরু, বল্লভভাই, মৌলানা আজাদ। কত বড় অন্যায় যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সম্বন্ধে সকলেই যেন অবহিত, বিবেকের নীরব ভর্ৎসনায় অপরাধীর মত সকলেই ম্রিয়মান। নাটকের যিনি নায়ক সেই মহাত্মাও মুখ খুললেন না। গান্ধীজী বলেছিলেন, "সুভাষের কংগ্রেস সভাপতি পদে পুনর্নির্বাচনে আমার বিরোধিতার পিছনে কারণ আছে সে কারণ আমি এখন বলব না।" (কংগ্রেসের ইতিহাস/ডাঃ সীতারামিয়া) কি সেই কারণ গান্ধীজী সেদিন বললেন না। পরেও তিনি সে কথা বলেন নি।

চারিদিকে ক্ষোভ ও রোষ উদ্দীপিত উত্তেজনা। সভা মঞ্চের বাইরে হাজার হাজার মর্মাহত মানুষের ধিক্কার ধ্বনি। দেখলাম, অধিবেশন শেষে বনবাস প্রত্যাগত পুত্র রামচন্দ্রের মত অবিচলিত-চিত্ত সুভাষচন্দ্র মহাত্মাকে পিতার ন্যায় সস্নেহে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দুই বাহুর মধ্যে রেখে গাড়িতে তুলে দিলেন এবং দুই হাত দিয়ে মহাত্মার পদস্পর্শ করে বিদায় প্রণাম জানালেন। সেদিনের মনের ভাব আজ প্রকাশ করা অসাধ্য।

এই তো ইতিহাস। চোখের আলোয় দেখা চিত্রময় ইতিবৃত্ত। সেই ১৯২৮ সালের কলিকাতা কংগ্রেস থেকে লাহোর, হরিপুরা, ত্রিপুরী, রামগড় এবং শেষে মীরাট অধিবেশন। কত ঘটনা, কত কাল পরিবর্তন। নীরব সাক্ষী। ১৯২৮—এর কলিকাতা কংগ্রেসে এক সাধারণ স্বেচ্ছাসেবক, ডিউটি পড়েছিল গান্ধীজীর শিবির প্রহরায়। খুব কাছে থেকে দেখেছিলাম তাঁকে সর্ব প্রথম। আজ সবই স্মৃতি, নিস্তব্ধ অতীত।

মহাপুরুষদের জীবনের আপাত দৃশ্যমান ব্যর্থতা সত্যিই কি ব্যর্থতা? না তা ভবিষ্যৎ সাফল্যের পূর্বাভাস? বিশ্বব্যাপী ঘনায়মান সংকট কালে মানব ভাবনায় মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তন কি সম্ভব নয়? কে বলতে পারে?

তত্ত্বদর্শী ওয়ালটার ওয়ালেস বলেছেন: "পরম ধর্ম হল সেই, যার লক্ষ্য প্রেম, ক্ষমা, উদারতা এবং শান্তি। সে ধর্ম হল অন্তরের ধন। এই পরম ধর্মের মর্মকে যাঁরা উদ্ভাসিত করেছেন এবং তার আদর্শকে যাঁরা সত্য করে তুলেছেন নিজেদের জীবনে, তাঁদের মধ্যে তিন জনকে ভাবীকাল সর্বোচ্চ আসন প্রদান করবে। এই তিন জনের নাম—গৌতম বুদ্ধ, যীশু খৃষ্ট এবং মহাত্মা গান্ধী।"

হিংসা নয়, হত্যা নয়। অহিংসা। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রীতি প্রদর্শনের গান্ধী পথই সভ্যতার ইতিহাসের শাশ্বত পথ। হিংসায় উন্মত্ত বিশ্বকে চরম দুঃখের দিনে সেই পথেই এসে আশ্রয় নিতে হবে। এছাড়া বাঁচবার অন্য পথ নেই।

●

জয়তু গান্ধীজী

—বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে সুদূর সিঙ্গাপুর থেকে যখন কম্বু কণ্ঠে তাঁর অভয় বাণী (ব্রড কাষ্টিং মারফৎ) উচ্চারণ করেন তখন সর্বপ্রথমে তিনিই মহাত্মা গান্ধীকে সম্বোধন করেন 'Father of the Nation' অর্থাৎ 'জাতির জনক' বলে। এই ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করার অধিকার কারো নেই। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতনের পবিত্র ভূমিতে গান্ধীজির সংস্পর্শে এসে তাঁকে 'মহাত্মন্' বলে সম্বোধন করেন, আর মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধী রবীন্দ্রনাথকে 'গুরুদেব' বলে সম্ভাষণ করেন। এই দুই ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহান ব্যক্তিদের প্রথম মিলন ঘটে তখনই যখন গান্ধীজি শান্তিনিকেতন পরিদর্শনে যান রবীন্দ্রনাথের সাদর আহ্বানে। গান্ধীজির আচার-আচরণ নিষ্ঠা স্বদেশ প্রেম ত্যাগ তিতিক্ষা ও ভগবত প্রেম রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল।

তিনি পরবর্তীকালে সবরমতীতে গিয়ে গান্ধীজির সাক্ষাৎ লাভের চেষ্টা করেন নিজেকে তাঁর আরব্ধ কর্ম যজ্ঞে সামিল করার মানসিকতাকে সম্বল করে ; যদিও সে সময়ে গান্ধীজি তথায় হাজির ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে বলেছিলেন 'এতদিনে আমার আকাঙ্খিত পুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে ভারতে, যাঁর পদপ্রান্তে বসে আমি আমার বাকী জীবন তাঁর আজ্ঞানুসারে পরিচালিত করে ধন্য হবো, তাঁর আদর্শকে সর্বশক্তি দিয়ে রূপায়িত করে তৃপ্তি লাভ করবো। রবীন্দ্র জীবনীকার প্রভাত মুখুজ্যে মহাশয়ের রবীন্দ্রজীবনী গ্রন্থে উক্ত বাস্তব ঘটনার উল্লেখ আছে যা তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছে শুনেছিলেন আশ্রম জীবনে। প্রভাতবাবু আজো জীবিত, তিনি সবচেয়ে নিকটের মানুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের। অনেকে গান্ধীজিকে ভারত ভাগ করা নিয়ে দোষারোপ করেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না যে, দেশ ভাগ করার কত বড় বিরোধী ছিলেন তিনি মহাশয়ের সুধীর ঘোষ। 'Emissary of Gandhiji' অর্থাৎ গান্ধীজির দূত নামক গ্রন্থে পাওয়া যায় ভারত ভাগের জন্য গান্ধী দায়ী ছিলেন না কোন মতেই এবং একথার সত্যতা আমরা শ্রদ্ধেয় কিরণ শংকর রায়ের কাছে বিস্তারিতভাবে জেনেছি বলেই সাহস করে লিখতে পেরেছি। দেশ ভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের যে দারুণ অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে তা স্বীকার করি এবং দেশভাগ করা যে, নিতান্তই ভুল হয়েছিল সে বিষয়ে কারো দ্বিমত নেই। বাংলার এত বড় ক্ষতি ইতিপূর্বে আর কখনো সংঘটিত হয়নি আজ পর্যন্ত।

গান্ধীজির ব্যক্তিত্ব, ধর্মবোধ, সত্যাভিলাষ, মনুষ্যপ্রীতি, রাজনৈতিক জ্ঞান, অসাম্প্রদায়িক চিন্তাধারা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাম্যবোধ, ত্যাগস্পৃহা, নির্ভীকতা ও সহনশীলতা ছিল অতি উচ্চ স্তরের। ফলে সাধারণ মানুষ সব সময়ে তাঁর সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করতে ব্যর্থ হতো, কিন্তু জ্ঞানী-গুণীজন এদেশের বা বিদেশের সব সময়েই ছিল তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তাঁর কার্য্য কারণের সঠিক পরিমাপ করা অনেকের পক্ষেই বেশ দুঃসাধ্য হতো, কারণ তিনি ছিলেন গীতায় পরম বিশ্বাসী এক নির্ভীক কর্ম্মযোগী, যিনি কর্ম করে যেতেন ঈশ্বরের আজ্ঞায়। এর প্রমাণ আমরা পাই প্রখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানের সময়ে। ডাণ্ডি অভিযানের প্রাক্কালে তিনি

ঘোষণা করেন 'ঘর হ্যাম্ আগে বাড়েঙ্গে,...সারা হিন্দুস্থান উথল্ যায়েগী।" উক্ত অভিযানের দিন ক্ষণ সবই নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তিনি পূর্ব্বাহ্নেই, তবুও তিনি যাত্রা শুরু করেন নি যথা নির্দিস্ট সময়ে।

সাংবাদিকরা এই দেরী দেখে তাঁর কাছে গিয়ে প্রশ্ন করেন :—'সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল যে, অথচ এখনো তো আপনি অভিযানে নির্গত হলেন না। কি কারণ এই স্তব্ধতার? আপনার কথা আর কাজ তো ঘড়ি ধরেই আরম্ভ হয়, অথচ এবার আপনার সেই অমোঘ সংকল্প যে অযথা কাল হরণ করছে। আসল ব্যাপারটা যে বোঝা যাচ্ছে না। কি এর সঠিক কারণ, অনুগ্রহ করে জানাবেন কি?' গান্ধীজি সহাস্য মুখে বললেন :—'আদেশ পাই নি যে এখনো, কি ভাবে তাঁর হুকুম ব্যতিত কর্ম্মারম্ভ সম্ভব?' সাংবাদিকরা বলেন—'আপনিই তো হুকুম দেবার মালিক, আপনি আবার কার হুকুমের অপেক্ষায়?' গান্ধীজি বেশ সহজভাবেই সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিলেন যে, সর্বশক্তিমান ভগবানের নির্দেশেই তিনি সব সময়ে সবকাজে আগুয়ান হন। সে আদেশ পেলেই তিনি যাত্রা করবেন। বস্তুতঃ তিনি ভগবানের আদেশ পেলেন ও যাত্রা করলেন। অনাহুতভাবে প্রায় পঁচিশ হাজার মানুষ সেই অভিযানে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে পশ্চাৎধাবন করলো, আর প্রায় ত্রিশ হাজার মানুষ সেই অভিযান দেখার জন্য অভিযাত্রীদের পশ্চাতে অগ্রসর হতে থাকলো। ডাণ্ডি অভিযান সফল হলো, সারাদেশে সাধারণ মানুষ গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার প্রভাব দেখে মুগ্ধ বিস্ময়ে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে ধ্বনি তুললো গান্ধীজি কি জয়, ভারত মাতাকি জয়, বন্দে-মাতরম্। বৃটিশ রাজশক্তি কেঁপে উঠলো, ধরপাকড় শুরু হলো, কারাগারে সহস্র সহস্র মানুষ ফেব্রুয়ারীর স্থান নিল গান্ধীজির আদর্শ অনুসরণ করে। সত্যাগ্রহীরা ভারতের সব প্রদেশেই লবণ আইন ভঙ্গ করে কাতারে কাতারে কারাবরণ করলো, পুলিসের লাঠির ঘায়ে জখম্ হলো, কেউ কেউ অতিরিক্ত প্রহারের ফলে মৃত্যু মুখেও পতিত হলো।

গান্ধীজির প্রদর্শিত পথে নিরুদ্বেগ চিত্তে ভারত বাসীরা স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত অহিংস সত্যাগ্রহের অংশীদার হবার জন্য লাখে লাখে মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো সবল নেতৃত্বে। জনজাগরণের ক্ষেত্রে গান্ধীজির অবদান ছিল অতুলনীয়। বৃটিশ রাজপুরুষরা গান্ধীজির বিপুল জনপ্রিয়তায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়লো। এদেশের আপামর জনসাধারণ সত্য সন্ধ ঋষিকল্প আট হাতি বস্ত্রাবৃত মানুষ গান্ধীজিকে মহান দেশনায়ক হিসাবে বরণ করে ধন্য হলো, আর তাঁর নির্দেশকেই ঈশ্বরের নির্দেশের মত মান্য করতে শুরু করলো। ফলে স্বাধীনতার অহিংস আন্দোলন উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধিত হতে শুরু করলো। দেশের মানুষের পুলিসী ভয় আস্তে আস্তে কেটে গেল। সারা ভারত পরাধীনতার জ্বালা থেকে মুক্তি পাবার জন্য পাগল হয়ে উঠলো গান্ধীজির অনন্য সাধারণ নেতৃত্বের গুণে। ভারতের তদানীন্তন বড়লাট লর্ড আরুইন্ গান্ধীজির সঙ্গে চুক্তি করতে বাধ্য হলেন, ফলে সমস্ত রাজবন্দীদের সরকার মুক্তি দিল ১৯৩১ সালে ৩১ মার্চ। গান্ধীজি বিলাতে গোল টেবিলের বৈঠকে আমন্ত্রিত হলেন ভারতবাসীর দুঃখ, দৈন্য, অন্তর্দাহ প্রভৃতি বিষয়ে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের সামনে আর্জি পেশ করার জন্য ও তার প্রতিবিধানের জন্যও বটে।

কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হয়ে নাঙ্গা ফকির বিলাত গেলেন।

যে বিশুদ্ধ চৈতন্যের অধিকারী ছিলেন গান্ধীজি সেই একই চৈতন্যের অধিকারী ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্রও, আর এর ফলেই গান্ধীজির অত্যন্ত প্রিয় পাত্র হয়ে উঠে ছিলেন নেতাজী। দুই মহা-পুরুষের মধ্যে এক অতি মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে ধীরে ধীরে, কিন্তু দুজনের চিন্তাধারা ছিল পৃথক। নেতাজী অহিংস বা সহিংস যে কোন পথেই দেশের মুক্তি আনতে প্রস্তুত ছিলেন কিন্তু গান্ধীজি অহিংস পথেই দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন।

ফলে এঁদের উভয়ের মধ্যে মত পার্থক্য বা মতান্তর হয়, মনান্তর কখনো হয় নি। গান্ধীজি সুভাষ-চন্দ্রকে আপন পুত্রবৎ স্নেহ ও বিশ্বাস করতেন। নেতাজীও গানধীজিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সুনজরে দেখতেন এবং তাঁকে আন্তরিক ভক্তিও করতেন। আজ ঐ দুই মহা পুরুষের অভাবে ভারত চরম ক্ষতিগ্রস্ত। এ যুগের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন এ্যাটম্ (অনু) বিভাজন করে অসীম শক্তিশালী পরমাণু আবিষ্কার করেন এবং সেই আবিষ্কারের ফলেই এ্যাটম বোমা প্রস্তুত সম্ভাবনা হয়। আমেরিকা দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ কালে হিরোশিমা ও নাগাসাকি নামক জাপানের দুইটি জনপদে এ্যাটম্ বোমার পতন ও বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবনহানি ও অঙ্গহানি এবং মারাত্মক শ্বাসরোধকারী তেজস্ক্রিয়সঞ্জাত বিবিধ বিষাক্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় যা সারা বিশ্বকে সচকিত করে তোলে। বিশ্বের মানব প্রেমিক জ্ঞানীব্যক্তিরা আইনষ্টাইনের কাছে গিয়ে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—"আপনার আবিষ্কৃত শক্তির দ্বারা প্রস্তুত এ্যাটম বোমা সমগ্র মানবজাতির ধ্বংস সাধনের কাজে লাগিয়ে যুদ্ধবাজ রাজনৈতিক নেতারা সভ্যতার বিনাশ ঘটাতে যুগপৎ তৎপর। পৃথিবী জন মানব শূন্য হয়ে মরুভূমি হয়ে পড়বে, যদি না ভয়ঙ্কর বিধ্বংসী ঐ পরমাণুশক্তিকে সভ্যতা বিকাশের কাজে লাগাবার জন্য আপনি রাজনীতিকদের সনির্বন্ধ অনুরোধ জানান'। আইনষ্টাইন উত্তরে তাঁদের জানালেন যে, বর্তমান বিশ্বে একটি মাত্র মানুষ আছেন, যিনি এর প্রতিবিধান করতে পারেন তাঁর অহিংস মনোভাব সম্পন্ন অস্ত্রের মাধ্যমে, তিনিই গান্ধীজি। তোমরা তাঁকে গিয়ে সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বল ও আমার কথাও বল ; কারণ তিনিই পারবেন এই বিশ্বধ্বংসী অমঙ্গলের হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করতে, তাঁর নৈতিক ও সত্যনিষ্ঠ চারিত্রিক বিশাল শক্তির সাহায্যে। অপর কেউ আর তা কোন মতেই পারবে না। (আইন ষ্টাইন জীবনী দ্রষ্টব্য।) আইনষ্টাইনের কি গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও সৎ ধারণা ছিল গান্ধীজির ওপর তা উপরোক্ত ঘটনাই প্রমাণ করে। বিদেশের ও এদেশের প্রকৃত জ্ঞানী-গুণীরাই গান্ধীজির সঠিক মূল্যায়ণে সক্ষম ছিলেন, সাধারণে নহে আর সেই কারণেই গান্ধীজির সমগ্র জীবন সাধনার বৃত্তান্ত ছাত্রদের জানান প্রয়োজন আজ। গান্ধীজির জন্য খণ্ডে সমাপ্ত রচনাবলী যা 'গান্ধীর রচনা সম্ভার' নামে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তা প্রতিটি শিক্ষিত মানুষের পড়া দরকার। সকলেরই জানা প্রয়োজন গান্ধীজি কি বিরাট আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ছিলেন।

অনেকে তাঁর জীবদ্দশাতেই গান্ধীবাদ বলে গান্ধীজির জীবনদর্শনকে সাধারণ মানুষের কাছে বার বার উল্লেখ করায়, তিনি সকলের অবগতির জন্য জানান যে, গান্ধীবাদ্ বলে কোন কিছুই নেই। 'তাঁর জীবনই তাঁর বাণী' অর্থাৎ তাঁর সমগ্র জীবন সাধনায় তিনি সাধারণের জন্য, দেশের জন্য যা কিছু

করেছেন এবং সত্যের ভিত্তিতে যে সব আন্দোলন, সভাসমিতি, ভাষণ দান, 'হরিজন' পত্রিকায় বা ইয়ং ইণ্ডিয়ায় যা কিছু লিখেছেন, সে সবই তাঁর জীবন দর্শনের পরিচয় দেয়। সত্যের প্রতি তাঁর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠা ছিল প্রবল। My experiments with the Truth' গ্রন্থে গান্ধীজি সে বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন। উক্ত বইয়ের বাংলা 'সত্যের সন্ধানে' নামক বই বাজারে এখনো পাওয়া যায় যা মূল গ্রন্থের সঠিক অনুবাদ বাংলা ভাষায় করা হয়েছে। বর্তমান ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে গান্ধী জীবনী আলোচনার কেন্দ্র ও গান্ধীচর্চ্চার পীঠকেন্দ্র কংগ্রেস দলের উদ্যোগে স্থাপিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তবেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কার্ল-মার্কসের দর্শনের পরিবর্তে গান্ধী দর্শনের শ্রেষ্ঠতা সম্যক উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। জড়বাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত মার্কসীয় দর্শন যে ভারতের মত ধর্মপ্রবণ দেশে শেষ পর্যন্ত লোপ পাবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। গান্ধীজি বলেছিলেন 'তুমি সব গোপাল কি 'Now a days Gopal means people' কথাটিই ছিল গান্ধীজির ভাষ্য। মার্কস যেখানে চরম ভোগ আশ্রয় করে দেশের মানুষকে লোভী, আত্মসর্বস্ব, চরম স্বার্থপর ও হিংসায় প্ররোচিত হতে ইন্ধন যুগিয়ে গেছেন, সেক্ষেত্রে গান্ধীজির প্রবর্তিত সর্বোদয় ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম গঠনের প্রচেষ্টা কি ভারতের মত দেশে যুগোপযোগী মহান কর্তব্যকর্ম হবে না? মানুষে মানুষে হানাহানির বদলে প্রীতির ও সৌহার্দের মধুর সম্পর্ক সকল মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে না?

গান্ধীজির 'চরৈবেতি' কথাটা কি উপনিষদের আদর্শে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে না? স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন: ভারতবর্ষের মানুষের প্রাণশক্তি ধর্মের মধ্যে নিহিত, অপর পক্ষে ফরাসীদের মানুষের প্রাণশক্তি রাজনীতির মধ্যে নিহিত। ভারতে ধর্ম যুদ্ধ হয়েছে কুরুক্ষেত্রে। এদেশে অধর্মের স্থান নেই। হিন্দুস্তান ধর্মস্থান সর্বপ্রথমেই এবং সেই কারণের জন্যই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতা মহাত্মা গান্ধীকে সর্বক্ষেত্রেই শ্রীমদ্ভাগবত গীতা হাতে দেখা গেছে, এমনকি কারাগারের মধ্যেও। সর্বত্রই গীতা ছিল গান্ধীজির সহচর, বন্ধু, পরামর্শদাতা ও সর্বার্থসাধক মহাশক্তির উৎস। এমন ধার্মিকশ্রেষ্ঠ অথচ সার্থক রাজনীতিবিদ গান্ধীজির মত আর কেউই ছিলেন না। রাজনীতিকে ধর্মের সঙ্গে সমন্বয় করে জন জাগরণকে ত্বরান্বিত করা তাঁর পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। এ দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আর একটিও নেই। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম বুদ্ধিমত্তা, অশেষত্যাগ ও কঠিন নির্য্যাতন ভোগ এদেশের মানুষের মনে শ্রদ্ধা জাগিয়ে ছিল এবং জনসাধারণ স্বেচ্ছায় দেশোদ্ধারে সর্বস্ব পণ করে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; তিনি কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পরে, দেশ পরিচালনার ক্ষেত্রে অর্থাৎ মন্ত্রীত্ব গ্রহণের ক্ষেত্রে মোটেই এগিয়ে যান নি; বরং তিনি তাঁর অনুগামীদের সে কাজে এগিয়ে যেতে সাহায্য ও পরামর্শ দিয়েছেন। সার্থক স্বাধীনতার যোদ্ধা হয়েও প্রথম সারির নেতা হয়েও রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন নি গান্ধীজি ছাড়া এমন একজনকে কেউই খুঁজে বার করতে পারবে না। গান্ধীজি ছিলেন সেই মহান দেশনেতা যিনি ভারতের অবহেলিত, অবজ্ঞাত শোষিত ও অধঃপতিত মানুষের সেবায় জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করেন। হরিজন প্রীতি ছিল তাঁর আন্তরিক ও যুক্তি সম্মত।

অনগ্রসর ও অনুন্নত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের

কাজে তিনি বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে ছিলেন। আদিবাসী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি বিরাট কর্ম যজ্ঞের সূচনা করেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড় অবদান ছিল এবং তা হচ্ছে বুনিয়াদী শিক্ষাই তাঁর মতে প্রকৃত শিক্ষা যা মানুষকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে ও জীবনের চলার পথে পাথেয় যোগায়। মানবতাবাদের পূজারী গান্ধীজি সর্ব মানবের কল্যাণ চিন্তায় সর্বদাই বিভোর থাকতেন। তাঁর কাছে ব্যক্তি চিন্তা ছিল অবান্তর। অস্পৃশ্যতা বর্জন তাঁর কর্মসূচীর মধ্যে অগ্রাধিকার পায় সর্ব্বব্যাপারেই। তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকেই আপনজন বিবেচনা করতেন ও সমাদরে সকলকেই ভালবাসতেন। গান্ধীজি ছিলেন ভারতের আদর্শ পুরুষ, যাঁর কাছে সবাই মস্তক অবনত করতেন পরম শ্রদ্ধাভরে। ভারতের দুই সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান যখন ১৯৪৬ সালে দাঙ্গায় মেতে ওঠে বৃটিশের চক্রান্তে তখন তিনিই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধ রচনা করেন আপন আত্মশক্তির উপর নির্ভর করে। বিশ্ববাসী শ্রদ্ধায় তাঁকে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বে বরণ করে নেয়। আত্মশুদ্ধির জন্য ও জাতিকে সুপথে পরিচালিত করার জন্য তিনি প্রায়শই অনশনে ব্রতী হতেন এবং মৌন থাকতেন। রবীন্দ্রনাথের গান—'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে' তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং ঐ গানের মর্মার্থকে তিনি নিজজীবনে প্রয়োগ করে ছিলেন একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে, ফলে রাজনৈতিক জীবনে অনেকের সঙ্গেই তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয় এবং তা সত্ত্বেও তিনি নিজ গন্তব্যে স্থির-অচঞ্চল ছিলেন।

এখানেই তাঁর অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত সমগ্র জাতি তাঁর জন্মদিন ২রা অক্টোবর তারিখে গান্ধী জয়ন্তী পালন করে ও তাঁর তিরোধান দিবস ৩০ শে জানুয়ারী তারিখে সর্বোদয় দিবস হিসাবে পালন করে। তিনিই সর্বোদয় অর্থাৎ সকল মানুষের জাগতিক, বৈষয়িক, আত্মিক, পরমার্থিক সব ব্যাপারেই যে চরম উন্নতি সম্ভব পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা ও সহনশীলতার মাধ্যমে তা বিশ্বাস করতেন এবং ঐ বিষয়ে তার সুচিন্তিত বাস্তব পরিকল্পনা তিনি নিজেই রূপদানের সকল সম্ভাব্য ব্যবস্থার কথা ব্যক্ত করেন। মার্কস এত গভীরে প্রকৃত মানব কল্যাণের চেষ্টাকে সফল করার কোন বাস্তব চিন্তাধারা বিশ্বকে দিতে পারেন নি. যা গান্ধীজি তাঁর সর্বোদয়ের পরিকল্পনায় উল্লেখ করে গেছেন। তাই মার্কসীয় দর্শন গান্ধী আদর্শদের কাছে ম্রিয়মান। শ্রেণী সংগ্রামে কেবল হিংসা বাড়ে, স্থায়ীশান্তি আসেনা। সর্বোদয়ের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি সম্ভব।

Get Peace of Mind and New Interest in Life.

You too can get peace and tranquility when you can tackle the tough problems of your children's Education, Marriage Expenditure or a dependable Retirement income.

Peace of mind comes with the sense of security alone. You can get both, when you save with us.

The Peerless General Finance and Investment Co. Ltd.

ESTD. 1932

Regd. Office : "PEERLESS BHAVAN"

3, ESPLANADE EAST, CALCUTTA-69

TOTAL ASSETS OVER Rs. 250 CRORES

• INDIA'S LARGEST NON-BANKING SAVINGS COMPANY •

মহাত্মা গান্ধী

এস, এ, ডাঙ্গে

মহাত্মা গান্ধীর জন্মের সময়ে দেশ ১৮৫৭র স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং তার পরবর্তী ফল-পরিণাম-স্বরূপ মৃত্যুবরণকারী বীরদের স্মরণ করছিল। এই মহা সংগ্রামের বারো বছর পরে গান্ধী জন্মগ্রহণ করেন একটি স্বচ্ছল, ধর্মভীরু হিন্দু পরিবারে, যা লালিত হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পদানত একটি অঙ্গরাজ্যে এবং যাকে ঘিরে ছিল দারিদ্র্য লাঞ্ছিত ভারত যেখানে ভিক্টোরিয়া সাম্রাজ্যের মহিমা বিস্তারের জন্য লক্ষ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মারা যেত। তরুণ গান্ধীকে পারিবারিক স্বাচ্ছল্য সাহায্য করেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে শিক্ষাগ্রহণ করতে এবং তাঁকে গড়ে তুলেছিল ব্রিটিশ আইনের একজন বিশ্বস্ত সেবক হিসাবে।

কিন্তু যখন তিনি সেই একই আইন দক্ষিণ ভারতের অত্যাচারিত ভারতীয়দের জন্য ব্যবহার করতে গেলেন তখনই শ্বেত-শাসক বর্গের জাত্যাভিমান ও লাঠির সামনে তাঁর, 'আইনের চোখে সবাই সমান'—এই ধরনের ধারণাগুলি মুহূর্তে উবে গেল। সেখানে তিনি প্রথম শিখলেন সমান অধিকার ও মানবিক মর্যাদার জন্য এবং জাতিদম্ভের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে। কিন্তু তবুও তিনি বিশ্বস্ত রইলেন সাম্রাজ্যের প্রতি—যা তাঁর মতে প্রতিনিধিত্ব করতো আধুনিক সভ্যতা, ন্যায় ও প্রগতির। এই কারণে প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হলো, গান্ধী ছিলেন সাম্রাজ্যের একজন বিশ্বস্ত সেবক, সাম্রাজ্য রক্ষার্থে সেনাবাহিনীতে ভারতীয় যুবকদের তিনি ভর্তি করলেন এবং লোকমান্য তিলক যিনি ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী মানা না হওয়া পর্যন্ত সাম্রাজ্য রক্ষার্থে কাজ করতে অস্বীকার করেছিলেন গান্ধী তাঁর বিরুদ্ধতা করলেন।

যুদ্ধ শেষে, মানুষ যখন স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্য উদ্বেল হয়ে উঠেছে এবং ব্রিটিশ শাসকেরা তাদের দমন করার জন্য রাওলাট আইনের মত দানবীয় আইন প্রয়োগ, জালিয়ানওয়ালাবাগের মত নৃশংস গণহত্যা এবং পাঞ্জাবের শহর ও গ্রামের শান্তি পূর্ণ মানুষের ওপরে বোমা নিক্ষেপ করে চলেছে—সেই সময় ব্রিটিশের আইন ও ন্যায়নীতির ভক্ত গান্ধী পরিবর্তিত হলেন এক বিদ্রোহীতে, যে পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগঠকে এবং স্বাধীনতা ও জাতীয় মুক্তির জন্য বিদ্রোহী জনতার নেতায়।

গান্ধী তাঁর দূরদৃষ্টি এবং অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এক মহান ও সুতীব্র ক্রোধ নিয়ে গণ-আন্দোলনের এক মহান নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন। তিনি বলেছিলেন ব্রিটিশ সরকার ছিল এক শয়তানের সরকার এবং তার সম্পূর্ণ ধ্বংসেই কাম্য। তাঁর ভাষায় শয়তান এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ অসম্ভব।

সারা দেশের লক্ষ কোটী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ, নিয়মানুবর্তী এবং সংগ্রামে উজ্জীবিত করে তোলার জন্য তিনি শাণিতভাবে ব্যবহার করেছিলেন সারা ভারত হরতালের হাতিয়ারকে যা কিনা আজকের 'বন্ধে'র পূর্বসূরী। তিনি লক্ষ কোটী মানুষকে তাঁর বয়কট ও পিকেটিং-এর ডাকে রাস্তায় জড়ো করেছিলেন যা বৃটিশ সরকার ও তার আইন-শৃঙ্খলারক্ষক শক্তির সঙ্গে জঙ্গী সংঘর্ষের রূপ লাভ করেছিল। স্কুলের ছাত্র থেকে বয়স্করা, ধনী থেকে দরিদ্র কৃষকেরা—তাদের তিনি ডাক দিয়েছিলেন ব্রিটিশের শয়তান সরকারের সঙ্গে অসহযোগ

করতে এবং তাকে উৎখাত করতে—জনসাধারণের সুবিশাল ঐক্যবদ্ধ ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ এবং আন্দোলনের দ্বারা তাদের প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়েছিলেন—ব্রিটিশ সরকারের জন্য কাজ করা, তাকে অর্থ দেওয়া, তার কাছ থেকে শেখা এবং তার কথা মেনে চলা—অস্বীকার করতে।

এবং তিনি গড়ে তুলেছিলেন জাতীয় কংগ্রেসকে, ভারতীয় জনগণের জাতীয় ফ্রন্টের মুখপাত্র ও মঞ্চ হিসেবে, সমস্ত শ্রেণী, যারা জাতীয় মুক্তি লাভের জন্য সংগ্রাম চায় তাদের ঐক্যবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

বহু সময়ে নিজের জীবন বিপন্ন করেও জনগণকে আন্দোলনে উদ্দীপিত করে তোলার উদ্দেশ্যে কিংবা কখনও তাদের ভুল সংশোধন করার জন্য (যেমন, হিন্দু-মুসলমান রায়টের ক্ষেত্রে), কিংবা তার অনুসারীদের বিচ্যুতি সংশোধন করার জন্য তিনি তাঁর অস্ত্রাগারে সংযুক্ত করেছিলেন ব্যক্তিগত অনশনের হাতিয়ার। এই অনশনের হাতিয়ার, যদিও সর্বদা নয়, বহুক্ষেত্রে কাজ করতো তাঁর সুবিশাল বিপ্লবী ভাবমূর্তি ও অর্জিত শ্রদ্ধার কারণে।

চম্পারণের সংগ্রামের ক্ষেত্রে, ঘনিষ্ঠভাবে দেখার সুযোগ পান ভারতীয় কৃষকদের উপর বৃটিশ বাগিচা মালিকদের অত্যাচার। সেখানে তিনি ব্রিটিশ নীলকর সাহেবদের অত্যাচার আর সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে তাদের পশ্চাদ অপসরণে বাধ্য করেছিলেন। আহমেদাবাদের সুতাকল শ্রমিকদের ধর্মঘট পরিচালনা করার মধ্যে দিয়ে তিনি দেখেছিলেন শ্রমিকদের আত্মত্যাগ, কষ্টবরণ ও সংগ্রাম করার ক্ষমতা এবং মালিকগোষ্ঠীর অভিলোভি স্বার্থপরতা সাধনের সাহায্যে রূপান্তরিত করে ফেলার আ করেছিলেন।

কিন্তু তাঁর আসল লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে তি সংগ্রামের এই পর্ব পরিত্যাগ করেছিলেন এ অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বাহ্নে তিনি লিখেছিলে সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ "সিংহ তার কেশর নাড়ছে" এ বরদোলী পদযাত্রা শেষে এই ঘটনাকে তিনি বর্ণ ছিলেন "মৃত্যুর নৃত্য"।

চৌরিচৌরার নিরস্ত্র কৃষকদের উপর গু চালনার কারণে কয়েকজন পুলিশ হত্যার ঘটন মহাত্মা তাঁর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং তি তার "মৃত্যুর নৃত্য" প্রত্যাহার করে নেন ও 'সিং গিরে প্রবেশ করে বৃটিশ কারাগারে ছ' বছরের সা নিয়ে। তিনি দাবী করেন সাম্রাজ্যের কলঙ্ক কেবলমাত্র অহিংসার সাহায্যেই অপসারিত কর হবে—এমন কি তেমন ক্ষেত্রেও যেখানে জনগণে প্রতিরোধ ন্যায়সঙ্গত ও সঠিক এবং অত্যাচারি অন্য ও ভুল করছে।

এমন অনেকেই, যাঁরা তাঁর মতাদর্শের অনুসা বলে নিজেদের দাবী করেন এবং তাঁর নিজের তাঁর দ্বারা পরিচালিত মহান সংগ্রামের অনুসা তাঁরা কেবলমাত্র তাঁর অহিংসানীতি, কিম্বা ত ভগবৎ ভক্তি এবং চরকার উপরেই জোর দি থাকেন।

কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে যদি মহাত্মা গান্ধী ১৯২১ সালে জনসাধারণ সহিংস হ ওঠার কারণে আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলে কিন্তু এর পরে আর কখনও, ১৯৩০ বা ১৯৪২ সা যে আন্দোলনের তিনি সূচনা এবং যা পরিচাল

ভারতের স্বাধীনতা,—তিনি আর আগের ভুলের পুনরাবৃত্তি করেন নি।

বৃটিশ অত্যাচারীরা এই নতুন অধ্যায়ে যখনই সহিংস বা অঙ্গী প্রত্যাঘাতের সম্মুখীন হয়ে মহাত্মা গান্ধীকে এর নিন্দা করার জন্য আবেদন করেছে মহাত্মা কিন্তু তা করতে অস্বীকার করেন; এমন কি অহিংসার দর্শনের প্রতি একনিষ্ঠ থেকেও জনসাধারণের প্রত্যাঘাতের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে বৃটিশ শাসক শ্রেণীর হিমালয় প্রমাণ হিংসাকে দায়ী করেন।

তাঁর জন্ম দিন, নিপীড়িত মানুষ মহাত্মার যে অসাধারণ গুণবত্তার কথা স্মরণ করবে তা হলো তাঁর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সুতীব্র বিরোধীতা, জনগণের সংগ্রামের সংগে তাঁর গভীর সংযোগ, যা কিছু নিপীড়ন মূলক, অপমানকর ও মানবতা-বিরোধী তার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা। যা কিছু মন্দ, তিনি বলতেন, তার সক্রিয় বিরোধীতা করতে হবে, নিষ্ক্রিয় আত্মসমর্পণ নয়।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের প্রশ্নটিকে ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ঐক্য বজায় রাখার এবং ভারতের জনসাধারণকে বিভক্ত করার সাম্রাজ্যবাদী কৌশলকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে প্রধান শ্লোগান করে তুলেছিলেন।

এক মহান মানবতাবাদী হিসাবে তিনি অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের আহ্বান জানিয়েছিলেন—যদিও তিনি একজন ধার্মিক হিন্দু হিসাবে হিন্দু সমাজের বর্ণাশ্রম প্রথায় বিশ্বাস করতেন—যে চেষ্টা করায় তাঁর পূর্বসূরী মানবতাবাদী হিন্দু সন্তেরা শোষক শ্রেণী ও বর্ণের মানুষের হাতে নিপীড়িত হয়েছেন।

যদিও সুরুতে তাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতকে পুরাতন কুটির শিল্প ও গ্রাম জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার এবং আধুনিক যন্ত্রপাতিকে বর্জন করার, পরবর্তী কালে তিনি পশ্চাদমুখীন সে স্বপ্ন পরিত্যাগ করেছিলেন এমন কি সাহায্য করেছিলেন আধুনিক শিল্প গড়ে তুলতে, বিদেশী বাণিজ্যে সুবিধা লাভে এবং শিল্পপতিদের রক্ষা করতে—এই শর্তে, যে তারা স্বাধীনতা লাভে সাহায্য করবে।

তাঁর জীবিতকালে, যখন তিনি কংগ্রেসের পরিচালক ছিলেন তখন কমিউনিষ্ট, কংগ্রেস সোস্যালিষ্ট এবং অন্যান্য আরও অনেকে তাঁর মতাদর্শ, তাঁর শ্রেণী-মিত্র ও কাজের পদ্ধতির বিরোধীতা করেন। তবুও তাঁরা মহাত্মার হাতে গড়া প্রধানত জাতীয় মুক্তি অর্জনের নেতৃত্ব ও গণ-সংগ্রামের মুখপাত্র মহান জাতীয় ফ্রন্ট কংগ্রেসের পতাকা তলে একই সঙ্গে কাজ করেন।

যখন সংগ্রামের পদ্ধতি ও কৌশলগত প্রশ্নে মতপার্থক্য তীব্র হয়ে ওঠে তখন রক্ষণশীলেরা দাবী করেছিল নতুন চিন্তাধারা ও নতুন পার্টিগুলিকে কংগ্রেসের ভিতরে কাজ করার এবং আন্দোলনে অংশ গ্রহণের সুযোগ বন্ধ করে দেওয়া হোক। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী মতপার্থক্যের কারণে ঐ ধরনের পার্টি ও গোষ্ঠিগুলিকে বহিষ্কার করতে অসম্মত হন। তিনি কেবলমাত্র রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন নি তিনি তাঁর অনুসারীদের ক্ষমতা ও পদলোলুপতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন এবং দুর্নীতি—যখনই তা তাঁর চোখে পড়ে তিনি তার মুখোস খুলে দেন।

রাশিয়ার মহান মানবপ্রেমিক, গণতন্ত্রী ও সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ব্যক্তিত্ব টলষ্টয়ের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ মহাত্মা গান্ধী ১৯০৫ সালের রুশ বিপ্লবের কথা যখনই অবগত হন তখনই তার প্রতি শুভেচ্ছা জানান; এবং যদিও তিনি বলশেভিকদের নাস্তিকতা একেবারেই পছন্দ করতেন না তবুও তিনি

১৯১৭ সালের মহান অক্টোবর বিপ্লবের যারা বিরোধিতা করেছিল—সাম্রাজ্যবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে—তাদের সঙ্গে যোগ দেন নি।

তাঁর বহু বক্তব্য ও কাজ দুর্বোধ্য মনে হলেও, মহাত্মা গান্ধী ছিলেন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যোদ্ধা, এতাবৎকালের মনুষ্য ইতিহাসের অন্যতম মহান মানবতাবাদী এবং সেই সঙ্গে অবশ্যই ভারতীয় জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম মহান নায়ক।

এই সমস্ত কিছু আমাদের উদ্বুদ্ধ করবে তাঁর জন্ম বার্ষিকী এমন ভাবে পালনে যা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেবে সেই সব বীরদের বিপ্লবী স্মৃতি যাঁরা স্বাধীনতার জন্য, বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে, বৈষম্য ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে, জনগণের মধ্যে বিভেদ ও অনৈক্যের বিরুদ্ধে এবং ব্যক্তি ও জনজীবনে শুচিতার জন্য সংগ্রামে জীবন দিয়েছেন।

রাষ্ট্র ও সম্পদের নাগপাশের বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়চিত্ত অবস্থা, মানুষের বিশেষতঃ যারা দরিদ্রনারায়ণ ও নিপীড়িত তাঁদের মর্যাদা রক্ষার জন্য সংগ্রাম—এ সবের আজ পুনরুজ্জীবন দরকার। সব কিছুর উর্ধ্বে তিনি শ্রমের মর্যাদাকে স্থান দিতেন—যার প্রতীক হিসাবে তিনি প্রতিদিন সুতো কাটতেন।

আজ আমরা সকলে স্বাধীনতার সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করবো - যা একমাত্র কি না কোটিপতিদের ক্ষমতাকে চূড়ান্ত ভাবে পরাস্ত করতে এবং লক্ষ কোটি শ্রমজীবি মানুষ—যারা স্বাধীন ভারতের ক্ষেতে খামারে, কলে-কারখানায় হাত আর মাথা খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করে—তাদের ক্ষমতাকে চূড়ান্ত ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

মহাত্মা গান্ধী জন্মেছিলেন ১৮৬৯ সালে—যখন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিকেরা পিছু হটে যাচ্ছিল, যখন ইউরোপের আকাশে ফ্রাঙ্কো জার্মান যুদ্ধের ভয়াল কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছিল—যার থেকে সাম্রাজ্যবাদ জন্মলাভ করে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু যখন তিনি মারা গেলেন ১৯৪৮ সালে—তখন সাম্রাজ্যবাদ পিছু হটছে, বিশ্বের একতৃতীয়াংশে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত, এবং ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ছে। তিনি ভারতের মত একটা গুরুত্বপূর্ণ দেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে গেছেন—শেষ দিন পর্যন্ত—যেদিন ভারতের জাতীয় অগ্রগতি ও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের গতি রুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে এক দুষ্ট আততায়ীর হাতে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

আসুন, আমরা মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে যা কিছু ছিল পরার্থ চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ প্রতিরোধী ও সাহসিক—তা এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য এই জন্ম বার্ষিকীতে শপথ গ্রহণ করি।

চারণ কবি মুকুন্দ দাস

সনটা ছিল ১৯৭৮। একদিন পথ চলতে চলতে এক ঘরোয়া সভায় গিয়ে হাজির হয়েছিলাম। সেখানেই আমার পরিচয় পেয়ে একজন প্রবীণ ব্যক্তি, আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি চারণকবি মুকুন্দদাসের দৌহিত্রী?' এরপর আরো অনেক কিছু বলেছিলেন আবেগ ভরা কণ্ঠে। তিনি বলেছিলেন, আমরা তাঁকে দেখেছি. সে দেখার মধ্যে যে কি উন্মাদনা, কি আনন্দ, কেমন করে আজ বোঝাব!

তবে আমাদের সে দৌভাগ্য হয়েছিল। সে দেখার. আর আনন্দ ভোগ করার কথা কি ভোলার?

'তোমাকে আজ সে দেখার একটি সত্যি গল্প শোনাচ্ছি।'

আমি খুব আগ্রহ নিয়ে তাঁর কথা শুনলাম আর লিখে নিলাম সাথে সাথে। তাঁর মুখের কথা গুলোই লিখছি। তিনি বলে গেলেন।
'আমার বাড়ি মালদায়; ১৯৩৩ সালই হবে বোধ হয়। সেই সনের ঘটনা। আমার তখন ২৩ বৎসর বয়েস, কলেজে পড়ি।

আমি চারণকবি মুকুন্দদাসকে মালদাতেই দেখেছি। মালদার জনসাধারণ মুকুন্দদাসকে এনে-এনেছিলেন, তাঁর 'মাতৃপূজা' পালা গান, অভিনয় দেখবেন বলে। বায়না ছিল ৭ দিনের।

ঐ কালেনে স্বেচ্ছা সেবক দলের আমি ছিলাম অধিনায়ক। গানের সপ্তম দিনের অভিনয়ের দিন। অভিনয় শুরু হবার মুহূর্তে বৃটিশ সরকারের তরফ থেকে কিছু লোক এসে গান যাতে বন্ধ করা যায়, সেই চেষ্টা করতে লাগলেন।

আমরা তাঁদের বাধা দিতেই পুলিশ তখন ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে খবর পাঠাল, এখানে নাকি শান্তি ভঙ্গ করা হচ্ছে।

তখন জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এম ও কাটার এবং পুলিশ সাহেব ছিলেন হিস্ক্।

পুলিশ বাহিনী সহ তাঁরা যাত্রা অভিনয় স্থলে এসে হাজির। কথা বার্তা নেই বেদম ভাবে লাঠি চার্জ শুরু করে দিলেন।

দর্শক ও আমরা এই নির্মম লাঠি চার্জের হাত থেকে কেউ বাদ গেলাম না।

কিছুক্ষণের মধ্যে জনতা ছত্র ভঙ্গ হয়ে গেল। পুলিশের লাঠির চোটে যে যেদিকে পারলেন পালালেন।

ঝোপ ঝাড়, নদী পেরিয়ে—সে দিন সব প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলেন।

অগণিত মানুষের ভীড় হয়েছিল সেদিনও, মুকুন্দদাসের 'মাতৃপূজা' অভিনয় দেখার জন্য।

আগের দিনই জহরলাল নেহেরুকে গ্রেপ্তার করার মূল কারণও ছিল।

দুর্ভাগ্য আমাদের, তাঁর শেষ দিনের গানও অভিনয় আর দেখা হল না।

তবে আগের ৬ দিনের অভিনয়, গান যা দেখেছি ও শুনেছি তেমনটি এ জীবনে আর দেখব না।

সেদিনের বৃটিশ শাসকের রুদ্র মূর্তি দেখার এবং অনুভব করারও আমি সুযোগ পেয়েছিলাম।

এটা কল্পনাতীত, ম্যাজিস্টেট পুলিশ সাহেব দুজনেই ইংরেজ। তাঁরা নিজ হাতে স্ত্রী পুরুষ সকলকে নির্বিকারে পিটিয়েছেন। কিছু ভলান্টিয়ারকে এ্যারেস্ট করে নিয়ে গিয়েছিলেন।

লাঠি চার্জের পরে ম্যাজিষ্ট্রেট শূন্য প্যাণ্ডেলে এসে চারণ কবিকে বললেন

'এবার তুমি গান কর।"

তখন মুকুন্দদাস বললেন—

'আজ আপনারা যা করেছেন, আমি কাকে গান শোনাবো?' তারপর ওরা চলে গেলেন।

সে রাত্রি মুকুন্দদাস বিনিদ্র ভাবে কাটালেন।

মালদা সহরের এই অত্যাচারের কাহিনী গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। এই ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই চাঁচলে, এই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কাটার, তাঁর ট্যারে গেলেন।

তখন তখানকার যুবক দল সহরের ঐ অত্যাচারের প্রতিশোধ নিল run on—মিষ্টার কাটারকে বেদম মার দিয়ে। মিঃ কাটার তখান থেকে সোজা কলকাতায় এসে হাসপাতালে ভর্তি হয়।

এই ব্যাপারে তখানকার কিছু যুবক গ্রেপ্তার হয়।

মালদার গম্ভীরা গানের কথা সকলেরই জানা আছে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে গম্ভীরার গান বাঁধা হল।

টাউনে বাজলো ঢাক ঢোল,
চাঁচলে লাগলো গণ্ডোগোল,
কিলিয়ে কাঁঠাল পাঁকিয়ে দিলে
কলিকাতায় করিলে চালান,
বাপরে শুনতে যাবো না আর
মুকুন্দদাসের গান।

সে দিন বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখনকার যুবশক্তির মধ্যে এমনি ভাবেই আত্মমর্যাদা রক্ষার্থে ও দেশ প্রেমের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রকাশ পেয়েছে।

সে উন্মাদনা চোখে না দেখলে বুঝানো যায় না।"

* * *

ইনি মালদার শ্রী অনিল কুমার রায় মহাশয়। আজ আমাকে এমন একটি ঘটনার কথা শোনালেন, যেখানে তিনিও লাঠি চার্জের মুখা খেয়েছিলেন।

সব চেয়ে ভাল লাগলো মুকুন্দদাসের কথা কয়টি।

"আজ আপনারা যা করেছেন, আমি কাকে গান শোনাব?"

জায়গায় জায়গায় তাঁর এই মাতৃপূজা অভিনয়ে বৃটিশ সরকার বাধা দিয়েছিলেন। তাঁর আগুন ঢালা গানের সুরে জ্বলে উঠতো তখনকার দিনের বৃদ্ধ, যুবা ও মহিলারা,—

"ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ সমর রঙ্গে।"

বৃটিশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে দেশবাসিকে বলেছিলেন—

বাবু বুঝবে কি আর মলে
ছিল ধান গোলা ভরা, খেত ইন্দুরে করল সারা
চোখের ঐ চশমা জোড়া দেখনা বাবু খুলে।"

তার পর সরকার মাতৃপূজা বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। এই অভিনয়ের জন্যই তাঁকে সশ্রম কারা দণ্ড দিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

বইটির আজ ও কোন পাত্তা নেই। কি জানি বৃটিশ সরকার কোন অন্ধকারে তা লুকিয়ে রেখেছিলেন। যা আজও উদ্ধার করা গেল না।

আছে কি নেই তা আজো জানা যায় না। মুকুন্দদাস তাঁর 'ব্রহ্মচারিণী' নাটকের এক জায়গার একটি সিনে তাঁর মাতৃভক্তির আবেশ ভরা, ভক্তি. প্রেমের অপূর্ব এক অভিনয় করেছেন তা হল—

(ছদ্মবেশী মায়ের প্রবেশ)

মা। বসে বসে কি ভাবছ বাবা ?

দীনবন্ধু—আমার ভাববার অভাব কি মা ?

মা—আজ অধিবাসের দিন, পূজার যোগাড় কই, প্রতিমা কই ? এবার পূজা হবে না ?

দীনবন্ধু—না, আর এ বাড়ীতে প্রতিমা আসবে না।

মা—বলো কি ? তবে পূজো দেখবো কোথায়, প্রসাদ পাবো কোথায় ?

দীনবন্ধু—কি বলছো তুমি বালিকা ? যার ক্ষুধার অন্ন ভিক্ষার চাল সে কি কখনো দুর্গোৎসব করতে পারে ?

মা—ভক্ত মায়ের পূজা করবে, তাতে আবার ধন দৌলতের আবশ্যক কি ?

দীনবন্ধু—কি বলছো বালিকা, কে তুমি ?

মা—বাগান ভরা ফুল, বুক ভরা ভক্তি, পূজার আর লাগে কি বাবা ?

দীনবন্ধু—কে তুমি—কে তুমি ?

মা—আমি যেই হই, তুমি পূজা করবে।

প্রস্থান।

এমনি ভক্তই ছিলেন মুকুন্দদাস। তাঁর প্রথম লেখা নাটকটি হল 'মাতৃপূজা' যে অভিনয়কে বৃটিশ সরকার সাক্ষাৎ যমের মত ভয় করতেন। কিছুতেই মাতৃপূজা অভিনয় সহ্য করতে পারতেন না।

সে জন্য তাঁকে তিন বৎসরের সশ্রম দণ্ড সহ জেলে দিয়েছিলেন। বইটিকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

অমন প্রাণ, মন, ভক্তি, নিয়ে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন অশ্বিনীকুমারের নির্দেশে।

মুকুন্দদাসকে স্মরণ করতেই হবে আজ।

বাঙালী আজ অর্দ্ধ মৃত, পঙ্গু, দুর্বল, শক্তিহীন, অহমিকায় তাঁরা অন্ধ। আর একবার সেই মন্ত্র, বাঙালীর কণ্ঠে রুদ্র রূপে গর্জে উঠুক —

।। বন্দেমাতরম্ ।।

চারণ কবি মুকুন্দ দাসের দৌহিত্রী—পুতুল দেবী

বাজেট অধিবেশন বেহাল উদ্দেশ্য কি

স্টাফ রিপোর্টার

শ্রম দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বিধান সভায় গত ১৬ই সেপ্টেম্বর জানান গত ৫ বছরে রাজ্যে বেকার বেড়েছে ২০ লাখের ওপর। পশ্চিমবঙ্গর কর্ম-নিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত বেকার সংখ্যা বর্তমানে ৩২ লক্ষ ৮৫ হাজার ২৮৪। ১৯৭৭ সালে মার্চ মাসে এই সংখ্যা ছিল ১২ লক্ষ ৩১ হাজার ৯০৭, গত পাঁচ বছরে মাত্র ৮৩ হাজার ৪১১ জনের কর্ম-সংস্থান হয়েছে। বেকার সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে চলেছে, ১৯৮১ সালে মার্চ মাসে বেকার সংখ্যা ছিল ২৭ লক্ষ ৪০ হাজার ৬৪৪।

লোক বাড়ছে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা কমছে এর পরিণতি অবশ্যম্ভাবী বেকার স্ফীতি।

সারা ভারতে ২৫টী বেসরকারী শিল্পসংস্থা আছে যাঁদের এক একটী কারখানার মূল্য একশ কোটী টাকা থেকে পাঁচশ কোটি টাকা। এই ধরণের দেশীয় ও বহুজাতিক বেসরকারী শিল্পসংস্থার মাত্র সাতটী কোম্পানির মাঝারি আকারের কারখানা পশ্চিম বঙ্গে। বৃহৎ শিল্প-গোষ্ঠির মধ্যে টাটা ও বিড়লা কোম্পানী এখনও সব তার ওপর। এই দুই কোম্পানির মধ্যে টাটাদের মাত্র দুটি মাঝারি কারখানা কয়েক দশক ধরে পশ্চিমবঙ্গে চলেছে। গত এক দশকে টাটাদের কোন কারখানা পশ্চিমবঙ্গে খোলা হয় নি। পশ্চিমবঙ্গে বিড়লাদের পুরান কারখানা যে কয়টি তার সঙ্গে নতুন সংযোজন হয়েছে গত এক দশকে মাত্র তিনটী ছোট কারখানা কিন্তু গত দশ বছরে মহারাষ্ট্রে গুজরাটে, মধ্যপ্রদেশে, রাজস্থানে, উত্তর প্রদেশে, অন্ধ্রপ্রদেশে, বিড়লাদের যে কয়টী বৃহৎ কারখানা খোলা হয়েছে তার মূল্য ৫০০ কোটি টাকার ওপর।

বৃহৎ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যখন পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকাচ্ছে না তখন এই রাজ্যে গত ৫ বছরে ৩৯৯টী ছোট কারখানা বন্ধ হয়েছে। এই সব ছোট কারখানা কেন বন্ধ হল সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শিল্পমন্ত্রী কানাই ভট্টাচার্য্য বলেন এই সব কারখানা বন্ধ হয়েছে পরিচালকদের ব্যর্থতার জন্য ও কাঁচা মালের অভাবে। বিদ্যুৎ ঘাটতি মূল কারণ নয়; শ্রমিক অসন্তোষ কারণ নয়। এই সব ছোট কোম্পানীর অধিকাংশ মালিকই বাংগালী। কার-খানা বন্ধ হওয়ার সময় এঁদের অনেকেই রাজ্য-সরকারের কাছে আসেন নাই। যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই কারখানা খোলার সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। ৯২টী কারখানা খোলার চেষ্টা হয়েছে। বাকী কারখানাগুলি খোলার চেষ্টা নেই কেন, কোন জবাব নেই।

গত ৫ বছরে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে ৭টী বড় কোম্পানী তাদের কারখানা এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরিত করেছে। এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে শ্রমমন্ত্রী বলেন ৭টি কারখানা যেমন গিয়েছে তেমন ৪টি কারখানা এসেছে। ৭টি কার-খানার মধ্যে একটি গিয়েছে গাজিয়াবাদে একটি গুজরাটে, একটি উত্তরপ্রদেশে, একটি বিহারে, দুইটি মহারাষ্ট্রে ও একটি হরিয়ানায়। কেন চলে গেল, সরকার কোন খবর রাখেন না।

পশ্চিমবঙ্গ শিল্প প্রসারের দিক থেকে এগিয়ে যাওয়ার বদলে পিছিয়ে পড়ছে, শ্রমমন্ত্রীর বিবৃতিতে পরিষ্কার। পশ্চিমবঙ্গে শিল্প স্থাপনে উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তোলার যে কথা সরকারী মহল থেকে বার বার বলা হচ্ছে তার কোন লক্ষণই

এখন পর্যন্ত দেখা যায় না। নতুন করে এই শিল্প-প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পপতিরা উদ্যোগ নিচ্ছেন না। উপরন্তু চালু কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। শিল্পের এই বন্ধ্যাদশা শুধু যে ঐ সব কারখানায় নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারীদের রুজি-রোজগার নষ্ট করছে তাই নয়, নানাভাবে সরকারের রাজস্বও কমে যাচ্ছে।

কাঁচামাল পাওয়ার অসুবিধা এবং পরিচালকদের দূরদর্শিতার অভাবে শিল্পপ্রসারে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছে, ঠিকই কিন্তু বিদ্যুতের অভাব ও শিল্পে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাবের কোন প্রতিক্রিয়া হচ্ছে না। এ কথা বলা মানে একটা কঠোর বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করা। অগ্রাধিকার প্রাপ্ত নয় এমন শিল্পগুলিতে বিদ্যুতের যোগান গত জুলাই মাসে অর্দ্ধেক কমে দেওয়ার পরই বণিক সভাগুলির যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহের অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা নতুন শিল্পোদ্যোগীদের এই রাজ্যে মূলধন লগ্নি করার উৎসাহ নষ্ট করে দিয়েছে। গত আগস্ট মাসে শিল্পমন্ত্রী যখন বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বারের সভায় গিয়েছিলেন তখন সেখানেও তাঁকে এই কথাই শুনতে হয়েছে। শিল্পমন্ত্রী তার জবাবে বলেছিলেন যে বিদ্যুৎ অভাবে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের ক্ষতি নিশ্চয়ই হচ্ছে কিন্তু ক্ষতি যতটা হচ্ছে তার চেয়ে বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। একটি হিসাবে প্রকাশ গড়ে প্রতিদিন এক মেগাওয়াট্ বিদ্যুত ঘাটতির জন্য বছরে শিল্প উৎপাদন নষ্ট হয় ৬ কোটী টাকার মত। এ ব্যাপারটা ধামাচাপা দিলে মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবাবু শিল্পপতিদের পশ্চিম বঙ্গের শিল্পে মূলধন বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে পারবেন কি করে?

শিল্পমন্ত্রী কানাইবাবু বলেছেন আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যার জন্য কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার খবর তাঁর কাছে নেই। তাঁকে দুর্গাপুরে শিল্পাঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের করুণ স্মরণ করে দেওয়া যেতে পারে। সেখানে গত জুলাইমাসে ১৪০টী ছোট ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা বন্ধ হয়েছিল কেন? এই শিল্পের মালিকদের সংগঠন থেকে বলা হয়েছিল, শ্রমিকরা কয়েকটী কারখানার ম্যানেজারদের ১০ থেকে ১৪ ঘণ্টা ঘেরাও করে রেখেছিল এবং সেই ঘেরাও থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পুলিসের সাহায্য দেওয়া হয়নি বলেই কারখানাগুলি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। শিল্পক্ষেত্রে নৈরাজ্য সহ্য করা হবে না বিশেষ করে ঘেরাও করতে দেওয়া হবে না জ্যোতিবাবুর এই বিবৃতির পরই দুর্গাপুরে এই ঘটনা ঘটেছিল। কাজেই শিল্পপতিরা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতিতে ভরসা করতে পারে না। ফলে শিল্পপতিরা পশ্চিম বঙ্গে শিল্প গড়ার উদ্যোগ নিচ্ছেন না। এই হল শিল্পে বামফ্রন্ট সরকারের কৌশলের পরিণাম। মুখ্যমন্ত্রী ঘেরাও চলবে না বিবৃতি দিলেও ঘেরাও নীতি সি, পি, এম, ক্যাডাররা ত্যাগ করে নাই। ১৯৮০ সালেও ১৫টী ঘেরাও হয়েছে। একই নীতিতে পুরুলিয়া রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সদর দরজা সি, পি, এম ক্যাডাররা আটকে বসে আছে, গেটের চাবি বিদ্যাপীঠের কর্তৃপক্ষকে দিচ্ছে না। পুলিশ সুপারিটেনডেন্টের ইচ্ছা থাকলেও উপরের সমর্থন না পাওয়ায় হস্তক্ষেপ করছেন না। কাজেই সি, পি, এম দল নীতি হিসাবে ঘেরাও নীতি এখনও পরিত্যাগ করে নাই।

কৃষিতে বামফ্রন্ট সরকার আরও অপদার্থতার পরিচয় দিয়েছে। এই রাজ্যে একসময়ে নদীয়া জেলায় গমের যে ফলন হয়েছে তা তৎকালীন কেন্দ্রিয় সরকারের কৃষিমন্ত্রী জগজীবন রামকে পাঞ্জাবের কথা

মনে করিয়ে দিয়েছে। রাজ্য সরকারের কৃষি বিভাগের প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, ১৯৭৫-৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১২ লক্ষ ৮৭ হাজার টন গম উৎপন্ন হয়েছে।

১৯৭৯-৮০ সালে কমে ৭ লক্ষ ৬৮ হাজার টন ও ১৯৮০-৮১ সালে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার টনে দাঁড়িয়েছে। এই প্রসঙ্গে কৃষিমন্ত্রী কমল গুহ বলেছেন কৃষকরা ভাল দাম না পাওয়ায় গমের চাষ কমিয়ে দিয়েছে এবং ধানের চাষ সুরু করেছে। সত্য কথাটা প্রকাশ করতে কৃষিমন্ত্রী ভরসা পান নাই। উন্নত জাতের গমের বীজের উৎপাদন ও সংগ্রহের যে নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার গমের ফলন বাড়ান দরকার ছিল, সে চেষ্টা করা হয়নি বলে উৎপাদন নিম্নমুখী সরকার এই সত্যটা এড়িয়ে চলেছেন। বোরো ধান চাষের তুলনায় গম চাষের খরচ অনেক কম। গম চাষে জলও অনেক কম প্রয়োজন হয়। গত কয়েক বৎসরই উন্নত জাতের বীজের অভাবে হেক্টর পিছু গমের উৎপাদন কমেছে। ১৯৭৫-৭৬ সালে হেক্টর পিছু ২১০০ কিলোগ্রাম উৎপন্ন হয়েছে, ১৯৮১ সালে উৎপন্ন হয়েছে হেক্টর পিছু ১৬৭২ কিলোগ্রাম। গত ৬ বছরে বোরো ধানের জমি বা উৎপাদন কোনটাই উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ে নাই। কাজেই সত্য কথাটা হল পশ্চিমবঙ্গে গমের ফলন কমেছে ভাল জাতের পর্যাপ্ত পরিমাণ বীজের অভাবে। কৃষি বিভাগ প্রতি বছর গম ফলনের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দেন, কিন্তু সেজন্য প্রয়োজনীয় ভাল বীজ পাওয়ার ব্যবস্থা করেন না। পশ্চিমবঙ্গে গমের বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা কৃষি বিভাগ করেনাই বাইরে থেকে বীজ আনার ব্যবস্থা করতে হয়, সময় মত সেই ব্যবস্থা না করায় চাষীকে নিজের খেতের ফলনের একটা অংশ বীজ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়। এতে উদ্ভিদ্ বিজ্ঞানের স্বাভাবিক নিয়মেই ফলনের হার কমে যায়। বছরের পর বছর একই মূল বীজের প্রজাতি ব্যবহারে অধিক ফলনশীল বীজও অধিক ফলনশীল থাকে না। পশ্চিমবঙ্গে গত কয়েক বছর এই ব্যবস্থাই চলছে। এমন কি এবছরও খরার ক্ষতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্য গমের ফলন বাড়াবার সিদ্ধান্তের পরও দেখা যায় বীজ কোথা থেকে পাওয়া যাবে তার হদিশ নেই। এর ফলে কৃষিমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় গমের যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছেন (সাড়ে পাঁচ লক্ষ হেক্টারে ১১ লক্ষ টন) সেই লক্ষ্যমাত্রায় পৌছানর সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। আজ পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়াতে হলে গমের উৎপাদনের বৃদ্ধির দিকে নজর রাখতেই হবে, কারণ গম চাষে খরচ কম, জল কম লাগে, ফলনও বেশী হয়। এই সব অভিজ্ঞতা কৃষি বিভাগের থাকা সত্বেও কৃষি বিভাগকে কৃষিমন্ত্রী কাজে লাগাতে পারছেন না। ফলে খাদ্যশস্যেও পশ্চিমবঙ্গ পিছনেই পড়ে যেতেছে।

শিল্প ও কৃষি এই দুটীই সমাজের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড, এই দুইটীতেই বামফ্রন্ট সরকার নিজেদের কর্মকুশলতার অভাবে পিছিয়ে পড়ছে। ব্যর্থতার আসল কারণ মাঝে মাঝে প্রকাশ করে শুধরানোর চেষ্টা করলেও দলীয় নীতির জালে আটকে পড়ছে। এই বিভ্রান্তিই দপ্তরগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

বিধানসভার ভাঙ্গা হাটে ২৯৪ জনের মধ্যে মাত্র ৫৩ জন সদস্যের উপস্থিতিতে পরিবহন মন্ত্রী রবীন মুখার্জির বক্তব্যে এই বিভ্রান্তির চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে। রবীনবাবু বলেছেন রাজ্য পরিবহনের জন্য ভরতুকি দিয়ে চলাই বামফ্রন্টের নীতি। আমরা কখনই মনে করি না, যে পরিবহন লাভের অঙ্কে নিয়ে যেতে পারব। অতএব লোকসান বরাবরই থাকবে। প্রশ্ন করা যেতে পারে বিশ্বব্যাঙ্কের

আঠেল টাকায় বাস বের করে ও বাস মেরামত করেও পরিবহন দপ্তরকে শুধু লোকসান গুনতে হয় কেন ? লোকসানের পরিমাণও কম নয়, বছরে ১৬ কোটি টাকা। মন্ত্রীমশায় লোকসান ছাড়া বাস চালান সম্ভব নয় ফতোয়া দিলেন, কিন্তু লোকসান রোধ করার পথ উল্লেখ করলেন না কেন ? সাধারণ মানুষ গোদামজাত হয়ে বাসে যাতায়াত করে। জীবন বিপন্ন করে গন্তব্যস্থানে পৌঁছন পুড়াভাড়া দিয়েই। এত ভিড়, এত যাত্রী তবু লোকসান এত বেশী কেন ? আসল গলদ কোথায় ? যাত্রীসংখ্যা অনুযায়ী আদায়ী টিকিটের মূল্য দপ্তরে ঠিকমত জমা পড়ে কিনা খোঁজ নিয়েছেন কি ? মধ্যপথে কোথাও উঠে যায়নাত। অথবা দপ্তরের নেপথ্য গোপন পথ দিয়ে টাকাকড়ি যাওয়ার পথগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করেছেন কি ? মন্ত্রীমহোদয় সরকারী ব্যয়ের দুর্নীতি, অপদার্থতা এবং প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মি-সংখ্যার বাস্তব অবস্থার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে লোকসান হবেই মেনে নিলেন কোন যুক্তিতে, এতে কি দুর্নীতি প্রশ্রয় পেল না ?

এবারের বাজেট অধিবেশনে মন্ত্রীদের বিবৃতি দপ্তর সুষ্ঠু পরিচালনা ও দুর্নীতি মুক্ত করার দিকে দৃষ্টি না দিয়ে হতাশার ছবি তুলে ধরেছে, দপ্তরে এতে দুর্নীতি ও অকর্মন্যতা বেড়ে যাবে। দপ্তরগুলি দুর্নীতিতে ঝরঝরে করে সংকট সৃষ্টি করে কেন্দ্রিয় সরকারকে বিব্রত করাই কি উদ্দেশ্য, কেন্দ্র হতে অধিক অর্থ আদায়ের কৌশল ?

২৫/৯/৮২ইং

With the best Compliments of :

গান্ধী চর্চা আজও হল না

বিপ্লবী নরেন দাস

মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে যথাযোগ্য চর্চা এখনো হয়নি। কারন অনেক। পঞ্চাশের দশকে সমকালীন মানুষের ভেতরে ছিলেন অনেক প্রখ্যাত নেতা। তারা অবসর মতন গান্ধী চর্চা করছেন। আশীর দশকেও বহু রঙের ভক্তদের ভিড়। পঞ্চাশের বা ষাটের দশকে ছিলেন রাজাগোপালাচারি, পণ্ডিত নেহেরু, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও আচার্য কৃপালণীর মত বিদগ্ধ ব্যক্তি। এখন যাঁরা আছেন তাঁরা অনেকেই গান্ধী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা। সাধারণ মানুষ। গান্ধীজীকে বিনা বাক্য ব্যয়ে অনুসরণ করেন। অন্ধভক্ত। গভীর চর্চা করতে পারেন প্রকৃত ঐতিহাসিক। প্রয়োজনে সমালোচনা ও বিচার করার গভীর জ্ঞান, সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল মন আর ওই জটিল অধ্যায়ে ভারতবর্ষ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান তাঁর থাকা দরকার। বাধান ফরমূলা দিয়ে গান্ধীর বিচার অসম্ভব।

গান্ধীবাদী বলে অনেকে পরিচয় দেন। কিন্তু গান্ধীবাদী বলতে কেবল একজন মানুষই ছিলেন। তিনি স্বয়ং গান্ধী এক জটিল ও বর্ণাঢ্য মানুষ। সত্যি সত্যিই তার জীবনই তার বাণী। কিন্তু সমগ্র জীবন অনঙ্গতিতে ঠাসা। ওই বহুমুখী জটিলতার সমাধান করার জন্যে সঠিক ডায়ালেকটিস আবিষ্কার করা প্রয়োজন। যে সকল দার্শনিক ঐতিহাসিক ওই কাজ করতে সক্ষম তারাই গান্ধীজির জীবনের গোপন চাবি কাঠি অর্জন করবেন।

বুয়োর যুদ্ধে গান্ধী ইংরেজের পক্ষে সেবামূলক কাজের জন্যে কাইজারই-হিন্দ-মেডেল পুরস্কার পান। সেই গান্ধী ১৯২০ সালে ভারতবর্ষের অন্তরের কথা ঘোষণা করেন ব্রিটিশ রাজ অভিশাপ কী বিরাট পরিবর্তন। গান্ধীজি অহিংসায় বিশ্বাসী। কেবল কর্মীদের জন্যই অহিংসার বিধান নয়— অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত জনতার জন্যেও। ১৯২২ সালে চৌরিচেরার ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ কনেস্টেবলকে উন্মত্ত জনতা হত্যা করে। গোরক্ষপুরের ইদুরের মতন। ইদুর বিড়ালকে আত্মরক্ষার্থে কামড়ালে বা নখ দিয়ে আঘাত করলে হিংসা হয় না। ইদুর জানে বিড়ালের বিরুদ্ধে লড়াই করার পরিণাম নিশ্চিত মৃত্যু। নিশ্চিত মৃত্যুর দুয়ারে ইদুরে ওই কাজ অহিংসে।

গান্ধী চরিত্র সম্যক বোঝার জন্য আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা প্রয়োজন। আমরা জানি যে গান্ধীর অসাধারণ ক্ষমতা ছিল জনমানসের নাড়ির খবর জানার। জনতার বিস্ফোভের পাত্র পূর্ণ হলে যাত্রা করেন যাত্রী। ২১ ৩০ ৪২ সালে তা প্রত্যক্ষ করেছি আমরা। ১৯৪৬ সালেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ক্যাবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য উপস্থিত। গান্ধী তাঁর সহকর্মীদের আর একবার গণ আন্দোলনের ডাক দেওয়ার প্রয়োজনিতার কথা বলেন। একথাও জানান যে পরিকল্পিত আন্দোলন করলে ইংরেজের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে মুসলিম লীগের স্থান মুছে যাবে—কেবল কংগ্রেসের সঙ্গে সেই আলোচনা হবে। নেহেরু ও প্যাটেল রাজী হননি। আন্দোলন হতে পারল না। অনিবার্য ফল ভারত বিভাগ।

অনেকের ধারণা নেহরু প্যাটেল প্রসাদ প্রভৃতি গান্ধীর ভক্ত। তাঁরা গান্ধীর সৃষ্টি কিন্তু কেউ-ই ভক্ত নন। ক্ষমতা হস্তান্তরের চরম পর্যায় তাঁরা সাথী। দেশ বিভাগের মূল নীতি গ্রহণ করা হয় জাতির জনকের অগোচরে। জয়প্রকাশের কাছে শুনেছি যে সর্দার প্যাটেল আশালীন উক্তি করতেন গান্ধী সম্পর্কে। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় বলতেন যে গান্ধী হচ্ছে অচল সিক্কা। গান্ধী শেষমূহূর্তে শরৎ বসু সুরাবর্দী প্লান (স্বাধীন বাংলা) গ্রহণ করেও হাই কমাণ্ডের কাছ থেকে পাশ করতে পারেন নি। একথা শুনে শরৎ বসু গান্ধীজিকে বলেছিলেন বাপু সর্দার প্যাটেল ও তোমার লোক—আর রাজেন্দ্রবাবু তোমার নির্দেশ মানেন। জবাবে গান্ধীজি বলেছিলেন,

Sarat you do not know things. Sardar is my no man. The less you Talk about Rajendra Babu the better He knows how to climbe the ladder.

জীবনের সায়াহ্নে গান্ধী একা। তার জন্যেই মাউন্ট ব্যাটেন বলতে সাহস করেছিল মিঃ গান্ধী ওয়ার্কিং কমিটি আমার পেছনে। গান্ধীজি চকিতে জবাব দিয়েছিলেন তা হোক দেশ আমার পেছনে। এই [illegible] —[illegible]

নয়া বিশদফা কর্মসূচী—কি ও কেন ?

কল্যাণ রায়

আমাদের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-দারিদ্র্য দূর করতে হ'লে দেশের সর্বক্ষেত্রে পরিকল্পিত ও দ্রুত অগ্রগতি চাই। এই অগ্রগতি সম্ভব করার জন্য পঞ্চ-বার্ষিকি পরিকল্পনা করা হয়েছে। তার রূপায়ণের জন্য হাজার হাজার কোটি টাকার সুবৃহৎ বাজেটও করা হয়েছে। তবে আবার বিশ-দফা কর্মসূচীর দরকার হ'লো কেন ?—এটা আজ পর্যন্ত কি কংগ্রেসী, কি অ-কংগ্রেসী অধিকাংশ লোকের কাছেই পরিষ্কার নয়।

পাঁচটি পঞ্চ-বার্ষিকি পরিকল্পনা হয়ে গেছে। এখন ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিকি পরিকল্পনা অনুসারে কাজ চলেছে। এই সব পরিকল্পনাগুলির ফলে দেশের অগ্রগতি হয়েছে ঠিকই—কৃষি উৎপাদন, শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিকল্পিত অগ্রগতির সুফল কি দেশের সব মানুষ সমানভাবে পেয়েছে ? গত ৩৫ বছরে দেশের যে অগ্রগতি হয়েছে তার সুফল যদি সব মানুষ সমান ভাবে পেতো তবে ভারতের চেহারা আজ সম্পূর্ণ অন্য রকম হ'তো, গর্ব করার মত হ'তো।

৩৫ বছরের অগ্রগতি কাগজে কলমে দেখিয়ে এ কথা অবশ্যই দাবী করা যায় যে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়েছি। খাদ্য-শস্যের উৎপাদন ৫৫ মিলিয়ন টন থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩০ মিলিয়ন টন এবং তা আরও বেড়ে চলেছে। ইস্পাত, সিমেন্ট, বিদ্যুৎ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলকারখানা বস্ত্র-চিনি- চটশিল্প —এ সব কয়েক গুণ করে বেড়েছে। যার ফলে শিল্পোন্নতিতে ভারতের স্থান আজ বিশ্বে শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে দশম। ভারত বিজ্ঞানে ও কারিগরি বিদ্যায় শিক্ষিত মানুষের হিসাবে বিশ্বের তৃতীয় স্থানের অধিকারী। স্বাস্থ্য চিকিৎসার দিক থেকেও ভারত বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করেছে। এমন কি সর্বাধুনিক মহাকাশ ও আণবিক বিজ্ঞানেও ভারত সম্মানজনক স্থানের অধিকারী।

এসব কথা যেমন আমরা গর্ব করে বলতে পারি ঠিক একই সঙ্গে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এত সব অগ্রগতি সত্ত্বেও আজও দেশে কোটি কোটি মানুষ খাদ্য-বস্ত্র-শিক্ষা-চিকিৎসার অভাবে নিদারুণ দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। দেশের মানুষের একটা বৃহৎ অংশ এখনও বাস করে 'দারিদ্র্য সীমার' নিচে। গ্রামাঞ্চলের অনেক জায়গায়ই দেখা যাবে যে আমাদের দেশের মানুষ বিশেষ করে হরিজন, উপজাতি সম্প্রদায় এবং সহর থেকে সুদূরের মানুষেরা এখনও প্রায় সেই আদিম বর্বর যুগে, সভ্যতার আলোকের বাইরে অমানুষের মত জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছে।

এমন কি এই অগ্রসর সহরাঞ্চলেও তীব্র বেকার সমস্যা, সাম্প্রদায়িক বিভেদ, পণপ্রথা প্রভৃতির মত ব্যাপক সমস্যা সমগ্র অগ্রগতিকে কালিমা লিপ্ত করে দিচ্ছে।

এদিকে জাতীয় অগ্রগতি যেমন সত্য তেমনই আবার লজ্জাজনক দারিদ্র্য বেকারী অশিক্ষাও সত্য। এবং এই দুটোই একই সঙ্গে আমাদের পরিকল্পিত অগ্রগতির ফল।

অর্থাৎ পরিকল্পিত অগ্রগতি সত্ত্বেও এর সুফল আমাদের দেশের সর্বস্তরের বা সকল অঞ্চলের মানুষ সমান ভাবে। বিশেষ করে যারা গরীব, যারা দুর্বল, যারা পশ্চাদপদ তারা ফললাভ করেছে কম অপর দিকে, যাদের সুযোগ-সুবিধা ও সামর্থ্য বেশী তারা লাভবানও হয়েছে বেশী। ফলে ধনী দরিদ্র

বৈষম্য বেড়েছে। গরিব গরিবই থেকে গেছে, বড়লোক আরও বড়লোক হয়েছে।

কেন এমন হ'লো? তা'হলে কি আমাদের পরিকল্পনাই ত্রুটিপূর্ণ? এটা কি এমনই পরিকল্পনা যা বড়লোকদেরই শুধু আরও বড় হতে সাহায্য করে? ব্যাপারটা সম্ভবতঃ তা নয়।

দোষ পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা রচয়িতাদের নয়। আমাদের সমাজ কাঠামোটাই এমন যে এর মধ্যে যত চিন্তা-ভাবনা করে পরিকল্পনাই করা হোক না কেন এ সমাজে যার আর্থিক বা সামাজিক ক্ষমতা যত বেশী সে পরিকল্পনার সুযোগ নিতে পারবে তত বেশী। আর যারা দুর্বল, সামর্থ্যহীন তারা হবে বঞ্চিত। এটা হ'লো আমাদের সমাজ-ব্যবস্থার অবধারিত ফল—তা সে পরিকল্পনা কংগ্রেস করুক কি বামফ্রন্ট বা কমিউনিস্টরাই করুক।

যে দেশে সমাজের বৈপ্লবিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন হয়েছে, সমাজ-কাঠামোটাই গেছে পাল্টে, নিচের তলার মানুষরা উপরে ওঠে এসেছে আর যারা আগেকার দিনে ছিল ক্ষমতাশালী, আইন তাদের রেখেছে দাবিয়ে—যা হয়েছে কি'না রাশিয়া, চীন বা কিউবার সেখানে এ সমস্যা দেখা দেয়নি।

দুর্ভাগ্য যাই হোক না কেন ভারতে তেমন বিপ্লব হয় নি। আর অদূর ভবিষ্যতে তেমন কিছু হবার সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তাই পরিকল্পনা রচয়িতাদের সব সদিচ্ছা সত্ত্বেও দেশের সুষম বিকাশ সম্ভব হচ্ছে না।

পরিকল্পনার এই অভাব বা ত্রুটি দূর করার জন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে বিশ দফা কর্মসূচীর।

পরিকল্পনা একটা সুবৃহৎ কর্মসূচী—যার মধ্যে প্রধান স্থানগুলি দখল করে আছে বড় বড় মূল শিল্প গড়ে তোলার, জলসেচ ব্যবস্থা, ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা, ছোট-ছোট যাতায়াত ও যান-বাহনের ব্যবস্থা করা, আমদানী-রপ্তানীর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি। বিশদফা কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হ'লো দেশের নিচের তলার বঞ্চিত, দুর্বল দরিদ্রতর মানুষরা এই পরিকল্পনা থেকে কিভাবে লাভবান হতে পারে, তার দিকে নজর দেওয়া। এক কথায় বলতে গেলে দেশের সার্বিক ও সুষম উন্নয়ণের প্রশ্নে পরিকল্পনার যে ঘাটতি থেকে গেছে বিশ দফা কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হ'লো তা পূরণ করা। বিশ-দফা কর্মসূচীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপের—

সার্বিক পল্লী উন্নয়ণ জাতীয় পল্লী কর্মসংস্থান কার্যসূচী জোরদার ও ব্যাপক করা, উদ্বৃত্ত জমি সংগ্রহ ও বন্টনের ব্যবস্থা করা কৃষি শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন কার্যকরী করা, বেগার শ্রমিকদের পুনর্বাসন, পানীয় জলের ব্যবস্থা গ্রামের গৃহহীনদের বাস্তুজমি প্রদান ও গৃহ-নির্মাণে সাহায্য করা গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, পরিবার পরিকল্পনাকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত আন্দোলনের রূপ দেওয়া, প্রাথমিক জনস্বাস্থ্য সুবিধা প্রসারিত করা, নারী ও শিশুদের পুষ্টি কার্যসূচীকে ত্বরান্বিত করা, প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা, ন্যায্যমূল্যের দোকান চালু করা, গরিবেরা যাতে ব্যাঙ্ক থেকে প্রয়োজনীয় ঋণ পায় তার দিকে লক্ষ্য রাখা, অসৎ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা, কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি ও বিশেষ করে সরকারী সংস্থাগুলির কার্যধারার উন্নতি বিধান।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার একটা বড় দুর্বলতা হ'লো—এর রূপায়ন সরকারী আমলাতন্ত্র বা প্রশাসন যন্ত্রের উপর নির্ভরশীল। যাতে দুর্বলতর শ্রেণী এই পরিকল্পনার ফলে লাভবান হয় তারজন্য প্রয়োজন গণ-উদ্যোগ। এই গণ-উদ্যোগের ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করেই রচিত হয়েছে বিশদফা কর্মসূচী।

এই কারণে দুর্বল ও দরিদ্রতর মানুষের স্বার্থে জাতীয় পরিকল্পনাকে গণমুখি করে তোলার জন্য ২০ দফা কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মত রাজ্যে বেসরকারী গণউদ্যোগ একান্ত প্রয়োজন।

(সম্পাদক -)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীকামাক্ষ্যা রায়

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রগোহন রায়—১০·০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। যবদ্বীপে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। সৌহাদ্দি সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—·৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে শহীদ মা ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৫০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (১)—১·০০, ১৪। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (২)—১·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—১·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৯নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

টৈশলশ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

Regd No. R. N. 24311/71
DAVP—Regd
বার্ষিক :—নগদ ১৮০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
ষান্মাষিক :—১০০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—১ টাকা

স্বাধীনতার দৌলতেই আমাদের এই সুযোগ

নয়া বিশ-দফা কার্যসূচী আমাদের পথ দেখায় ও এগিয়ে যাবার অনুপ্রেরণা দেয়

"রাষ্ট্রের কল্যাণে এই যে কর্মযজ্ঞ সেটা দেশের সার্বিক উন্নয়নের মোটা পরিকল্পনার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। কোন ক্ষেত্রে কতটা জোর দিলে উন্নয়ন কোন পর্যায়ে দ্রুত সফল হয়ে উঠবে এই কার্যসূচী তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়।"

এই কার্যসূচীর সফল রূপায়ণ প্রত্যেক নাগরিকের সহযোগিতার ওপর নির্ভরশীল

আসুন এই দলে আমরা সবাই যোগ দি

"এই কার্যসূচী আমাদের প্রত্যেকের জন্যে, আমাদের দেশের স্বার্থে, যে দেশ আমাদের নিজেদের এবং যে দেশকে সম্মানে লালন করতে হবে, সেবা করতে হবে, গড়ে তুলতে হবে।"

—প্রধান মন্ত্রী
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

স্বাধীনতার ৩৬তম বর্ষ—নবম এশিয়াড ক্রীড়ানুষ্ঠানের বর্ষ।

davp 82/208

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

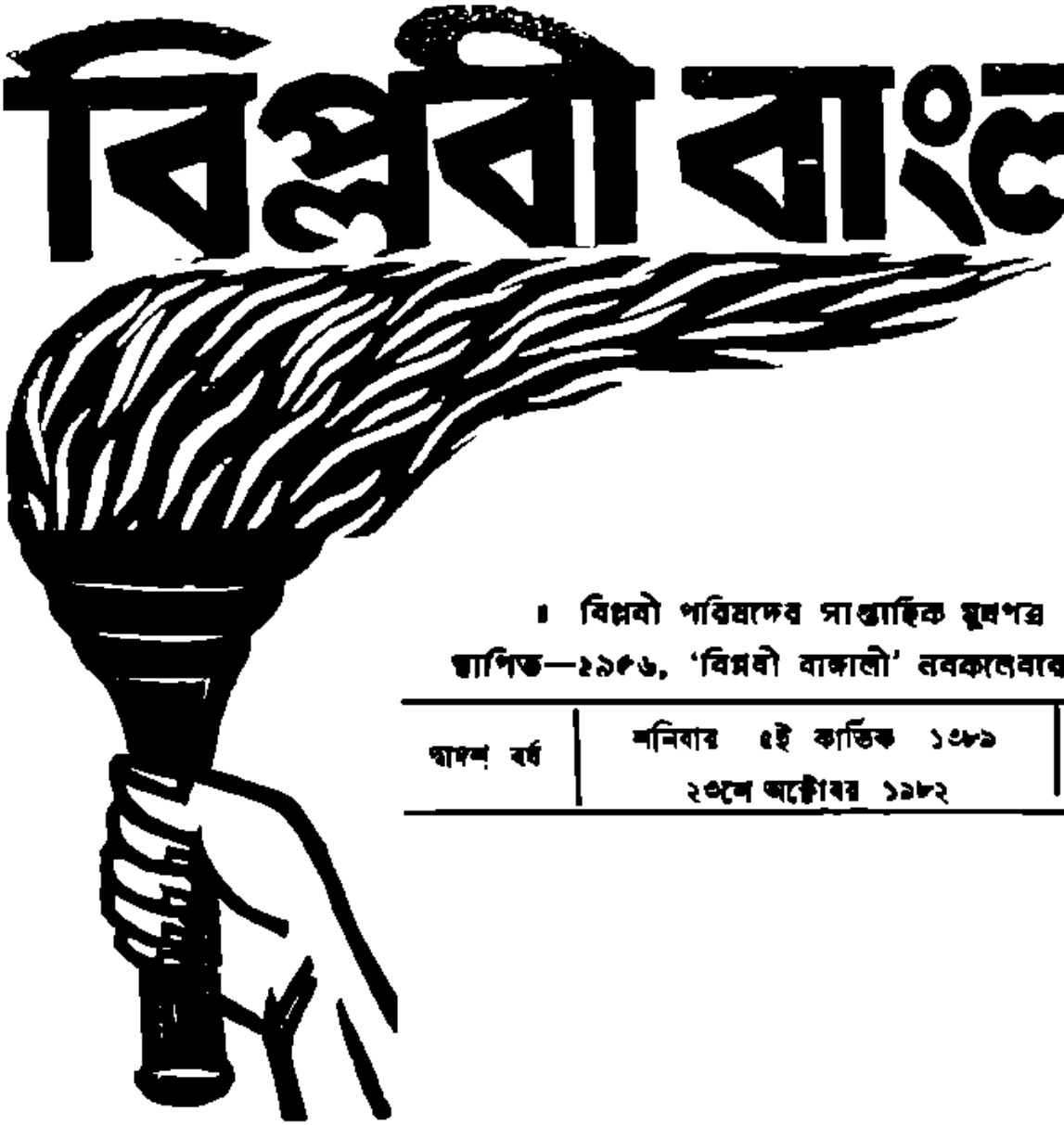

॥ বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ॥

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দশম বর্ষ	শনিবার ৫ই কার্ত্তিক ১৩৮৯ ২৩শে অক্টোবর ১৯৮২	৫ম/৬ষ্ঠ সংখ্যা

"আমি প্রায়ই ভাবি—বাঙ্গালী কবে মানুষ হইবে—কবে ছার টাকার মোহ ছাড়িয়া উচ্চ বিষয়ে ভাবিতে শিখিবে—কবে সকল বিষয়ে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিবে—কবে একত্র শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন করিতে শিখিবে—কবে অন্যান্য জাতীর ন্যায় নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া নিজেকে "মানুষ" বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে।"

—নেতাজী

সম্পাদকীয়

কাশ্মীর সঙ্কট

স্বাধীনতা প্রাপ্তির লগ্ন থেকে কাশ্মীর সমস্যা ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি দুষ্ট ক্ষতের মত কাজ করে চলেছে। কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা নিজের রাজ্যকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী সৈন্যরা যখন হানাদারদের ছদ্মবেশে, কাশ্মীরের একদল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের সহায়তায় কাশ্মীরের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছিল, বহুমানুষের রক্তধারায় কাশ্মীরকে রঞ্জিত করে তুলেছিল, এমন কি বিদেশী মিশনারী হাসপাতাল ও নার্সদের উপর বর্বর আক্রমণ চালাতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তখন ঘটনাস্রোতের চাপে পড়ে কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা ভারতভুক্তিচুক্তিতে সই করে কাশ্মীরকে ভারতেরএকটি অঙ্গরাজ্যরূপে রূপায়িত করেছিলেন। পুরাণো ইতিহাসের বিবরণ আজ অপ্রয়োজনীয়। বহু রক্ত, ঘর্ম, অশ্রু, শ্রম, জীবনদান করে এই অসাধ্য কাজ সাধন করেছিলেন আমাদের বীরসেনাদল। অবশ্য ওখানকার জাতীয়তাবাদী মানুষেরাও এই দুরূহ কাজে সর্বপ্রকার সাহায্য দান করেছিলেন এমনকি জীবন আহুতি দিয়েও পাকিস্তানকে বাধ্য করেছিলেন পিছু হটে যেতে। কিন্তু এই সমস্যার সর্বাঙ্গীন মূল্যায়ন যেন তখন করতে পারেননি আমাদের দেশের কোন কোন বিশিষ্ট নেতা। ইংরেজ শক্তি ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা এই কাশ্মীর আক্রমণের ইন্ধন জুগিয়েছিল। সেটা যেন আমাদের নেতাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেল। তাই পলায়মান পাকিস্তানীদের কাশ্মীর রাজ্য থেকে সমূলে উৎখাত না করেই যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করা হল আমাদের তরফ থেকে। সম্মুখ যুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর পশ্চিমী শক্তিরা যখন কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র সঙ্ঘে এই ব্যাপারটি নিয়ে গিয়ে পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেওয়ার পক্ষে সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছে। তখন অজ্ঞতা-বশত রাষ্ট্রসংঘকে একটি নিরপেক্ষ বিচার সভা মনে করে তাদের ফাঁদেই ধরা দিলাম। ফলে, ভারত-বৈরী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা কাশ্মীর নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চটাকে রাজনৈতিক দাবা খেলার ছকে পরিণত করল। পর্যবেক্ষক পাঠিয়ে কাশ্মীরের একটা বিরাট অংশের উপর পাকিস্তানের কর্তৃত্বকে বজায় রাখার সুবিধা করে দিল। তারা ভোট দিয়েও পাকিস্তানকে সাহায্যও করতে চেয়েছিল। বন্ধুবাদ, সোভিয়েত রাশিয়াকে, ভেটো প্রয়োগ করে সাম্রাজ্যবাদীদের কুচক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছিল।

কাশ্মীর সমস্যাকে জিইয়ে রাখা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ সাধনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। সে লক্ষ্যে

আজও তারা অটল। উদ্দেশ্য ভারত রাষ্ট্রকে বিব্রত করা, দুর্বল করা ও নিজেদের বংশবদ এলাকা হিসাবে ব্যবহার করা।

কিন্তু ভারতবর্ষের নেতারা তখন যে কাজটা সম্পূর্ণ করা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেটা না করে কাশ্মীর নিয়ে ভারতবিদ্বেষীদের মনকৌশলকে অনিচ্ছাকৃতভাবে সঞ্জীবিত করে রাখার কাছে সহায়তা করেছেন এসত্য অবশ্য স্বীকার্য্য যে কাশ্মীর, তথা ভারতের অন্যান্য অংশের একদল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত লোক, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার মোহ থেকে মুক্ত হতে পারেনি আজও পর্য্যন্ত। তাই পাকিস্তানী গুপ্তচরদের আশ্রয় মিলছে এদেশে এখনও এবং পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিয়ে চলেছে। মূল ব্যধি এখানেই। ভারতবর্ষের তরফ থেকে এদের সঙ্গে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা হয়নি। এদের দেশদ্রোহিতার কাজ কর্ম ও পরিকল্পনাকে সমূলে বিনষ্ট করার যথাযথ প্রচেষ্টা হয়নি। একথা কেউ বলবে না যে বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের লোকদের বেছে বেছে উৎখাত করা হোক।

ভারতবর্ষের গৃহীত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিরও এর দ্বারা অমর্য্যাদা করা হবে। কিন্তু দেশের মধ্যে একদল মানুষ যে সম্প্রদায়ভুক্তই হোক না কেন তারা—দেশের সর্বনাশসাধন করার কাজে নিযুক্ত থাকবে আর তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবেনা এটা কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয়। জাতীয় জীবনের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেয়ে ভারতবর্ষকে যারা নিজ মাতৃ ভূমিবলে গ্রহণ করবে না, তাদের এদেশে কোন স্থানই থাকতে পারবে না। এইনীতি শুধু দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেই চলবেনা, একে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে।

কাশ্মীর পুনর্বাসন বিল পাশ করা নিয়ে যে-মানসিকতার প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে। তার সঙ্গে আপোষ থাকতে পারে না। এটা সত্যিই দুর্বোধ্য যে অন্যান্য শতশত অঙ্গ রাজ্য ভারতভুক্ত হয়েছে। সেখানেও কোন সমস্যা নেই। তবে ৩৭০ ধারামতে কাশ্মীরকে বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে কেন? কেন এই অনৈক্যের বীজ নিহিত রাখা হয়েছে ভারত-কাশ্মীর সম্পর্কের মধ্যে? এটা ত সাম্রাজ্যবাদীদের কুটকৌশল। ভারত কেন তার সামিল হবে?

বর্তমান অবাঞ্ছিত অবস্থাটা বিশ্লেষণ করলে মনে হবে যে ওখানকার একদল লোকেরা চায়। স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত স্বাধীন কাশ্মীর রাজ্য। এটাও চলতি কথায় যাকে বলে "মামা বাড়ীর" আবদার। ভারতের অন্য রাজ্য থেকে কোন লোক কাশ্মীর রাজ্যে অধিবাসী হতে পারবে না। ওখানকার সরকারের অনুমতি ব্যতীত। অথচ দীর্ঘ ২৫ বছর আগে যারা স্বেচ্ছায় কাশ্মীর ছেড়ে যেয়ে পাকিস্তানী নাগরিকতা গ্রহণ করেছে, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য এই নির্লজ্জ দরদ, এই অশোভন আগ্রহ কেন? এটাকে সাম্প্রদায়িকতাবাদ এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনষ্টকারী চক্রান্ত বললে একটুও ভুল বলা হবে কি?

মনের গভীরে যে দুষ্ট মানসিকতা অহরহ তুষের আগুণের মত ধিকিধিকি করে জ্বলছে। তাকে চিরদিনের মত নির্বাপিত করে দিতে হবে। কাশ্মীর এই প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান না করলে, কাশ্মীরের ও জম্মুতে

ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের অবস্থাটা কি হবে? কি হবে এর প্রতিক্রিয়া ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের সংখ্যা-পরিষ্ঠদের মনের উপর, সেটা কর্তৃপক্ষ যেন মুহূর্তের জন্য ভুলে না যান।

ব্যাপারটি ভারতের সর্বোচ্চন্যায়ালয়ে উঠেছে। ডাঃ আবদুল্লা বলেছেন এই আদালতের রায় তারা মেনে নেবেন। কিন্তু আদালত ত রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে বিচার করবেন না। এই বিল গ্রহণ করাটা ভারতের সংবিধান বিরোধী কিনা, সে সম্বন্ধেই তাদের মতামত দেবেন। তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেওয়া যায় যে অতীত ভুলনীতির ফলে একাজ কাশ্মীর বিধান সভা করতে পারে, তবে কি হবে? আদালতের রায়ের জন্য ত রাজনৈতিক মূল্যায়নটা স্থগিত রাখা যায় না। প্রয়োজন হলে, সে ক্ষেত্রে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। লোকসভায় সবদলই জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সমর্থন করবেন বলে প্রশংসনীয় মতদান করেছেন। সব দায়দায়িত্ব এখন সরকারী প্রশাসকদলের। তাদের সাহস, আদর্শনিষ্ঠা, দেশে সর্বাঙ্গীন মঙ্গলসাধনের সঙ্কল্পকে সুদৃঢ় করে তুলতে হবে। কোন দ্বিধা, কোন সঙ্কোচ, দলীয় সমর্থনলাভ না করার আশঙ্কা যেন তাদের বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন না করে, এটাই দেশের মানুষ চায়। সহায় তাদের গোটা দেশের মানুষ, "সহায় বজ্রপাণি।"

পরিশেষে একটি বক্তব্য নিবেদন করা প্রয়োজনীয় মনে করি। সংবিধান সংশোধন করার অবস্থাই যদি আসে, তবে এবার তার মধ্যে যেন কোন ফাঁকফোকর না থাকে। ভারতবর্ষের সব প্রদেশবাসীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিতে হবে যে তারা প্রত্যেকেই সর্বপ্রথম ভারতীয়, হিন্দু, মুসলমান, শিক, খৃষ্টান বা অন্য পরিচয় গৌণ। সারা ভারতের জন্য এক নিশান, এক বিধান এক প্রধান—এই ব্যবস্থাই সর্বজনস্বীকৃত এবং সর্বজনমান্য। দেশের মানুষের বিরুদ্ধে কোন প্রদেশবাসী যদি এবং "অনু প্রবেশকারী" বলে বসেন বা আন্দোলন সুরু করেন, তবে সেটা একটি দেশদ্রোহিতার অপরাধ।

●

হিংসা পৃথিবীকে জর্জরিত করিয়াছে। পাশ্চাত্য জাতিদের লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহারা হিংসাচরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে হিংসার চর্চা করিয়া মানুষের লাভ হয় নাই। নূতন পথের সন্ধানে ব্রতী হইয়া ভারতই আজ পৃথিবীকে পথের সন্ধান দেখাইয়া দিক্।

—গান্ধীজী

বামফ্রন্ট সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামী

জনৈক স্বাধীনতা সংগ্রামী

পূর্ব নিবন্ধগুলিতে আমরা পশ্চিমবাংলার বামফ্রন্ট সরকারের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি নজীরহীন মনোভাবের একটা চিত্র তুলে ধরেছি। এরা নিজেরা ত কিছুই করেনি, কেন্দ্রীয় সরকার এদের সম্মানভাতা দেওয়ার জন্য যে নীতি নির্দ্ধারণ করেছেন সেই নীতিকে বানচাল করে দেওয়ার অবস্থাটাকেই চালু রেখেছে। এর মধ্যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই প্রকট হয়ে উঠছে দিনে দিনে। একথা ভুক্তভোগীরা মনে করছেন।

এই রাজ্যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা সম্মানভাতার জন্য যে আবেদন করেছেন, সেই আবেদনপত্রগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য কোন সুব্যবস্থা আজও পর্যন্ত হয়নি। সরকারী ভাতা দিয়ে পি. এস. পি. বোর্ড-এর সভ্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অথচ তাদের "ঠুঁটো জগন্নাথ" করে রাখা হয়েছে। তাদের সামনে আবেদন পত্রগুলি উপস্থাপিত করা হচ্ছে না। যে হারে দরখাস্ত তাদের নিকট দেওয়া হচ্ছে, এরকম শম্বুক গতিতে কাজ করলে, বিংশ শতাব্দী উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। সদস্যরা শতায়ু হোন। দুধে ভাতে থাকুন আপত্তি নেই। কিন্তু ইতিমধ্যে বহু আবেদনকারী ইহলোক ত্যাগ করে পরলোকে গমন করবেন এতে সন্দেহ নেই। সেই যে কোন্ জীবের কথা শুনেছিলাম যে তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু দেখিতে পায় না কর্ণ আছে কিন্তু শুনিতে পায় না এখানকার রাজ্য সরকার ও তাদের মনোনীত সদস্যদের তো দেখছি সেই অবস্থা। অধিকন্তু আরো একটি সত্য প্রতিভাত হচ্ছে যে এদের হৃদয় থাকলেও, মানুষের দুঃখ-কষ্টের কথা অনুভব করছেন না। অবশ্য এই যুগে হার্টের অসুখের বিস্তৃতি ব্যাপক। এদের হার্ট কি ব্লোকেড হয়ে গিয়েছে? তাহলেতো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের দুর্গতি নিরোধ করা সম্ভব হবে না।

কয়েকটি অবস্থা দেখে আমরা অবাক হচ্ছি। প্রথমেই বলতে হয়, আবেদন বিচারকারী সদস্যরা আছেন পূর্ব মেরুতে অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিংসে। তাদের দপ্তরের কাজকর্মে যারা সহায়তা করছেন, তারা অবস্থান করছেন পশ্চিম মেরুতে অর্থাৎ বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রিটে। এই যোগাযোগ শূন্যতা আর কতদিন চলবে? এতদিন বলা হল অফিসঘর খোঁজা হচ্ছে। ঘর যদি বা পাওয়া গেল দীর্ঘদিন পর, এখনও তারা এক দালানে বসতে পারছেন না। কোন জাতিভেদ প্রথার তাগিদে নয়, উপরে ওঠার লিফট্ নেই বলে এই মহামিলন ঘটান যাচ্ছে না বলে বলা হচ্ছে। একটা সরকারী দপ্তরখানায় একটা টেলিফোন পাওয়া যায় না ছয় মাসের মধ্যে, এমন কথা বিশ্বাস করবে কে? ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়, এটাই ত মানুষ জানে। তবে কি ধরে নিতে হবে সদিচ্ছার অভাবই এই অবস্থার মৌল কারণ?

শুনেছিলাম, ওর মধ্যেই অন্ততঃ দৈনিক চল্লিশ খানা আবেদন পত্র বস্তা থেকে খুলে সদস্যদের নিকট পাঠান হবে। এই ব্যবস্থা করা হয়েছিল, যতদূর জানি, গত নভেম্বর মাসে। সেই হিসাবে এতদিন কমপক্ষে তিন হাজার আবেদন পত্র উচ্চতম-স্তরে পৌছন উচিৎ ছিল। কিন্তু কার্যতঃ তিনশত-খানা আবেদনপত্রেরও বন্ধনমুক্তি ঘটেছে কিনা সন্দেহ করবার কারণ আছে।

আর একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি।

বোর্ডের সভায় পৌঁছে দেবার কাজই ও অফিস কর্মীদের তারা দেখছি নিজেরাই খুশীমত চিঠি-পত্র লিখছেন প্রার্থীদের নিকট। এই ক্ষমতা কি তারা অন্যায়ভাবে অধিকার করছেন না এ ক্ষমতা তাদের ডেলিগেট করা হয়েছে? অফিস কর্মীরা এ সম্বন্ধে সব নিয়ম কানুন জানে না। তাই প্রার্থী-দের যদৃচ্ছামত কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন। অপ্রয়োজনীয় ও অসঙ্গত দাবী পূরণের জন্য লিখছেন এমন অনেক ঘটনা আমাদের জানা আছে। উপরের লোক না থাকায়, অফিসে অনুপস্থিতির হার এবং এসেই সই করে অন্যত্র চলে যাওয়ার হারও বেড়ে চলেছে। এ ঘটনা ঘটতে বাধা যখন কোন কাজ ও অকাজের জন্য কোন বাধাবাধকতা ও শাস্তির বিধান নেই। অথচ একদিকে যেমন রাজ্য সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে, অন্যদিকে প্রার্থীদের হয়রানির মাত্রাও বেদনা-জনকভাবে বেড়ে চলেছে। তাজ্জব ব্যাপার এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এ কি তবে সেই বদ্ধমূল বিরূপতার সাক্ষ্য বহন করছে?

আমরা শুনেছি যে বর্তমানে এই বিভাগে যে লোকজন দেওয়া হয়েছে, তা নিয়ে সব দরখাস্ত গুছিয়ে তুলতে প্রায় নয়-দশ বছর সময় লাগবে। তারপর বোর্ডের সভ্যদের পরীক্ষিত হবে, তাদের সাধারণ সভায় অনুমোদনের পরই দরখাস্তগুলির ভাগ্য নিরূপিত হবে। এতে আর কত বছর সময় লাগবে যন্ত্রগণকের সাহায্য ব্যতীত তা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব হবে না।

কর্মচারীদের অসুবিধা দূর করা নিশ্চয়ই করণীয়। সে কাজ করতে দুই তিন ঘন্টার বেশী সময় লাগে না। আর একটি বিষয়ে অবহিত হতে হবে। কর্মচারীদের ছায়াছবির পর্দার মত ঘনঘন রদবদল করা উচিৎ নয়। একজন কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করল অমনি তাকে বদলি করে নতুন লোক নিয়োগ করার একমাত্র অর্থ দাঁড়ায় যে রাজ্যসরকার এ কাজে সু-কৌশলে বাধা সৃষ্টি করবার পরিকল্পনাকে রূপায়িত করছেন।

অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে অনেকেই বয়সের ভারে শ্লথগতিসম্পন্ন হয়ে পড়েছেন। তাদের পক্ষে এই পর্বতপ্রমাণ আবেদনপত্র দ্রুতগতিসম্পন্ন করার জন্য, সদস্য সংখ্যা বাড়ান উচিৎ। এ ব্যাপারে কোন দলগত দৃষ্টিভঙ্গী থাকা উচিৎ নয়। বিভিন্ন দল থেকে লোক নেওয়াই কর্তব্য। এতে আবেদনকারীদের ব্যক্তিগতভাবে জানার সম্ভাবনা বেশী হবে। সত্যমিথ্যা যাচাই করার কাজও সহজ হবে। এ সম্বন্ধে রাজ্য সর-কারের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য আছে। অবশ্য যদি কাজ না করে কাজের ওপে তারা বিঘ্নই সৃষ্টি করতে চান সে কথা আলাদা। এ সম্বন্ধে রাজ্যসরকার থেকে আমরা তাদের মতামত জানাতে দাবী করি।

আরো একটা কথা আমরা শুনে আসছি। বোর্ডের সদস্যরা আবেদনপত্র চেয়েও নাকি পান না। বিভাগীয় কর্মীরা তাদের ইচ্ছানুযায়ী আবেদন পত্র হাজির করেন। ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে একাজ করা না হলে, এই পথে দুর্নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে বাধ্য। এর বেশী এখন কিছু বলতে চাই না।

সর্বোপরি বোর্ডের সদস্যদের নিকট আমাদের একটি শেষ আবেদন আছে। তারা একটু শক্ত হলে, অনেক কাজের সুরাহা হতে পারে। বিভাগে কর্মীর প্রয়োজন হলে পরীক্ষা করে দেখে তারা সরকারকে অনুরোধ করতে পারেন। বিভাগীয় কর্মীরা তাদের কথা না শুনলে পদত্যাগ করতে পারেন। নির্দ্দিষ্ট কাজ করতে না পারলে, সদস্যপদ অলংকৃত করে

বসে থাকলে, লোকেরা একটি অর্থই করবে, যে তারা শুধু দৈনিক ভাতা পাবার জন্যই ওখানে যান। অভিযোগ আরো ব্যাপকতর হতে পারে। কোনটাই তাদের মাক্স-মর্যাদার পক্ষে বাঞ্ছনীয় হবে না। এই অচল অবস্থা দূর করতে শেষ চেষ্টা করুন।

কেন্দ্রীয় সরকারের নিকটও আমাদের বক্তব্য আছে। এই রাজ্যে যদি এই অনিয়ম, অব্যবস্থা, দীর্ঘসূত্রতা চলতেই থাকে, তবে তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এখানকার রাজ্যসরকার, তাদের বিভিন্ন কাজকর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি তারা যথা কর্তব্য পালন করেন নি। এই দুর্দিনে নিজেরা একটি পয়সাও সম্মান ভাতা হিসাবে দেন নি। অথচ অজস্র টাকা খরচ করা হয়েছে দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য। এরা নিজেরাও দেবে না আবার কেন্দ্র দিতে চাইলে, সেই পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। এটা সহ্য করা উচিৎ হবে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সমস্ত পরিস্থিতিটা বিবেচনা করে দেখতে বলি এবং বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করি। অন্যথায় তারা জাতীয় কর্তব্য হিসাবে সম্মান ভাতা দেবার যে ব্যবস্থা করেছেন, এই রাজ্যসরকার সেই নীতি-টাকে ব্যর্থ করে দেবে। একদিন হয়ত এমন প্রচারও চালাবে যে কেন্দ্রের নীতি একটা ধোঁকা মাত্র। বর্তমান সরকারের সদিচ্ছা ও কর্তব্যপরায়ণতার উপর নির্ভর করলে, বহু বৃদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামী অভাব, দারিদ্র্য, রোগভোগের দরুণ মৃত্যুমুখে পতিত হবেন। দরকার হলে এদের দ্বারা আবেদন পত্রগুলি পরীক্ষা করা ও যোগ্য ব্যক্তিকে সম্মান ভাতা দেওয়ার দায়িত্ব পশ্চিমবাংলায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সংস্থার উপর ন্যস্ত করতে হবে। এ ব্যাপারটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন। এতে কেন্দ্রকে একমাত্র মতলববাজ ব্যতীত কেউ দোষারোপ করতে পারবে না।

পাঠকদের প্রতি আবেদন

'বিপ্লবী বাংলা' গত ২৬ বৎসরাধিক কাল ধরে সত্যনিষ্ঠ নিরপেক্ষ সমালোচনা মূলক প্রবন্ধাদির মাধ্যমে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের দেশসেবার আদর্শকে বহন করে নিয়ে চলেছে। এ আমার, আপনার সকলের কাগজ। তাই একে বাঁচানোর দায়িত্বও আমাদের সকলের। অধিকতর সংখ্যায় গ্রাহক ও বিজ্ঞাপন সংগ্রহ ক'রে এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটিকে আরো দীর্ঘদিন আপনাদের সেবা করার সুযোগ দিন।

বিঃ দ্রঃ—শারদীয় পূজা উপলক্ষ্যে আগামী দুই সপ্তাহ বিপ্লবী বাংলা প্রকাশিত হইবেনা। —সঃ বিঃ বাঃ

শিক্ষা পাঠক্রমে ধর্মের স্থান

শ্রীশিক্ষাবিদ

শিক্ষিত আধুনিক তরুণ সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রায়ই অভিযোগ শোনা যায় যে তারা উদ্ধত, উগ্র এবং বড় বেশি আত্মকেন্দ্রিক। অভিযোগ যে একেবারে ভিত্তিহীন একথা বলা চলে না। জন বে-র একটি কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে: "Youngmen think old men fools; Old men know young men to be so." আধুনিক কাল বলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী যুগ ধরা যায়। যুবকদের স্বভাব পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয়ই অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কারণ আছে। আছে পরিবার, পিতা-মাতা, প্রতিবেশী প্রভৃতির আচরণের প্রভাব। তবে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও এই অধঃপতনের জন্য কম দায়ী নয়।

অতীতে শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে ত্রুটি থাকলেও তা এমন নগ্নভাবে অর্থসর্বস্ব ছিল না। বর্তমানে শিক্ষক-গণ ছাত্রদের শিক্ষাদান করেন না, শিক্ষা বেচেন এবং ছাত্ররা নিলাম ডাকার পদ্ধতিতে তা কেনে। সেই কারণে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক দোকানী ও খরিদ্দারের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক তো সুদূরস্থ। কেনা বিদ্যা কাজ হাসিলের অবলম্বন হতে পারে, তাতে জ্ঞানের গভীরতা থাকে না। Humanities পাঠক্রমও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রকৃতি গ্রহণ করছে। আগাগোড়া যেন একটা যান্ত্রিক পদ্ধতি।

শিক্ষকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, তাঁরা সামাজিক পরিবেশ এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার শিকার। যে সমাজে ধর্ম অবহেলিত, পরিবারে পিতার অধিকার প্রায় অস্বীকৃত এবং অর্থই সকল সম্পর্কের একমাত্র চাবিকাঠি সেখানে ভিন্নতর অবস্থা আশা করা যায় না। হারবার্ট স্পেনসার বলেছেন: "Education has for its object the formation of character." আমাদের শিক্ষা-পদ্ধতি কি সেই লক্ষ্য মনে রেখে কাজ করছে? ইংরাজ আমলের শিক্ষানীতি সম্পর্কে শাসক কুলের মনে যে উদ্দেশ্যই থাক, দেশের বরণীয় শিক্ষাবিদগণ তাকে জাতি গঠনের উপযোগী করে গড়ে নিয়েছিলেন। সে কারণে, গোলাম তৈরীর পরিবর্তে তৎকালীন ইংরাজি-প্রধান শিক্ষা খ্যাতিমান দেশ-প্রেমিক, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতির জন্ম দিয়েছিল। ইংরাজি ভাষার জ্ঞান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মনীষার সৃষ্টিগুলিকে ভারতীয়দের দৃষ্টির সামনে তুলে ধরার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। সে-কালের শিক্ষানীতিতে যত দোষই থাক তাতে ছাত্রমনে ধর্মনীতি ও মানবতা-বোধ সঞ্চারের ইঙ্গিত বহন করত এবং ধর্ম-নিরপেক্ষতার ঢাক না পিটিয়েও তা ধর্ম নিরপেক্ষ ছিল।

স্বাধীন ভারতের শিক্ষানীতি অতীতের ভাব-ধারাকে যেমন ধরে রাখতে পারে নি, জাতিগঠন ও জাতীয় সংস্কৃতি রক্ষার উপযোগী নতুন শিক্ষানীতি গড়ে তুলতেও তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। জাতীয় শিক্ষা-নীতি ক্রমাগত পরীক্ষা নিরীক্ষার অস্থির সংকটাবর্তে, নির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ণয়ে অসমর্থ। উচ্চ মহলে চিন্তার জড়তা এর হেতু। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তাতে শিশুমেধ থেকে নরমেধের আয়োজন দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। তরুণদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপনের আগে এ কথাটা বোধহয় ভেবে দেখা সঙ্গত। নতুন কিছু কর—এই মানসিক মত্ততা আমাদের পেয়ে বসেছে।

শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মকে হটিয়ে মনোজগতে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছে সেখানে ধীরে ধীরে স্থান করে নিচ্ছে এক সার্বিক ঐহিক সর্বস্বতা। নদী তীরের বাঁধ ভেঙ্গে গেলে যেভাবে নোনাজল ঢুকে শস্যক্ষেতকে অনুর্বর করে দেয়, সেই ভাবে এই প্রক্রিয়া কাজ করে চলেছে। আমাদের সেকিউলার রাষ্ট্রনীতি যার জন্য মূলতঃ দায়ী। অশুভ ভাবধারার অনুপ্রবেশ সমাজের স্থিতিশীলতাকেও নড়বড়ে করে দিচ্ছে। এ অবস্থা প্রতিরোধ করতে পারে সনাতন ধর্মশিক্ষা। রবীন্দ্রনাথের ছোট একটি কবিতা উল্লেখ করছি।

"রাজা ভাবে নব নব আইনের ছলে
ন্যায় সৃষ্টি করি আমি। ন্যায় ধর্ম বলে—
আমি পুরাতন, মোরে জন্ম কেবা দেয়।
যা নূতন সৃষ্টি সে শুধু অন্যায়।"

অনেকদিন আগের কথা। ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন সভায় 'পৌরহিত্য করতে ডাঃ বিধান রায় বিহারের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডাঃ এম. এস. আনেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ডাঃ আনে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে দৃঢ় জাতীয়তাবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। ডাঃ আনে সমাবর্তন উৎসবে যে ভাষণ দেন তা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি। আলোচ্য বিষয়ের সহিত যা সামঞ্জস্য পূর্ণ। ঘটনাক্রমে ঐ সভায় সেদিন আমি উপস্থিত ছিলাম।

"আমাদের যুবক সম্প্রদায়কে এমনভাবে মানুষ করা হচ্ছে যে তাদের ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন ঈশ্বর-বিদ্বেষ বা ধর্ম-বিদ্বেষভাব পুষ্টিলাভ করছে। শাস্ত্রবিদ্, ভক্ত এবং ধর্মানুশীলনকারীরা আধুনিক যুবকবৃন্দের নিকট হাস্যাস্পদ ব্যক্তি। ভারতের জনসাধারণ স্বভাবতঃ ধর্মভাবাপন্ন এবং জন-সংস্কৃতিতে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ায় আধুনিক ধর্ম-বিদ্বেষী শিক্ষিত সম্প্রদায় তাদের আমল দেয় না। জনসাধারণের প্রতি শিক্ষিত তরুণদের দরদও কম। সেই কারণে শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে সেবা বৃত্তির উন্মেষ ঘটে নি।"

ধর্ম বিষয়ক শিক্ষাদান প্রসঙ্গে ডাঃ আনে বলেন, "বর্তমানে স্কুল ও কলেজ সমূহে যে শিক্ষানীতি প্রচলিত তাতে ধর্মবিষয়ক শিক্ষাদানের কোন ব্যবস্থা নেই।

স্কুল কলেজে ধর্মশিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। সমাজ-জীবনে এর প্রতিক্রিয়া আধুনিক যুব-সমাজের মাঝ দিয়ে নির্মমভাবে আত্মপ্রকাশ করছে। আমি মনে করি, ধর্মশিক্ষা প্রবর্তিত না হলে মানব মনের পূর্ণ বিকাশের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ধর্মশিক্ষার অভাবে সমাজে যুবকদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আত্ম-সংযমের ভীষণ অভাব দেখা দিয়েছে। যে সব ছাত্র ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন থাকে তারা ক্রমশঃ নাস্তিক হয়ে পড়ে। তাদের নিরালম্ব মনে নীতি অথবা ধর্মবোধ কোন প্রভাবই বিস্তার করতে পারে না। তারা যুক্তি-তর্কের ছলনা জালে পড়ে এবং বিপজ্জনক মতবাদের শিকার হয়। আজ শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে যে পবিত্র সম্পর্ক নেই তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার অভাব। বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীরা এই অভাব উপলব্ধি করেছেন এবং বিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার প্রয়োজনের কথা বলেছেন।" (আঃ বাঃ ১৩/১/৫১)

স্বাধীনতালাভের মাত্র তিন বছর মধ্যে ডাঃ আনে এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। এ ধরণের অভিমত আরো বহু মনীষী প্রকাশ করেছেন। কিন্তু যে দুর্বল চিত্ত সরকার সেকিউলারিজম নিয়ে

ভাতিকগ্রস্ত তার পক্ষে উপরোক্ত পরামর্শ কি করে গ্রহণযোগ্য হবে ?

ধর্মনিরপেক্ষ উদাসীন রাষ্ট্রের অবহেলাজনিত ধর্ম-সংস্কৃতি সহজেই তাই মার্কসবাদের আক্রমণের শিকার। শিক্ষা-সংস্কৃতির ঝাঁধ ভাঙ্গতে পশ্চিম বাংলার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট সরকার কাস্তে হাতুড়ি, বেলচা, কোদাল নিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে চলেছেন। ইংরাজি শিক্ষাকে দুর্বল করে এবং সংস্কৃতকে বিদায় দিয়ে, মার্কসবাদী সরকার রাজ্যবাসীকে একদিকে বহির্বিশ্ব, অন্যদিকে জাতীয় উৎসধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চান। যা মার্কসবাদের চাষের জন্য খুবই দরকার।

গান্ধীজী বলেছিলেন : "সমগ্র জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে আমি বুঝিয়াছি যে, যে জীবনবিধাতার নির্দেশে এই বিশ্বসংসার চলিয়াছে, অটল বিশ্বাসে তাঁহাকে আশ্রয় না করিলে পরিপূর্ণভাবে বাঁচা সম্ভব নহে।" (হরিজন। ২৫/৪/৩৬) প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ভিত্তি হল ভক্তিশুদ্ধ চিত্ত, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তিলাভের সোপান।

"If you do not understand Spiritual Life, You remain like an animal. The animals cannot be educated about God, but auman biengs can. Human life is meant for understanding God and loving Him."—Back to God Head. Iskcon.

বর্তমান শিক্ষানীতি দেশকে এমন একটি নৈরাজ্যে এনে ফেলেছে যেখানে অতীত মৃত এবং ভবিষ্যৎ অস্পষ্টতার ধূসর ছায়াবৃত। তাই তরুণদের মনে আত্মগ্লানি জাগে না, মুখে অনুশোচনার ছাপ পড়ে না, এক অতলস্পর্শী অবিশ্বাস তাদের ঘিরে রাখে। বেঁচে থাকার [illegible] তারা প্রতি পলে আত্মহনন করে চলেছে।

অন্যদিকে আছে মার্কসতন্ত্র, সম্মোহনের যাদুমন্ত্র। সেখানে ঈশ্বর হলেন পার্টি। "Whatever the Party holds to be truth is truth It is important to see reality through the eyes of the Party. You have got to re-learn. It needs an act of self-destruction; an effort of the will."—George Orwell. তরুণরা উভয় সঙ্কটের মুখে।

রবীন্দ্রনাথ ১৯৪১ সালের ৭ই মে তাঁর শেষ জন্মতিথি উৎসবে শেষ বাণীতে বলেছিলেন : "সম্ভবত প্রাচ্যদেশে আবার সভ্যতার সূর্যোদয় হবে। সেদিন সকল বাধা অতিক্রম করে পরপদানত মানুষের বিজয়ের পক্ষে এগিয়ে যাবে এবং মানব সভ্যতা প্রথম গৌরব পুনরুদ্ধার করবে।" বর্তমানে আঁধারিমা কি সেই অরুণোদয়ের ছায়াবৃত্ত ? কে বলতে পারে ? অচলায়তনের সেই প্রাণপুরুষের ডাক উপলব্ধি করা হতে পারে না।

দুর্গতির জালে আবদ্ধ তরুণ সমাজ কিন্তু নৈরাশ্যের মধ্যেও জীবনের জয়গান করে চলেছে। দুঃখকে করেছে সহায় এবং সঙ্কটকে করেছে সাহস। বাসে ট্রামে ট্রেনে নিত্যকার নরক যন্ত্রণা অগ্রাহ্য করে অফিস কিংবা কলেজ যাতায়াতকারী যুবকদের দেখলে মনে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জাগে। মুখগুলি সজীব চিন্তাশীল ও কাব্যময় লাগে। চাকুরে হোক অথবা বেকার হোক, সকলকেই ভদ্র ও সহানুভূতিশীল বলে মনে হয়। দুজনের সীটে বসে, দাঁড়িয়ে এবং ঝুলে ঝুলে চলার সময়ও কদাচিৎ মানসিক ভারসাম্য

(এর পর ১৪ পৃঃ দেখুন)

সংবাদ বিচিত্রা

ধনঞ্জয় বৈরাগী

॥ বেকার বাড়ছে, উৎপাদন কমছে,
ট্রেড ইউনিয়ন জন্মাচ্ছে নব নব ॥

গত পাঁচ বছরে রাজ্যের তালিকাভুক্ত বেকার সংখ্যা ডবলের বেশি হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ছিল ১৪লক্ষ ৩হাজার, ১৯৮০তে বেড়ে দাঁড়ায় ২৬লক্ষ ১৪হাজারে। ১৯৮১ সালে হয়েছে ২৯লক্ষ ৭৫হাজার। তালিকাভুক্ত বাদ বেকার সংখ্যা অনুমান নির্ভর।

রাজ্যে কলকারখানা বাড়ছে না, চাকরি হচ্ছে না। শিল্পে ও কৃষিতে উৎপাদন মার খাচ্ছে। উন্নয়ণ খাতের টাকা অনুৎপাদন খাতের বাড়তি ব্যয় মিটাতে চলে যাওয়ায় সরকারের পক্ষে নতুন শিল্পোদ্যম সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যুৎ সংকট ও প্রতিকূল শ্রমিক-মালিক পরিবেশ রাজ্যে বে-সরকারী বড় বিনিয়োগের প্রতিবন্ধক হয়েছে।

কিন্তু ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ১৯৭৭ সালে নতুন ট্রেড ইউনিয়নের রেজেষ্ট্রি সংখ্যা ছিল ৪৩৮, সদস্য সংখ্যা ৫০,১৫৪। ১৯৮১ সালে নতুন ইউনিয়ন রেজেষ্ট্রি হয়েছে ৬৯৪, সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬৯,৯৯৬। শ্রমিক দপ্তরের মতে, ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে পুনরায় শরিকি লড়াই শুরু হয়েছে। ট্রেড চুলোয় যাক ইউনিয়ন থাকলেই হল। জয় পার্টির জয়।

রাজ্যের নতুন বাজেটে কর ধার্য হয়েছে নতুন করে পচিশ কোটি টাকার। তবুও ঘাটতি বাজেট। কিন্তু মড়ার ওপর খাড়ার ঘা পড়েছে ডিজেল ও বিদ্যুতের ওপর কর বৃদ্ধিতে। এর ফলে শিল্প ও কৃষি পক্ষের উৎপাদন ব্যয় বাড়বে, বাস ও লরী চালানোর খরচ বেড়ে যাবে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও খাদ্য বস্তু দূর্মূল্য হবে। মজার বিষয়, ডিজেলের মত পেট্রোলের ওপর বর্দ্ধিত কর বসে নি। পেট্রলের দাম বাড়লে মোটর বিলাসী ভি. আই, পি-দের অসন্তোষের কারণ হবে বলে কি? ধন্য তুমি হে জনগণদরদী বাম। তোমার মহিমা বুঝিতে নারি।

॥ আসাম অহম-সাম্রাজ্য লয় / ভারতের অঙ্গ রাজ্য / জেনো মহাশয় ॥

অনসমীয়ার নেতৃত্বে বিদেশী বাহাই-এর উদ্দেশ্যে ট্রাইবুনাল গঠিত হচ্ছে বলে জানা গেল। ২৭ শে সেপটেম্বর থেকে ফের বৈঠক বসেছে। এই যেন শেষ বৈঠক হয়। ভূত ফুকনদের বড় বেশি বড় করে তোলা হয়েছে বার বার বৈঠকে ডেকে এনে। এক নজরে আসামকে এই ফাঁকে একবার দেখে নিন। তাহলে বুঝবেন বাঙ্গালী উদ্বাস্তুরা সমস্যার জন্য কতটুকু দায়ি।

ক) জন সংখ্যা : আসাম রাজ্য ১,৪৬,২৫,১৫৮
(১৯৭১—এর সেনসাস)
আয়তন : ৭৮৫২৩ বর্গ কি: মি:
জন বসতির হার : প্রতি বর্গ কি: মি:—১৫০
প্রধান ভাষা : অসমীয়া ও বাংলা।

খ) হিন্দু : ৭৬ শতাংশ / মুসলমান ২৪ শতাংশ

গ) মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধির হার :—
১৯১১ — ৩,৫৫,৩২০ (সিলেট সহ)
১৯৪১ — ১৩,০৫,৯০২ (ঐ)
১৯৭১ — ৩৫,১০,০২৪ (সিলেট বাদে)

(ঘ) পূর্ব পাকিস্থান আগত উদ্বাস্তু :—
১৯৫১ — ৮,০১,২২৭

১৯৬১ কমে হয় ৭,৪০,৭৫০ (কিছু উদ্বাস্তু পূর্ব পাকিস্থানে ফিরে যাওয়ায় সংখ্যা কমে)

১৯৭১ বেড়ে হয় ৯,০৩৪১৯

[সরবরাহ ও পুনর্বাসন বিভাগের উপমন্ত্রী কর্তৃক ১৮/১১/৮০ তারিখে লোক সভায় প্রদত্ত তথ্য]

৬) আসাম আন্দোলন শুরু থেকে ১৯৮০ সালের ১১ই জুন পর্যন্ত নিঃখোজ : ৪১০ জন (এদের অধিকাংশই বাঙ্গালী)

আহত : ২০০০

গৃহহারা : ২০,০০০ এর অধিক

খুন : (হিসাব নাই) (আঃ বাঃ পঃ ১২ ৬ ৮০)

।। যুদ্ধ নয়, শান্তি, ধ্বংস নয়, সৃষ্টি,
ছয় নয়ে ঘটাই ভ্রান্তি ।।

গত ২৩ শে সেপটেম্বর মিছিল নগরী কলিকাতা দেখল এক ভিন্ন স্বাদের মিছিল নাটক। দুপুর থেকে সন্ধ্যা অবধি নগর-জীবন অচল হল। চলল বামফ্রন্টের শান্তি মিছিল। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসু যখন শ্বেত পারাবত উড়িয়ে দিয়ে মিছিলের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করলেন, তখন কি বলব হৃদয় আমার ময়ূরের মত পেখম মেলে নাচতে লাগল! সাবাস অভিনয়!

যাদের কথা হল—

'War is peace, Freedom is slavery, Ignorance is strength; Thought-Police is the sole guardian of truth and sanity in a world of lies.'

তাদের মুখে শান্তির বাণী! বাহবা বাহবা। গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছা হল—এমন দিন কি হবে মা তারা...।

বেচারা মার্কিন প্রেসিডেন্ট রেগন, শান্তির সমাবেশে তুমি হলে লাল জমানার 'যত দোষ নন্দ ঘোষ'। অথচ বুভুক্ষুকে তুমিই কর অন্নদান, লালদাদাদেরও করনা বঞ্চিত নিত্যকার আকিঞ্চনে। গালমন্দ উৎসনায় হওনা বিরূপ।

জনমন নিয়ে খেলা হল রাজনীতিকের শিল্পকলা। ভোলামন ভোলানাথদের কত ভাল রঙিন খেলনা দিয়ে ভোলানো যায় তাই তো তার কৃতিত্বের রূপরেখা। এই হারজিতের খেলা চলেছে চিরকাল।

সম্প্রতি বামফ্রন্টের মন্ত্রী, নেতা ও আশ্রিতজনের বিরুদ্ধে যে সব গুরুতর দুর্নীতি ও সম্পদমজুদ সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে তাকে বিধান সভায় ভোটের জোরে পরাস্ত করা গেলেও, অশান্ত ক্যাডার ও সমর্থকদের মনের সভা থেকে দূর করা যাচ্ছে না। তাই দরকার নব নব বিচিত্র খেলনা প্রদর্শনী, মনোমুগ্ধকর অভিনয়, চিত্তহারী শ্লোগান রচনা—উদ্দেশ্য মনকে ভাবান্তরে পাঠানো। শান্তি মিছিল তারই একটি প্রয়াস।

● ● ●

।। যতই জোরে হানো কুঠার / খোঁতা মুখ
ভোঁতা হবে / শিকড় তবু নড়বে না ।।

নয়া কালাপাহাড় বা রামকৃষ্ণমিশান পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে আদাজল খেয়ে লেগেছে। রহড়া, পুরুলিয়া, নরেন্দ্রপুর, জয়রামবাটি, একটির পর একটিতে তারা হামলা চালিয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুল ও কলেজগুলি চালান ত্যাগব্রতী জনসেবক জ্ঞানী ও বিদ্বান সন্ন্যাসীগণ। সেবাব্রতই যাঁদের জীবনের ধর্ম। দেশের মানুষ তাঁদের চেনেন, ভক্তি করেন, সম্মান দেন।

ভারতীয় ধর্ম-সংস্কৃতি ও শিক্ষার সনাতন আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশনের বিদ্যাভবনগুলির প্রকৃতিতে প্রাণবন্ত। যার প্রতিষ্ঠা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা ভারত-প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। এক কথায় বলা যায়, এই বিবেকানন্দকে বাঙ্গালীর জীবন ভাবনা থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত হল মিশনের শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানগুলি আক্রমণের কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতীয় সংস্কৃতি-শিক্ষার জীবন্ত প্রতীক। তাঁকে হটাতে না পারলে ইহুদী শোনিত উদ্গত হিংসাশ্রয়ী মার্কসবাদকে ভালভাবে দেশের বুকের ওপর বসানো সম্ভব হচ্ছে না। তাই না?

আরে আরে নয়া কালাপাহাড়, জেনে রাখ, আটশো বছরের মুসলমান ও খ্রীষ্টান রাজত্ব বহু চেষ্টা করেও যার ভিত নড়াতে পারে নি, তুই তাকে উপড়ে ফেলবি এটাই তোর অভিলাষ। হবে না, হবে না, যাহা কভু নহে ঘটিবার।

● ● ●

॥ বাংলাদেশের মুক্তির লাগি যাঁহারা করিল রণ
মৃত্যু-দুয়ারে দাঁড়ায়ে তাঁহারা পল গুণে অনুক্ষণ ॥

মুক্তিযোদ্ধা বিশ্বজিৎ নন্দী (২৯) এখন চাকা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসির দিন গুনছেন। ভারতের অনুরোধে বিশ্বজিতের ফাঁসি স্থগিত আছে কিন্তু তাঁর মাথার ওপর থেকে ঘাতকের খড়্গ এখনো সরে নি। ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি বিশ্বজিতের মুক্তির আবেদন জানিয়েছেন বাংলাদেশের মুখ্য সামরিক প্রশাসক লেঃ জেঃ এরশাদের কাছে। কলিকাতায় বাংলাদেশের দূতাবাসের সামনে বিশ্বজিতের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা রহিতের জন্য সকল রাজনৈতিক দল একতাবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন এবং একটি স্মারকলিপিতে তাদের অনুরোধ সরকারের উদ্দেশ্যে পেশ করেছেন দূতাবাসের অধিকর্তার হাতে।

১৯৭৫ সাল থেকে নানা ছল-চক্রান্তের গোপন হস্ত একটির পর একটি মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করে চলেছে। মুজিবপন্থীদের নির্মূল করাই যার লক্ষ্য। বিশ্বজিৎ মুজিবপন্থী বাঘা সিদ্দিকির ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও নির্ভীক দেশপ্রেমিক।

● ● ●

॥ 'তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না' ॥

আসাম: ত্রিপক্ষ বৈঠক ফের ব্যর্থ (আঃ বাঃ ২।১০।৮২)। ১৯৬১—৭১ সালের মধ্যে যারা আসামে এসেছে তাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। অর্থাৎ ১৯৭১ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম আছে এবং যারা ১৯৭২ এবং ১৯৭৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিয়েছে এমন কয়েক লক্ষ পূর্ব পাকিস্থান আগত আসামবাসীদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নিয়ে ভারতের অন্য রাজ্যে চালান দিতে হবে—এই দাবি থেকে আসাম আন্দোলনকারীরা এক চুলও নড়তে রাজি না হওয়ায় কার্যতঃ আলোচনা ভেঙ্গে গেছে। সংবিধান, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি—এর কিছুই মানতে আন্দোলনকারীরা সম্মত নয়। এই একগুঁয়েমী হল আসাম সংকট ও সমস্যার মূল কারণ। মোটামুটিভাবে বলা যায়, সমস্যা যেমন ছিল তেমনি আছে। আলোচনা মুখ খোলে, মন খোলে না।

বার বার ঠেলেও যদি দুয়ার না খুলে, তাহলে শপথের প্রয়োজনে দুয়ার তো ভাঙ্গতেই হবে।

সরকার কবে সেই কাজে হাত দেবেন দেশবাসী তাই জানতে চায়।

॥ "বদনা-গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি, রোলে উঠিল 'হা হন্ত'"—নজরুল ॥

মীরাটে ফের হিংসার আগুন জ্বলে উঠেছে। চলেছে হাঙ্গামা দমনে পুলিশের গুলী। মরেছেন তেইশ জন হানাহানিতে ১৯ জন শান্তিরক্ষীর গুলীতে চার জন। উদ্ভূত নিসারি গেট এলাকায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য কারফিউ বলবৎ হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ৬৭০ জন (সংবাদ ৩১।৩।৮২)। হাঙ্গামার সূত্রপাত মন্দিরের এক পুরোহিতের হত্যাকে কেন্দ্র করে। মন্দিরটি প্রাচীন কিন্তু তার কাছে নাকি একটি মাজার আছে। জায়গাটির ওপর অধিকার দাবী করেন উভয় সম্প্রদায় এবং তাই নিয়ে মন কষাকষি চলছে দলের উভয় মধ্যে অনেক দিন ধরে। ধর্ম অন্তরে নেই, আছে ক্ষমতার কোন্দলে। যাকে কবি বলেছেন বদনা গাড়ুর ঠোকাঠুকি।

মজার কথা, হাঙ্গামাকারীদের যত না আক্রোশ পরস্পরের প্রতি তার চেয়ে বেশী ক্রোধ পুলিসের ওপর। পুলিস কর্মীদের মধ্যে আহত হয়েছেন ২১ জন। এ থেকে অনুমান করা যায়, রাজা সরকারকে অপদস্থ করার গোপন চক্রান্ত আছে টিকি-দাড়ির এই হানাহানির পিছনে। এর নাম বিরোধী রাজনীতি। বহুগুণা রাজপেরীরা হাঙ্গামা থেকে ফয়দা লুটতে অকুস্থলে হাজির।

॥ ভাইরে দেশের উল্টে গেছে হাওয়া, বামুন হতে চাই না মাগো চাঁড়াল করে বাঁচা ॥

তপশীলী বলে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে চাকরি লাভ তথা ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও ভারত সরকারকে প্রতারণা করার অপরাধে আই. এ. এস অফিসার এস. কে. দত্তের দু বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অভিযোগ, এই মিথ্যা পরিচয়ে তিনি ১৯৬৮ সালে সেন্ট্রাল সিভিল সার্ভিসে এবং দুবছর পরে ইণ্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসে চাকরি জোটান। (আঃ বাঃ ২।১০।৮২)

শ্রীদত্ত সার্ভিস কমিশনের বিচারে এবং চাকরিগত কর্তব্য পালনে যোগ্যতার পরিচয় দিলেও, জন্ম পরিচয়ে শুধু অযোগ্য নয়, অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন। জন্ম যে তাঁর 'সেই ধন্য নরকুলে। লোকে যারে নাহি ভুলে। মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্বজন।' (দত্তকুল কবি মধুসূদন)

একে কি বলবেন অদৃষ্টের পরিহাস, না কে-আইনী আইনের নাগপাশ। তপশীলী হিন্দুদের জন্য চাকরি সংরক্ষণ প্রথা চালু করে ইংরাজ সরকার। উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের প্রতি বিদ্রোহভাবাপন্ন বর্ণ হিন্দুদের ভাগে মেরে জব্দ করা। স্বাধীন ভারত অনেক ইংরাজ শাসনের কুব্যবস্থা হুবহু মেনে নেবার সঙ্গে চাকরি সংরক্ষণ প্রথাও মেনে নেয়। এ প্রথা অবৈজ্ঞানিক এবং অর্থনৈতিক বিচারে অসার্থক। সমাজের দুর্বল মানুষের উন্নতি ঘটানোর পরিবর্তে, প্রথাটি জন্ম পরিচয়ভিত্তিক নতুন একটি শ্রেণী স্বার্থ গড়ে তুলেছে। প্রথাটির বয়স অর্ধ শতাব্দী অতিক্রান্ত এবং প্রয়োজন কালোত্তীর্ণ। অতএব....।

বাংলার স্মৃতিকার রঘুনন্দনের মতে গৌড়বঙ্গে কতিপয় উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছাড়া সকলেই শূদ্র।

সে হিসাবে শ্রীদত্তও শূদ্র। তপশীলী তালিকা সম্পূর্ণ ও বিতর্কমুক্ত নয়। সুতরাং দত্তের তপশীলী তালিকায় শূদ্রের নাম লেখানোর অধিকার থাকবে না কেন? লঘু পাপে কিংবা বিনা পাপে যেন গুরুদণ্ড না হয় তা দেখা সকলেরই উচিত। তপশীলী তালিকার যুক্তিযুক্ততা নিয়ে সুপ্রীম কোর্টে একটা মোকর্দমা উঠলে কেমন হয়

• • •

।। শিক্ষা তরণী ঘূর্ণাবর্তে না জানে মাঝি তীর।
বেতাল হাঁড়ি, বিহ্বল যাত্রী ভয়ে কেঁপে অস্থির ।।

বামফ্রন্টে রাজ্যের শিক্ষানীতি সম্পর্কে শরিকদের কণ্ঠে ভিন্ন সুর বেজে উঠেছে। শিক্ষকদের মনেও জেগেছে সন্দেহ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছেন, এ আমরা কোথায় চলেছি। সমস্ত মনীষী এবং অভিজ্ঞ প্রবীণ শিক্ষাবিদদের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে মার্কসবাদীরা যে শিক্ষানীতি প্রবর্তনে অগ্রসর, তার পিছনে না আছে জনসমর্থন, না শিক্ষক অভিভাবকদের সম্মতি। বিদ্যাবত্তার অভিজ্ঞান পত্র দলগত মতবাদের পরিচয় বহন করতে পারে কিন্তু তার দ্বারা বাঙ্গালীর পক্ষে সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় হটে আসা ছাড়া যে উপায়ন্তর থাকবে না সে কথা কি কর্তারা ভেবে দেখেছেন? অবশ্য নেতা-উপনেতাদের সন্তান পড়ে ইংলিশ মিডিয়াম দামী নামী স্কুলে যায় বিলাতে, আর রামা শ্যামার ছেলেরা যাবে আসবে পাবলিক স্কি স্কুলে, শিখবে ভাল স্লোগান লিখতে। কারণ—Ignorance is strength. চালাকি সবাই বুঝে ফেলেছে!

মহাজন যে পথে যান হীনজন তাই অনুসরণ করে। তাই ব্যাঙের ছাতার মত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গজিয়ে উঠেছে সর্বত্র। শহর ছেড়ে গ্রামেও তার গতি ক্রমবর্দ্ধমান। পারুন না পারুন সকল অভিভাবকই চান তাদের সন্তানদের ভাল ইংরাজি স্কুলে পড়াতে। কেন এমন হল? রাজ্য জুড়ে চলেছে এই শিক্ষানীতির অন্তর্দ্বন্দ্ব। শিক্ষাকে মতবাদ বিশেষে দীক্ষাদানের বাহন করার চক্রান্ত এদেশে সফল হবে না। ঘূর্ণাবর্তে নৌকাডুবি সার হবে।

●

(১ম পৃঃ পর)

ছাড়াতে দেখি। বরং প্রতিকারহীন সনাতন অব্যবস্থার মধ্যেও তারা যতটা সম্ভব শিশু, নারী ও বৃদ্ধ সহযাত্রীদের সম্পর্কে মানবতার পরিচয় দিতে ভুলে না। পঞ্চাশ বছর আগে জীবন সংগ্রামের এমন কঠিন অবস্থার কথা ভাবাই যেত না।

বস্তুবাদ যত শক্তি বিস্তারই করুক, ভারতীয় মনের দীর্ঘসাধনালব্ধ মানবতাবাদকে ধ্বংস করতে পারবে না। গান্ধীজীর একটি কথা দিয়ে বক্তব্য শেষ করছি। দেশের ভবিষ্যৎ সংস্কৃতি ও শিক্ষানীতি সম্পর্কে গান্ধীজী বলেছেন: "আমার গৃহের চারিদিকে প্রাচীর দিয়ে ঘিরে, সকল বাতায়ন বন্ধ করতে চাই না। আমি চাই আমার গৃহে সকল দেশের সংস্কৃতির হাওয়া অবাধে চলাচল করুক। তাই বলে বাইরের ঝড়ে আমার গৃহ উড়িয়ে নেবে তা কামনা করি না।" —শিক্ষা ব্যবস্থার ধর্মমূলক পাঠকে হটিয়ে দিয়ে আমরা কি গৃহকে বাইরের ঝড়ের মুখে ঠেলে দিচ্ছি না?

॥ গ্রন্থ বার্তা ॥

ক্রুশবিদ্ধ পোলাণ্ড
রুচিরা প্রকাশন, ৫০ সন্তোষপুর এভিনিউ,
কলিকাতা-৭০০০৭৫
মূল্য পাঁচ টাকা

"পোলাণ্ড তোমার মৃত্যু নেই যতদিন আমরা বেঁচে আছি.... ।"

এ হল পোলাণ্ডের জাতীয় সঙ্গীত, বিখ্যাত পোল মাজুরকা সুরে গীত। পোলাণ্ড ইউরোপের দেশ, পূর্ব ও পশ্চিম অংশের যোগসূত্র। ভূমি আয়তন ৩১২,৬৭৭ বর্গ কিলোমিটার, লোক সংখ্যা ৩ কোটি ২৬ লক্ষ। ১৯৮০ সাল থেকে মানবিক অধিকার ও স্বরাজ্যের দাবিতে পোলাণ্ডে যে সংগ্রাম চলেছে সেখানকার কমিউনিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে, তার ওপর চারটি প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র সম্বলিত গ্রন্থ 'ক্রুশবিদ্ধ পোলাণ্ড' হল আলোচনার বিষয় বস্তু।

চিঠিপত্রের মধ্যে প্রধান হল সুকুমার বসু তাঁর মামা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে পোলাণ্ডের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে যে পত্রখানি লিখেছিলেন সেই চিঠিটি। বই-এর ভূমিকাও লিখেছেন ডঃ চন্দ্র। সুকুমার বসু কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পঞ্চাশের দশকে পোলাণ্ড যান চাকরি নিয়ে এবং দশ বছরের অধিককাল সেখানে বাস করেন। তার আগে দুবার তিনি কমিউনিস্ট দেশে Conducted tour করেন। শ্রীবসু এখন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের শ্রমজীবী মানুষের স্বর্গ সম্পর্কে মোহমুক্ত। দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে লেখা তাঁর পত্রখানি যেমন তথ্যসমৃদ্ধ, তেমনি পরিচ্ছন্ন চিন্তার স্বাক্ষরবাহী।

'Conducted tour' - এর যাত্রী হয়ে কমিউনিস্ট দেশ দেখা এবং কমিউনিস্ট দেশে বাস করে দেশ দেখার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। কমিউনিস্ট দেশে স্বাধীনভাবে কোন বিদেশী পর্যটকের পক্ষে স্বতন্ত্র ভ্রমণ যে সম্ভব নয় সে কথা সকলেই জানেন। বলা বাহুল্য, আমাদের দেশের সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, রাজনীতিক প্রভৃতি কমিউনিস্ট দেশ দেখে এসে যে সব রঙীন গালগল্প করেন তাঁদের প্রায় সকলেই 'Conducted tour'-এর বরযাত্রী। অনেকেই যান নিমন্ত্রিত অতিথিরূপে এবং দেখে 'সাজানো বাগান'। সুকুমার বাবুর পত্র তার ব্যতিক্রম।

'ক্রুশবিদ্ধ পোলাণ্ড' ৯৬ পৃষ্ঠার ছোট বই, দাম ও কম, কিন্তু তাই বলে তথ্য পরিবেশনে ছোট নয়। সোমদেব শর্মা, অর্ণব গুহ, রাখাল দত্ত এবং নির্মল মুখোপাধ্যায়ের চারটি মূল্যবান প্রবন্ধ পোলাণ্ড সংকট সম্পর্কে একটি নির্ভুল ধারণা সৃষ্টির সহায়ক। সেই সঙ্গে প্রবন্ধগুলি ভ্রান্ত অর্থ ও সমাজনীতির মুখোশও খুলে দেয়।

কমিউনিস্ট রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ঐতিহাসিক টয়েনবি বলেছেন 'Garrison State', পোল কবি মিলোজ বলেছেন তাকে এক নয়া সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা যেখানে চলেছে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে আত্মবাতি ও আত্মপ্রবঞ্চক ভেড়ির ভয়াবহ প্রয়াস। সলঝেনিৎসিন বলেছেন, কমিউনিস্ট ব্যবস্থা মিথ্যা ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। আমরা বলি তাকে মানবতাহীন নিষ্ঠুর প্রবঞ্চনা। আলোচ্য গ্রন্থে তারই স্বরূপ উদ্ঘাটিত। বইটি নিঃসন্দেহে সময়োপযোগী। বই-এর ভাষা স্পষ্ট, চিন্তা গতিময় এবং বর্ণনা অতিশয়োক্তি বর্জিত। ছাপাও ভাল। আমরা বইখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

গ্রন্থ সমালোচক / বিপ্লবী বাংলা।

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

AUGUST—1982

Dist—CALCUTTA

Adhikari (Kumari) Annapurna, D/o. L Charu Ch., 3, Rabindranagar, 60
Bagchi Manindranath, 31, Lower Range, 19
Bhattacharji Nirode Kr. 21E, Gobinda Ghosal Le. 25
Chakladar Sukhamoy 8, Sasan Kalilota. 8
Chakraborty Sudhir 26/D, Radhamadhab D. G. Le., 10
Das Smt Manjuri, w/o L. Kalipada Das. 12
Dutta Bhupesh Govt. Housing Estate, 10
Dutta Sasadhar 83/1/1, Russa Rd. 33
Ghosh Sukumar 47, Lake Plac. 29
Gope Smt. Makhanbala, w/o L. Haridas Gope, 3, N. C. Mitra Rd. Dum Dum Cant. 28
Mullick Sakripada 45, Beniatola Le, 9
Mitra Smt. Makhanbala, w/o L. Ajit Kr. Mitra. 47
Roy Saroj Bhusan 11, Lansdowne Place, Flat-8, 29
Sen Gupta Smt. w/o L. Rabindranath, 47

Dist—24 Parganas

Basu Smt Santarani w/o L. Santi kr. Basu
Mukherji Smt. Soyarani w/o L. Narendramohan,
Paik Saroj Kr. Kakdip

Dist—Nadia

Chakraborty Smt. Gita, w/o L. Jatindra Ch. - 9, S. Ramprasad Sen Rd. Krishnanagar
Ghosh Smt. Mira, w/o L. Pratapkr. Chakdah
Sen Nirmal Kr. 14/438, Kalyani
Bandopadhyay Smt. Renuka, w/o L. Amal Sashi, Beldanga, Murshidabad
Banerji Jiban Krishna 22/1, Tantipara Le, Dist—Howrah
Bhattacharji Gopal Krishna 7, Dwarik Jungle Rd. Bhadrakali Dist—Hooghly
Santra Kumari Swapna, D/o L. Kanakbala, Autpara Jaragram, Dist—Burdwan

Dist—Midnapore

Chakraborty Anukul Bachudoba, Jhargram
Dey Smt. Binapani (Maity Dutta) Mirjanagar, Duan, Debra
Dey Kumari Minakhi
Kumari Mrikalini, D/o L. Kshitish Ch. Chaknarsingh
Ghosh Smt. Khudanbala, w/o L. Haripada Midnapore
Sahoo Smt Sabitri, w/o L. Ganesh Ch. ,,
Singha Haripada Tilda, Midnapore

Dist—Purulia

Mahato Smt Puti, w/o L. Dhanabjoy, Jahanabad Barabazar Hinzla
Mahato Smt Shantibala, w/o L. Sagar Ch. Sindri, Patepur
Roy Smt Dineswari, w/o L. Kantanarayan Roy Jalpaiguri
Basu Roy Smt Renu w/o L. Satish. Cooch Behar Dist—Cooch Behar

(সম্পাদক -)

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চাটার্জী

শ্রীকামাক্ষ্যা রায়

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক—

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেল ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০·০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—০·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। পৌরাণী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১·২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১·০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৮০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৪০ ১২। বিশ্বের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। জেল থাকের ডায়েরি (১)—১·০০, ১৪। জেল থাকের ডায়েরি (২)—২·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪·০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বঙ্কিম ঘোষ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈশলক্ষ্মী—১/১/১/A বঙ্কিম চাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

Regd No. R N. 24511/71
DAVP—Regd
বার্ষিক :—সডাক ১৮.০০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
বাণ্মাষিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—৩০ পয়সা

CALCUTTA MUNICIPAL CORPORATION

সওয়া সের গমের পাকচক্র

প্রেসক্রিপশনের নম্বর 'সওয়া সের গমের' মালিক পঞ্চম মধ্যযুগের জনৈক একজন পুরোহিতের কাছ থেকে সওয়া সের নম্বর বার নিয়েছিল। প্রতি ছ'মাস অন্তর ওজন কাঁটার সময়ে পুরোহিতকে একটু বাড়তি দম দিতে দেখে তার মেজাজ হিসাব ছেড়ে না। পুরোহিত ভীষণ মহাজন হয়ে গেছে এবং মানা পাকেটেরে সওয়া সের গমের দাম চক্রবৃদ্ধি হারে এখন দাঁড়ায় ৬০ টাকা। তবুও পঞ্চমের নিস্তার নেই কারণ তাঁতিদের পঞ্চমের কাছে ৯২০ টাকা জমার বোঝা চেপেছে। সারা জীবন পুরোহিতের খোলাখি ক'রেও পঞ্চম কাপড় কেনা নিয়েই মারা যায়। (প্রেসক্রিপশন কমপ্লিমেন্ট, এটা সত্য ঘটনা)।

- এইসব মুর্তাদাদের মুক্তির জন্য ১৯৭৬ সালে আইন করা হয়। মহাজনদের হাত থেকে এই সাধারণ মানুষদের নিষ্কৃতি পাওয়াটাই শেষ কথা নয়। ওদের জন্য নতুন কর্মসংস্থান তো ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১৯৮০-৮১ সালে ১ লক্ষ ২২ হাজার সাধারণ মানুষদের মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার জনকে নতুন কাজ দেওয়া হয়েছে।
- এরাই সঙ্গে সঙ্গে জন্য যারা বেকার তাদের জন্য সংগঠন, মূলধন, যন্ত্রের চাহিদা মেটানো শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি চালু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ৮ম পরিকল্পনায় এইসব লোকেদের কার্যে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে।
- প্রেসক্রিপশনের ভূমিহীন কৃষকদের কার্যে ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই ন্যূনতম মজুরী প্রদান বাড়াতেই থাকবে।

বিনা বিজ্ঞাপনে জন্য নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন :

নাম _____
ঠিকানা _____
_____ PIN _____

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

আর্থিক সমতা আনার যে স্বপ্ন তা পূরণ করতে হলে সবদিক থেকে দারিদ্রের ওপর আঘাত হানতে হবে

davp 82/283

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ২৬শে কার্তিক ১৩৮৯ ১৩ই নভেম্বর ১৯৮২	৭ম সংখ্যা

জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন,
শিয়রে শমন, ভয় কি তোমারে সাজে ?
দুঃখভার, এ ভব ঈশ্বর,
মন্দির তাঁহার প্রেতভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার,
সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা
চূর্ণ হোক স্বার্থ মোর মন,
সুখের শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা । —বিবেকানন্দ

সম্পাদকীয়

দিন ভয়ঙ্কর

পশ্চিম বাংলায় দুর্গাপূজা যথারীতি আনন্দ ও সমারোহের মধ্যে নির্বিঘ্নে শেষ হয়েছে। এই উৎসবটি বাঙালী জাতির নিকট একান্ত প্রাণবন্ত উৎসব। সারা বছর অভাব অভিযোগ, দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হলেও, এই উপলক্ষে সব কিছু ভুলে মেরে বাঙালীর জীবনে একটা আনন্দস্রোত বইয়ে দেয়। অবশ্য এ সত্যও অনস্বীকার্য যে সার্বজনীন পূজোগুলি যাদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাদের মধ্যে দেবীপূজার মানসিকতার অভাব দিন দিন বেড়েই চলেছে। চাঁদার জুলুমে জনসাধারণ বিপন্ন হয়ে পড়ে, এমনকি খুনখারাপিও হয়, যার ফলে মানুষ আজ চাইছে যে এই রকম পূজার আয়োজন যত কম হয়, ততই মঙ্গল। রামায়ণে, পুরাণে কথিত আছে যে অশুভ শক্তিকে বিনষ্ট করে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠাকল্পেই এই দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। সে উদ্দেশ্যে মজাকরটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়, তা বোধহয় আঙুলে গণনা করেই শেষ করা যায়। এ পর্যন্ত যে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতি প্রকাশ পেত, সেটা নিতান্তই পূজার উদ্যোক্তাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত। এবার কিন্তু তার পরিধি বিস্তৃত হয়েছে অন্যান্য ক্ষেত্রেও যার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ। যে সব অবাঞ্ছিত ঘটনা অবাধে ঘটে চলেছে, তার দ্বারা বাঙ্গালী জাতির ঐতিহ্য, বাঙ্গালার কৃষ্টি, মানব কল্যাণে বাঙ্গালার দীর্ঘদিনের সাধনা বিনষ্ট হতে চলেছে। এর বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার নাহলে, বাঙ্গালীর মুখ কলঙ্ক কালিমায় লিপ্ত হয়ে পড়বে, এ সত্য সব সন্দেহের অতীত।

সব থেকে মারাত্মক দিক্ হচ্ছে, এই সব অপকর্মকে একটা রাজনৈতিক রূপ দিচ্ছে এরাজ্যের প্রশাসকদলগুলির সংখ্যা গরিষ্ঠ দল। আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে, এক কথায়, একে একটা নৈরাজ্যের পরিস্থিতি বললেও অত্যুক্তি হবেনা। যাদের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ভার, বিগত কয়েকদিনের মধ্যে যে দুটি প্রধান ঘটনা ঘটেছে, এখন তাদের উপর দলীয় ক্যাডাররা আক্রমণ সুরু করেছে। এর ফলে তিলজলা থানার ও. সি. গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য নিহত হয়েছেন, চাঁদা আদায়ের জুলুম বন্ধ করতে যেয়ে এই শোচনীয় ঘটনার মাত্র পাঁচদিনের মধ্যেই, বিষ্ণুপুর থানার ও. সি. অসীম ব্যানার্জি ও তার সঙ্গী কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে নিদারুণভাবে প্রহার করা হয়েছে। অসীমবাবুর অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। এ পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের প্রতিবেদকদের অভিমত হল, এসব কাজ করেছে এবং করছে, সি. পি. আই (এম) দলের লোকেরা। তারা সদম্ভে ঘোষণা করছে যে এটা তাদের জমানা। তাদের নির্দ্দেশ না মানলে বদলী বা গঙ্গাধর বাবু হতে হবে। এই অমার্জনীয় আস্পর্দ্ধা তারা কোথা থেকে পাচ্ছে, পরবর্ত্তি ঘটনাগুলি সমীক্ষা করলে তার জবাব মিলবে। এরা পুলিশের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে, অরাজকতার রাজত্ব চালাতেই বদ্ধপরিকর। নিছক সমাজবিরোধীদের কাজ বলে একে হাল্কা করে দেখলে চলবেনা। এই সমাজবিরোধীরা যে বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের

আশ্রয় ও প্রশ্রয়পুষ্ট, সে সম্বন্ধে জনগণের কোন সন্দেহ আছে বলে মনে হয় না। দীর্ঘদিন ধরেই এরাজ্যে খুনখারাপি চোখ উপড়ে ফেলার মত জঘন্য নারকীয় ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সব থেকে আশ্চর্য্যের কথা যে তাদের প্রাপ্য কোন শাস্তিবিধান না করে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার মানসিকতা দিবালোকের মত স্বচ্ছ ও পরিস্ফুট হয়ে উঠছে। সব থেকে জঘন্য অপরাধ হল মেয়েদের উপর নির্য্যাতন করা। গণধর্ষণ চলেছে অবাধে, তার কোন প্রতিবিধান নেই, নেই এই মানবদেহধারী পশুদের কোন সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা। কুচবিহার হাঁসপাতালের বর্ণালী দত্তের হত্যার কোন কিনারা আজো হয়নি। কোনদিন হবে কিনা তাও জানা যায়না। এসবই চলছে রাজনীতির অঙ্গ হিসাবে, এই ধারণা আজ বদ্ধমূল হয়ে উঠছে এই হতভাগ্য রাজ্যের অধিবাসীদের মনে।

কথায় বলে যে সর্ষে দিয়ে ভূত ছাড়াতে হবে, সেই সর্ষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে, তবে প্রতিকার পাবার কোন আশা থাকেনা। তিলজলার ঘটনা সম্বন্ধে এই রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তথা মুখ্যমন্ত্রীর, বিবৃতিটী চরম দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অমানবতার স্বাক্ষর বহন করছে বললে ভুল হবে কি? তিনি এক কথায় সব হজম করতে চাইছেন। "তিলজলা হাঙ্গামায় এফ, আই, আর-এর অংশবিশেষ বাদ দিয়ে বদল করা হয়েছে বলে প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত কোন কোন মহল থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে। ওই থানার কয়েকজন কনস্টেবলের মাধ্যমে দরখাস্ত করা এফ, আই, আর এ সি. পি, আই (এম) এর যাদবপুরের নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় ও তার এক সহচর অসিত দাসের উল্লেখ ছিল। রাজ্য পুলিশের ডিরেক্টর জেনারেল গোলক মজুমদার, ২৪ পরগণার জেলাশাসক শ্রীমতী বাণু ঘোষ এবং পুলিশ সুপার এইচ, সুফী ওই রিপোর্ট দেখেছেন। অনেক উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার তখন বলেছিলেন কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ না করলে তাকে দোষী বলে ঘোষণা করে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার ৪ ১১. ৮২)। অথচ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবাবু বলছেন যে কান্তিবাবুকে কোন সময়েই সন্দেহ করা হয়নি। তিনি পলাতকও নন্। পরম ঔদার্য্য ভরে তিনি সাংবাদিকদের ভরসা দিয়েছেন যে তারা চাইলে তিনি কান্তিবাবুকে তাদের সামনে উপস্থিত করতে পারেন। প্রকৃত ঘটনার তদন্তে কান্তিবাবু দোষী সাব্যস্ত নাও হতে পারেন। কিন্তু এতবড় ঘটনা ঘটার পর সব কিছু না জেনেই, সিকিম থেকে উড়ে এসেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কান্তিবাবুকে বেকসুর খালাস দিলেন কোন যুক্তিতে? কান্তিবাবু তাদের দলভুক্ত বলে যেকোন অপরাধই তিনি করতে পারেন, এই ধারণা মানুষের মনে জেগে উঠলে কি অযৌক্তিক হবে? সি, পি, আই (এম) দলের ভাবমূর্ত্তি নষ্ট করলে কি তাদের ধরাপৃষ্ঠ থেকে মুছে ফেলা হবে? এই জঙ্গলের নীতিই কি অনুসরণ করা হবে এই রাজ্যে? এই প্রশ্নের জবাব দাবী করে জনসাধারণ। উচ্চতমস্তরে যদি সব দোষ ধামাচাপা দেওয়া হয়, তবে প্রশাসনিক তদন্তের উপর ভরসা করবে কে?

একটা মৌল প্রশ্ন আজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে এবং তার জবাব দেওয়ার সময় প্রায় অতিক্রান্ত হতে চলেছে। ভদ্র, নিরীহ সাধারণ মানুষের ধন, মান, জীবন নিয়ে আর কতদিন চলবে এই নারকীয় খেলা? প্রকৃতির নিয়ম হল, প্রত্যেক ক্রিয়ার একটা বিপরীত ও সমান প্রতিক্রিয়া ঘটে থাকে। আজ

যারা তথাকথিত বর্বর আইনের আশ্রয়ে এই সব দানবীয় অপকর্ম করে চলেছে, এবং সব জেনেশুনেও যারা তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে, তাদেরও জবাবদিহি করতেই হবে একদিন। শেষের সে দিন হবে ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার্থে কিছু বক্তব্য রাখা প্রয়োজন মনে করি। পশ্চিম বাংলা ত ভারত রাষ্ট্রেরই একটা অঙ্গ। এখানে পাশবিক কাজকর্ম চলতে থাকলে, তার কোন প্রতিবিধান কি কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারেন না? সংবিধানগত অধিকার তাদের নিশ্চয়ই আছে। তারা আর কত কাল এই অমানবীয় পরিস্থিতির নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন? যথাবিহিত না করলে তাদের উপর সমগ্র দেশের মানুষের আস্থা থাকবে কি করে? বিচ্ছিন্নতাকামী, সংহতি-বিনষ্টকারী, দেশদ্রোহী শক্তিও সারা দেশেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সময়ে দমন না করলে, এই সমস্যা আরো ঘনীভূত হবে। তখন কিন্তু অনেক দেরী হয়ে যাবে। পাঞ্জাবে, আসামে, কাশ্মীরে, একই রকমফের হলেও, নরহত্যা, সম্পত্তিনাশ ঘটছে। সর্বোপরি, দানবীয় শক্তিকে অঙ্কুরে বিনাশ না করা হলে, তার দুঃসাহস বেড়েই চলে, তার কুপ্রভাব বিস্তৃত পরিধিলাভও করে। এই রাজ্যের যা অবস্থা, তাতে প্রমাণিত হয় যে এখানকার প্রশাসক দলগুলির পক্ষে পরিস্থিতিকে আয়ত্তের মধ্যে রাখা সম্ভব হবেনা। সে ক্ষেত্রে একটি সংবিধান সম্মত রাষ্ট্রযন্ত্রের অপব্যবহারের মারফৎ দেশের মানুষ নরঘাতকদের হাতে জীবন বিসর্জন দিতে বাধ্য হবেন? এর কোন প্রতিকার না হলে দেশের মধ্যে অরাজকতার পথই প্রশস্ত হবে।

এখানকার মানুষেরও কর্তব্য আছে। তারা বিনাপ্রতিবাদে আর কতদিন গুণ্ডামির শিকার হবেন? শুধু প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করতেও সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। একথা অজানা নয় যে এই ধর্মযুদ্ধে আত্মাহুতি দিতে হবে কাউকে কাউকে। কিন্তু বাঁচতে হলে, কয়েকজনের মরতেই হবে।

দেশের প্রশাসক দল যখন ব্যর্থ হয়, তখন বিরোধী দলের কর্তব্যও বহুল পরিমাণে বেড়ে যায়। নিছক দলবাজী না করে আর্ত জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান তাদের পবিত্র কর্তব্য। সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ করে আকাশ বাতাস কম্পিত করে সিংহনাদ করতে হবে এই বলে, যা চলছে, তা চলবেনা, তা চলতে দেওয়া যায় না।

বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগের লাল বাড়িতে বসে বা আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের সুরমা সুরক্ষিত হর্ম্যতলে বসে যারা ভাবছেন যে বিধান সভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তারা রেহাই পাবেন, তারা বিচার মূঢ়। "কংস কারায়, কংস হন্তা জন্মিছে প্রতিনিয়ত" কবি নজরুলের এই আপ্তবাক্য স্মরণে রাখাটা সুবুদ্ধির পরিচায়ক হবে।

গ্রামবাংলায় তাণ্ডবে মত্ত সি, পি, এম দল

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম বাংলার মানুষ পরাধীনতার কঠিন নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ট বামফ্রন্ট শাসনের শুরু হতেই। ইদানীং সেই পরাধীনতার জ্বালা চরমে উঠেছে সি, পি এম ক্যাডার ও সমর্থকদের দৌরাত্ম্যে। গ্রামের মানুষের নিজস্ব কোন মতামতের কোন মূল্যই যেন নেই, তারা নিজ নিজ অভিরুচি অনুসারে কোন শুভ বা মঙ্গল কর্ম অনুষ্ঠানেও বাধা পায়, সি পি এম দলের লোকেদের যথেচ্ছাচারের কবলে পড়ে। অতীতের আরাকানি মগেদের দস্যুতা কিংবা বর্গীদের মারাত্মক হাঙ্গামা এই সব ঝুটা বামপন্থী সি পি এম দলের মস্তানদের অত্যাচারের কাছে ম্লান হয়ে গেছে।

বিদেশী ধর্মহীন কৃষ্টিকর ভাবধারার অনুচর ও বিদেশী নয় সংস্কৃতির অনুসরণকারী একদল মানুষ, গ্রাম বাংলার ধর্মপ্রাণ সরল প্রকৃতির মানুষদের পরম্ব অপহরণে প্রলুব্ধ করে তথায় অনর্থক প্রায় প্রতিদিনই অশান্তির আগুন জ্বালাতে ব্যস্ত। পঞ্চায়েতের অধিং কর্তাব্যক্তিরা অধিকাংশই সি পি এম দলের হয় ক্যাডার, আর না হয় হাক নেতা, আর না হয় কট্টর সমর্থক এবং তারাই গ্রামে-গঞ্জে প্রায় দিনই চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, গৃহদাহ, ধর্ষণ প্রভৃতি হীন কর্মে ইন্ধন যোগাচ্ছে ও দুষ্কৃতকারীদের সাহায্য ও সমর্থন করছে, নিজেদের দলবৃদ্ধির আশায়। ফলে গ্রাম বাংলায় জাতীয়তাবাদী ও সি পি এম বিরোধী বা নিরপেক্ষ সৎ-মানুষের দল উৎপীড়িত হচ্ছে পদে পদে। উৎপীড়িত মানুষ প্রতিকারের আশায় থানায় গিয়ে কেবল হয়রাণ হয়, কারণ রাজ্যসরকার পুলিস প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় ও সি পি এম মুখী একতরফা করে রেখেছে সি পি এম দল স্বার্থে। পুলিসের সাধ্য কি যে সি পি এম দলীয় হিংস্র ক্যাডারদের দুষ্কৃতকারী জানা সত্ত্বেও গ্রেপ্তার করে এবং বিচারালয়ে চালান দেয়? সে ক্ষমতা আজ আর পুলিসের হাতে নেই; সি পি এম দলপতি, বিধায়ক ও মন্ত্রীদের আনুকূল্যে। গ্রাম-বাংলা শুধু অরাজক নয় সহস্ররাজক বর্তমানে বামফ্রন্ট সরকারের দুঃশাসনের ফলে। এই অন্যায় ও অব্যবস্থার প্রতিকারের কোনরূপ উপায় প্রায় নেই বললেই সঠিক বলা হয়। যে কেউ প্রতিকারের চেষ্টা করলেই খুন হবে অথবা তার বাড়ীঘর অগ্নিদগ্ধ হবে। কি ভয়ঙ্কর দুর্দশা ও জুলুমের মধ্যে গ্রামের মানুষ দিনাতিপাতে বাধ্য হয় তা প্রত্যক্ষ করলেই হৃদয়ঙ্গম হবে।

ক্রীতদাসের পর্যায়ে নেমে আসতে বাধ্য করেছে গ্রামবাসীদের সি পি এম দলের জুলুমবাজরা, লুঠেরা ও নারীধর্ষণকারীরা। খুন তথায় নিত্যকার ঘটনা কি নিঃস্ব, কি স্বল্পবিত্ত, কি স্বচ্ছল অবস্থার মানুষ কারোরই নিষ্কৃতি নেই উক্ত সি পি এম দলভুক্তদের অত্যাচারের হাত থেকে। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না কখনো, তাই যে কোনও ছল-চুতায় সি পি এম পন্থীরা সারা গ্রামের মানুষকে দাবিয়ে রেখেছে। তাদের তাঁবেদার করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে নানা বিপদে ফেলে। যারা এত অত্যাচার সহ্য করে গ্রামে থাকতে পারছে না ও ভয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে, তাদের পলায়নের পরই সি পি এম দলের লোকেরা প্রকাশ্যে পলাতকদের ভূ-সম্পত্তি, বাড়ীঘর খেত-খামার, আবাদী ফসল সবকিছুই গায়ের জোরে দখল করছে।

যারা উক্ত ভীষণ অত্যাচার, অনাচার ও ব্যভিচার প্রভৃতি বাধ্য হয়ে সহ্য করেও গ্রামে থাকতে বাধ্য হচ্ছে আর্থিক অনটনের জ্বালায় ও নিরুপায়

হবেই, তাদের সি পি এম ক্যাডাররা প্রায় ক্রীত দাসের মত অবস্থায় এনে দিবারাত্র শাসন-করছে, ভয় দেখাচ্ছে ও যা খুসী তাই তাদের দিয়ে যখন তখন কাজ করিয়ে নিচ্ছে বিনা পারিশ্রমিকে। ফলে গ্রামের মানুষ পরাধীনতার জ্বালায় সদাসর্বদা জ্বলছে ও ভাগ্যের দোহাই দিয়ে নিজ নিজ কপালে বার বার করাঘাত করছে, আর মনে মনে বলছে যে সি পি এম নিপাত যাক্ ধ্বংস হোক। স্বাধীন দেশের মানুষ হয়েও ভারতীয় হয়েও, তাদের ঐ লাঞ্ছনা বড়ই মর্মবিদারক নয় কি? কোন যুবতী মেয়ে সি পি এম ক্যাডার দ্বারা ধর্ষিত হয়ে থানায় গেলে পুলিসের কর্তাব্যক্তিরা ডাইরী পর্যন্ত লিপি-বদ্ধ করতে ভয় পায় মন্ত্রীদের উপদেশ স্মরণ করে। পুলিশের মধ্যে আবার কিছু দুষ্ট লোকও আছে যারা নিজেরাও মাঝে মাঝে ধর্ষণের দায়ে ধরা পড়ে এবং সি পি এম দলের লোকেদের সাহায্যে মুক্তি পায় বেকসুর, মন্ত্রীদের দয়ায় বা নেতাদের দয়ায়। উক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত পুলিস কর্মীরা সি পি এম দলের কট্টর সমর্থক হয়ে পড়ে ও পুলিস প্রশাসনে বিশৃঙ্খলা আনতে সচেষ্ট হয় আপন স্বার্থে।

যুক্ত ফ্রন্টের আমলে ও হালে বামফ্রন্টের আমলে পুলিস বিভাগে বহু লোক ভর্তি হয়েছে যারা মূলতঃ সি পি এম সমর্থক এবং তারাই আলাদা পুলিশি সংঘ তৈরী করে পুলিশ বিভাগে একটা দারুণ নীতিহীনতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বিশেষ তৎপর। রাজ্য সরকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদেরই গোপনে মদত দিয়ে সমগ্র পুলিশ প্রশাসনকে বিপথগামী করে দিতে সদা সচেষ্ট। ফলে যে সব সৎ ও প্রকৃত পক্ষে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষায় অগ্রণী পুলিশ অফিসার ও কর্মীরা আছে তাদের কোণঠাসা করে দিতে ও তাদের প্রমোশন বন্ধ করে দিতে রাজ্য সরকার সর্বদা ছল-চুতার আশ্রয় নিচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে, যা এ রাজ্যের পক্ষে চরম ক্ষতিকর ও ভবিষ্যতের পক্ষে উদ্বেগজনক।

বর্গা অপারেশনের ধুয়া ধরে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে গরীব কংগ্রেস পন্থী ও নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের চাষের অল্প খাস জমিও সি পি এম সমর্থকদের দিয়ে গায়ের জোরে দখল করিয়ে নিয়ে পরে সি পি এম দলের লোকদের নামে অন্যায় ভাবে রেকর্ড করিয়ে দিয়ে পূর্বোক্ত ব্যক্তিদের ভূমিহীন কৃষকে পরিণত করা হচ্ছে রাজ্য সরকারের কারসাজিতে। ব্যক্তিরা আদালতে মামলা করে উক্ত জমিতে টন্-জাংশান পেলেও তা পুলিস কার্যকরী করতে ভয় পাচ্ছে। ফলে আদালতের হুকুম জারি হচ্ছে না ও অন্যায়কারীরা অন্যায় ভাবে উক্ত জমি বিনা খরচে ও বিনামূল্যে ভোগদখল করছে প্রকৃত মালিকের নাকের ডগায়, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে। যেন একটা মগের মুল্লুক এরাজ্য, গায়ের জোরে সবার সবকিছু জোর জবরদস্তি করে কেড়ে নিচ্ছে সি পি এম দলভুক্তরা।

তারাই যেন এদেশের রাজা এবং বাকীরা তাদের প্রজা। ভারতের অন্য রাজ্যে সংবিধান বিরোধী এই যে আইনী শাসন ও শোষণ চলছে প্রায় পাঁচ ছয় বছর ধরে প্রতিকারহীন অবস্থায়। এর পরও সি, পি এম দল গলাবাজী করে কোন লজ্জার মাথা খেয়ে তা বোধগম্য নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অবশ্যই দেখা দরকার কেন এই সব অব্যবস্থা ও শাসনের নামে শুধুই শোষণ চলছে? ভারতের জনগণ সংঘবদ্ধ ভাবে যদি না এর প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হয়, তবে গ্রামবাংলা ছারখারে যাবে সি, পি, এম দলের দৌরাত্ম্যে। সি, পি, এম বিরোধীদের সংঘবদ্ধ করার কাজে কংগ্রেস (ই)

দলকেই অগ্রণী হতে হবে। তবেই এর প্রতিকার ও প্রতিরোধ বাস্তবে সম্ভব, অন্যথায় এরাজ্যের গ্রামবাসীরা দারুণ বিপদে পড়ছে ও পড়বে। কংগ্রেস (ই) দলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব ও পরস্পর ভুল বোঝাবুঝির কারণে দরিদ্র গ্রামবাসীদের রক্ষা করার কাজ তাদের দ্বারা বাস্তবায়িত হচ্ছে না এখনো।

বিগত ভোট যুদ্ধে গ্রামের ভোটারগণ স্বইচ্ছায় সি পি এমকে ভোট দেয়নি। সি পি এম কোন কোন এলাকায় খুন-জখমের ভয় দেখিয়ে, আবার কোন কোন এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত গম ও নগদ টাকা ভোটারদের উৎকোচ দিয়ে সেই লোভীদের ভোটগুলি পেয়েছে। কি বিচিত্র ব্যবস্থা বামফ্রন্ট সরকারের তথা সি পি এম মন্ত্রীদের! গ্রাম বাংলার প্রতারিত ও লাঞ্ছিত মানুষ সি পি এমকে প্রায় ক্ষেত্রেই ভোট দেয় না, তবুও ওরা গ্রামে এত বেশী ভোট পায় কি করে? উত্তর খুবই সহজ, জাল ভোট ও রিগিং করে ওরা ক্ষমতায় এসেছে। উক্ত কারণেই দ্বিতীয়বার বাংলার মসনদে বসেই গ্রামের লোকের ওপর ওরা চূড়ান্ত প্রতিশোধ মানসে তাদের সর্ব্বনাশে সদাই উদ্যত দেখা যায়, যা বড়ই দুঃখজনক।

যুক্তফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকার এরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হবার প্রাক্কালে গ্রামবাংলায় মানুষে মানুষে একটা সখ্যতা ছিল, একটা সম্প্রীতি বজায় ছিল। শান্তিপূর্ণ আবহাওয়া তখায় বিরাজমান ছিল এবং পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ছিল তারা সামাজিক, বৈবাহিক, আর্থিক, পরমার্থিক প্রভৃতি সকল বিষয়েই।

ছোটখাট বিবাদ, বিসংবাদ, ভুল বোঝাবুঝি তাদের মধ্যে থাকলেও বা পারস্পরিক বিভিন্ন স্বার্থের সংঘাত তথায় থাকলেও বর্তমানের মত এত অধিকসংখ্যক ও এত ঘন ঘন খুন, ডাকাতি, রাহাজানি খেতের ফসল চুরি, ঘরে অগ্নি প্রদান, বাড়ীঘর চড়াও হয়ে মারপিট, গৃহস্থ বধূ বা কুমারী কন্যাদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ, সম্পত্তি নাশ, ফসলী জমিজমা আত্মস্যাৎ প্রভৃতি মারাত্মক জঘন্য ক্রিয়াকলাপ ইতিপূর্ব্বে পরিলক্ষিত হতো না তথায়। গ্রাম বাংলার শান্তি ও মানুষের পারস্পরিক নিবিড় সম্প্রীতিমূলক আচার আচরণ ইত্যাদি সব কিছু ভাল ব্যবস্থাই আজ শূন্যে বিলীন, বামফ্রন্ট তথা সি পি এম দলের রাজত্বকালে, যা চরম গর্হিত কার্য্য বলে প্রতিটি শিক্ষিত মন ও সুরুচি সম্পন্ন মানুষ নিশ্চয় স্বীকার করে। পশ্চিমবঙ্গের চারিদিকে বর্তমানে যে অশেষ হাহাকার ও দীর্ঘশ্বাস পরিদৃষ্ট হয়, তার মূলে সি পি এম দলের সীমাহীন দলবাজী ও অপশাসন ব্যবস্থা এবং বিরোধীদের সুপরিকল্পিত উপায়ে ধ্বংস করার সর্বপ্রকার ঘৃণ্য আচরণ ও অনুচিত কার্যকলাপ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মানুষের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, শহর ও শহরগুলির পরিবর্তে সি পি এম দল গ্রামেই অত্যাচারের মাত্রা এত অধিক পরিমাণে বাড়িয়ে চলেছে কেন? গত যুক্তফ্রন্টের আমলে উক্ত দলটি শহর, শহরতলি ও গ্রামাঞ্চলে সমান হারে অত্যাচারের, খুন-জখমের ও নারীহরণের বা ধর্ষণের মত নোংরা কাজগুলি চালিয়েছিল, কিন্তু এবারে বামফ্রন্ট-আমলে সেই দলই তুলনামূলক ভাবে দেখি যে, শহরাঞ্চলের চেয়ে গ্রামাঞ্চলেই অত্যধিক মারাত্মক বিধ্বংস অত্যাচার চালাচ্ছে। এর আসল কারণ বেশ স্পষ্ট রূপে ধরা পড়ে সি পি এম দলের কৌশল বদলের চিন্তা ধারা অনুসরণ করলেই। সি পি এম জানে যে শহরাঞ্চলের অধিকাংশ লোকই শিক্ষিত ও

বিক্ষোভ প্রকাশের এবং আন্দোলন গড়ে তোলার কাজে সুদক্ষ। শহরবাসী মানুষ কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় সাহসীও বটে, কৌশলীও তারা, তাই তারা সহজেই সি পি এম দলের বিরুদ্ধে জনমত সংগঠন ও আন্দোলন পরিচালনার নেতৃত্ব গ্রহণ করে সি পি এম দলকে কোনঠাসা করে দিতে সক্ষম। বিগত ১৯৬৯ সালে অত্যাচারী ও খুনে সি পি এম দল যে তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বিভিন্ন শহরাঞ্চলে, তা তারা আজো ভোলেনি। নকসাল কর্মী ও নেতাদের হাতে সি পি এম দল যে ভাবে সে সময়ে পর্যুদস্ত হয়, তাও ভোলার কথা নয়।

সে কারণে এবার ক্ষমতা হাতে পেয়ে খুবই হুঁসিয়ার হয়ে সি, পি, এম শহরাঞ্চলে সীমিত অত্যাচার চালাতেও বেশী বাড়াবাড়ি না করতে তার ক্যাডারদের সাবধান করে দিয়েছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে এইযে, নিরপেক্ষ স্বাধীন মতাবলম্বী সংবাদপত্রগুলিকে সি,পি, এম নেতৃত্ব দারুণ ভয় করে, তাদের বিরাট ও ব্যাপক প্রচার সারাদেশে বিস্তৃত বলেই। বৃহৎ সংবাদপত্র সংস্থাগুলি তবুও সি. পি, এম দলের জন্য অত্যাচারের কাহিনী মাঝে মাঝে ফাঁস করে দেয়। ফলে আনন্দবাজার যুগান্তর, অমৃতবাজার, ষ্টেটসম্যান প্রভৃতি সংবাদ-পত্রগুলি বামফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকারী বিজ্ঞাপন ছাপার ক্ষেত্রে প্রায়ই বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার বলি হয়। আনন্দবাজারের ওপর রাজ্যসরকার ও সি, পি, এম নেতৃত্ব সর্বদাই খড়্গহস্ত যে কেন, তা পশ্চিম বাংলার জাতীয়তাবাদী জনগণ সম্যক অবগত। বাংলার গ্রামে গ্রামে সি, পি, এম দলের লোকেরা প্রতিদিন যে ভীষণ অত্যাচার চালায় তা সবই কিন্তু দৈনিক বৃহৎ সংবাদপত্রেও প্রকাশ পায় না। কারণ গ্রামাঞ্চলে অনুষ্ঠিত চুরি ডাকাতি, রাহাজানি ও ধর্ষণ প্রভৃতি পুলিশীগ্রাহ্য অপরাধ থানার রেকর্ডে লিপিবদ্ধ না হলে সংবাদ পত্রে বা প্রচার করার নিয়মতান্ত্রিক অসুবিধা থাকে, আর সেই জন্যই থানা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঐসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে না সরকারের অলিখিত হুকুম মান্য করার প্রয়োজনে।

কিন্তু চতুর প্রণালীতে বামফ্রন্ট রাজত্ব চালায় তা গ্রামবাসীরা হাড়ে হাড়ে এখন বুঝতে পারছে। এ ছাড়া সি, পি, এম দলের বিকৃত মিথ্যা প্রচার ও মন্ত্রীদের অসত্য ভাষণ এরাজ্যের নিরীহ ও সরল গ্রামবাসীকে এমন ভাবে প্রভাবিত করছে যে, তারা চোখের সামনে যা বাস্তবে ঘটেছে সেই ঘটনা ছাড়া অন্যান্য প্রকৃত ও সত্য ঘটনাও বিশ্বাস করতে পারছে না। এমনই কৌশলী দল সি, পি, এম যে, ঐ দল সদা সর্বদাই মিথ্যা প্রচারে ও মিথ্যা সংবাদ পরিবেশনে সিদ্ধহস্ত। ফলে বহু সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শহুরে ও শিক্ষিত মানুষ কল্পনাই করতে পারে না যে, সি, পি, এম দল অজ্ পাড়াগাঁয়ে কি অদ্ভুত উপায়ে গ্রামা মানুষদের অধিকাংশকেই ঐ দলের আজ্ঞা পালনকারী বিনা বেতনের সর্ব সময়ের ক্রীতদাস করে রেখেছে।

চাষী তার পছন্দমত কোন জমি চাষ করতে পারবে না, তা সে নিজেরই হোক বা অন্যেরই হোক। কোন জমির মালিক সরকারী হুকুম মত বর্দ্ধিত রেটে অর্থাৎ দৈনিক ৮ টাকা ৪০ পয়সা রোজেও তার নিজের পছন্দ মত কোন ক্ষেত মজুরকে দিয়ে নিজ জমি চাষ আবাদ করতে পারবে না। তাকে হুকুম নিতে হবে স্থানীয় সি পি এম দলের ক্যাডারদের কাছে। যদি ক্যাডার হুকুম না দেয়, তবে তার জমি চাষ হীন অবস্থায় পড়ে থাকবে অথবা সি পি এম সমর্থক কেউ না কেউ গায়ের জোরে সেই জমি চাষ করবে ও ফসল পুরাপুরি কেটে নেবে, মালিকের চোখের সামনে। মালিক ঐ সর্বনাশকে নীরবে হজম করবে। প্রতিবাদ করলে মার খাবে, জরিমানা দিতে বাধ্য হবে, অন্যথায় তার ধোপা নাপিত বন্ধ, একঘোরে সে।

খরার শিক্ষায় কি গলদ দূর হবে

গ্রামা পথিক

গত বছর রোগ ও পোকায় ধানের যেমন ক্ষতি হয়েছে এবছরও তেমনি অনুপযুক্ত খরার ফসল নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এটা রুখবার জন্য বামফ্রন্ট সরকার কি করেছেন?

এ বছরের খরা কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। গত জুন মাস থেকেই আবহাওয়াবিদরা জানিয়ে দিয়েছেন এ বছরের বৃষ্টিপাতের ওপর চাষ-আবাদ নির্ভর করা চলবে না। এই সতর্কবাণী শুনেও বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রী, অঞ্চলের পঞ্চায়েত এবং কৃষক সমিতি পরিস্থিতি মোকাবিলার কোন ব্যবস্থা নিয়েছিলেন কি কাজের বদলে খাদ্য কর্মসূচীর একটা লক্ষ্য যেমন ছিল দুর্দিনে গ্রামের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখা তেমনি অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত ছিল এর মাধ্যমে খাল কেটে রাস্তা তৈরী করে গ্রামের কৃষির স্থায়ী উন্নতি করা। বামফ্রন্ট সরকার এই কর্মসূচী বাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা পেয়েছেন পঞ্চায়েত মারফৎ খরচ করে দলের মহিমা প্রচার করেছেন কিন্তু কাজের কাজ করেছেন কতটুকু আজ যদি চুনী, জলঙ্গী, ইছামতি বা সরস্বতী নদীর সঙ্গে যোগ করা কতকগুলি খাল কাটা থাকত তা হলে কয়েকটী জেলার মাঠের ফসল পুড়ে শেষ হয়ে যেত না। গত ছয় বছরে নদী হ'তে জল উত্তোলন প্রকল্প বা নলকূপ বসিয়ে এই রাজ্যে কতটা সেচ এলাকা বাড়ান হয়েছে? যদি বাড়ান হত তা হলে গোটা রাজ্য এভাবে খরার কবলে পড়তো না। বিদ্যুৎ সঙ্কটও সেচ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। আজ খরার মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকার দিল্লির কাছে টাকা চাইছেন কিন্তু সেচ এলাকা বাড়ানর জন্য নির্দিষ্ট প্রকল্প নিয়ে কোন টাকা চেয়েছেন কি?

বামফ্রন্ট সরকার মৌলিক পরিবর্তনের জন্য কোন কাজের ঝুঁকি না নিয়ে শুধু ভাতা ও দান খয়রাতি করে সস্তায় কিস্তিমাৎ করতে সচেষ্ট হয়ে গোটা রাজ্যকে বিপন্ন করেছে। এটা মার্কসবাদ হতে ঘোরতর বিচ্যুতি।

খাদ্যনীতি তৈরী করা থেকে শুরু করে খাদ্য সংগ্রহ ও বণ্টন কোন ব্যাপারেই বামফ্রন্ট সরকার সস্তায় জনপ্রিয়তায় আঘাত লাগতে পারে এমন ব্যবস্থা নেননি। তাই এমন একটা খাদ্যনীতি গ্রহণ করেছেন যাতে দুর্নীতি ও কালবাজারীই বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের ওপর কোন লেভি আরোপ করা হয়নি। ১৯৬৬ সালে জোতদারের ওপর লেভি বসিয়ে সেই লেভি আদায় করে প্রফুল্লচন্দ্র সেন মশাই উৎপন্ন ৫২ লক্ষ টন চালের মধ্যে সাড়ে পাঁচ লক্ষ টন চাল সরকারী ভাণ্ডারে জমা করেছিলেন। এ বছর ও গতবছর বাদ দিয়ে আগের তিন বছরে গড় উৎপাদন ৬০ লক্ষ টনের মধ্যে কোন রকমে এক লক্ষ টন বামফ্রন্ট সরকার আদায় করতে পেরেছেন। জোতদার ও মজুতদারদের গায়ে হাত না দিয়ে চোরাকারবারী ও মজুতদারদের আস্কারা দিয়ে এমন এক খাদ্যনীতি অনুসরণ করলেন যা এই রাজ্যে সর্বনাশ ডেকে এনেছে।

এই রাজ্যের খাদ্যনীতি অনুসারে একমাত্র চালকলের ওপর শতকরা ৪০ ভাগ লেভি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং গত বছর এই লেভি বাবদ মাত্র ৪০ হাজার টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী উৎপাদকদের ধান বিক্রি করতে হলে সরকারি দামে ফুড করপোরেশন বা চালকলগুলিকে বিক্রি করতে হবে অন্যত্র বিক্রি করা চলবে না। গত বছর ধানের সরকারি দাম

ছিল কুইন্টাল প্রতি ১১৫ টাকা এবছর হয়েছে ১২১ টাকা, গত বছর থেকেই ধানের দর খোলা বাজারে ১৫০ টাকা।

সরকারী নিয়মে খোলাবাজারে ধান বিক্রি নিষিদ্ধ হলেও চাল বিক্রি করা নিষিদ্ধ নয়, কাজেই উৎপাদকরা চালকলগুলিকে এড়িয়ে ধান ভাঙ্গিয়ে চাল বিক্রির পথ ধরল। রাজ্য জুড়ে বৈধ ও অবৈধ হাস্কিং মেশিনের ছড়াছড়ি। বৈধ যদি হয় ১৫ হাজার অবৈধ হবে ৪৫ হাজার, কারো কারো মতে এক লক্ষ। হাস্কিং মেশিনে ধান ভাঙ্গিয়ে চাল করে নিলে কোন ঝামেলা নেই, কোন হিসাব দিতে হয় না। বড় ও মাঝারি চাষীরা চালকলের ছায়াও মাড়াল না। হাস্কিং মেশিনে ধান ভাঙ্গিয়ে চাল করে নিয়ে খোলা বাজারে বেশী দামে বিক্রি করে দিল অথবা মজুত করে রাখল আরও বেশী দামের আশায়।

যদি উদ্বৃত্ত জেলাগুলিকে কর্ডন করে রাখা হত পূর্ণ রেশন এলাকায় চাল ঢোকার কঠোর নিয়ন্ত্রণ থাকত, অবৈধ হাস্কিং মেসিনগুলি বন্ধ করে দেওয়া হত তাহলে চালকলগুলিতে ধান বিক্রিতে বাধ্য হত।

চালকল ধান পাচ্ছে না দেখেও এই সমস্ত ব্যবস্থা করার চেষ্টা হল না, এমন কি অবৈধ হাস্কিং মেশিনও বন্ধ হল না।

হাস্কিং মেশিনে গোপনে কাজ করা যায় না মেশিন চললে গ্রাম ফাটান শব্দ হয়, চালাতে বিদ্যুতের সংযোগ লাগে তা সত্বেও বামফ্রন্ট সরকার ও পঞ্চায়েত এতবড় অবৈধ ব্যবসা বন্ধ করতে ব্যর্থ হল অথবা বন্ধ করতে চেষ্টা করলেন না, না করে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেওয়া হল, নিজেদের মার্কসীয় চরিত্র মসীলিপ্ত করল।

বর্ধমান জেলায় সব থেকে বেশী চালকল, প্রায় ১০০ (একশ) নদীয়া জেলায় চালকল নেই, হাস্কিং মেশিনের ওপরই নদীয়া জেলা নির্ভরশীল। এই জেলায় বৈধ হাস্কিং মেশিনের দ্বিগুণ আছে অবৈধ হাস্কিং মেশিন এই ব্যাপারে আলোচনার জন্য ১৯৮১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর সদর এস, ডি, ও (নর্থ) বৈধ হাস্কিং মেশিনের মালিকদের এক সভা ডাকেন, পুলিশ ও খাদ্য বিভাগের অফিসারদরাও উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু নদীয়া জেলায় কোন চালকল নেই সেহেতু হাস্কিং মেশিনের মাধ্যমে কিছু লেভী সংগ্রহ করাই ছিল সভার মূল উদ্দেশ্য। সভার পর এস, ডি ও লিখিত ভাবে বৈধ হাস্কিং মেশিনের মালিকদের জানালেন আপনারা লেভী দিন আমরা সমস্ত অবৈধ হাস্কিং মিল বন্ধ করে দেব। অবৈধ হাস্কিং মেশিনের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং মেশিন আটক করার জন্য নির্দেশও দিলেন, কিন্তু নদীয়া জেলায় একটি অবৈধ হাস্কিং মেশিনও গত এক বছরে আটক হয় নি।

সভায় জনপ্রিয়তা রাখার জন্য, অবৈধ হাস্কিং মেশিন মালিকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে বামফ্রন্ট সরকার রাজি নয়, উৎপাদনের ওপর লেভি বসিয়ে জোতদারদের হটাতে প্রস্তুত নন। এই অবস্থায় যদি সংগ্রহ হয় মাত্র ৪০ হাজার টন চাল সেই ব্যর্থতার দায় থেকে বামফ্রন্ট সরকার রেহাই পেতে পারেন না। কেন্দ্রীয় সরকার লেভি সংগ্রহে ব্যর্থতার জন্য কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে সঙ্গতভাবে।

পঞ্চায়েতের ভূমিকা আরও ভয়াবহ দুর্নীতিতে ভরপুর। বর্ধমান জেলায় ধান কেনার জন্য প্রতিটী পঞ্চায়েতকে এক লক্ষ টাকা নগদ দেওয়া হয়।

কিন্তু কোন ধান পাওয়া যায়নি। টাকার হিসাব দেওয়াও পঞ্চায়েত কর্তব্য বোধ করে নাই। এই পরিস্থিতিতে বামফ্রন্ট সরকারের কৃতকর্মের দুর্ভোগ হতে রাজ্যবাসীর মুক্তি পাওয়ার উপায় কি ?

বাস্তব অবস্থা বুঝে বামফ্রন্টের অন্যতম শরিক সি. পি. আই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে রাজ্যের বর্তমান ভয়াবহ খরা পরিস্থিতিতে শুধু কেন্দ্রের কাছে দাবী আদায়ের আন্দোলনেই ফ্রন্টের দায়িত্ব শেষ হয় না, রাজ্য সরকারকে এখনই খরার মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় সব কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সি. পি. আই ছাড়ের বামফ্রন্টি অন্যান্য শরিকদের মত আগেকার দিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারা এখনও একেবারে হজম করতে পারে নাই। তাই তারা এই সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার মধ্যে মজুতদার ও মুনাফাখোরদের অপচেষ্টা প্রতিরোধ করার কথাও বলেছে। সরকারী বামদলগুলির খাদ্য আন্দোলনের পুরানো উৎসাহ এখন পর্যবসিত হয়েছে একমাত্র দিল্লির বিরুদ্ধে আওয়াজে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেরও খাদ্যনীতিতে বামফ্রন্ট সরকারের মজুতদার ও মুনাফাখোরদের তোষণ করার সর্ববিধ চেষ্টার প্রতিরোধ করার প্রয়াস নেই, কাজেই জনসাধারণ বামফ্রন্ট সরকারের গরিব দরদী বুলির ভাঁওতায় সচেতন হচ্ছে না। মানুষ যেখানে মাটি কামড়ে ফসল বাঁচাবার লড়াইয়ে নেমেছে আগামী রবি ফসলের মুখ চেয়ে, সেখানে ঐ মানুষগুলির পাশে কোথায় সরকারি প্রতিনিধিরা কোথায় শাসকদলের বা অন্যান্য দলের মানুষরা ? অনশনে আমরা কাউকে না খেয়ে মরতে দেব না বিধান সভায় বাতানুকূল কক্ষে বসে এই মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে কি আকালের ভূত তাড়িয়ে দেওয়া যায়।

১৯৭৮ সালের বন্যার সময় গ্রাম থেকে প্রচণ্ড মানুষের অন্নের সন্ধানে শহরে আসার প্রয়োজন হয়নি এই মানুষগুলির কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া গিয়েছিল বলে বামফ্রন্ট সরকার সঙ্গত ভাবেই কৃতিত্ব দাবী করেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার খরার এই সঙ্কট বন্যার সঙ্কটের চেয়ে অনেক গভীরতম। বন্যার জল নেমে গেলেই নতুন করে বাঁচার চেষ্টায় নামা যায়। খরার জের মিটাতে অনেক সময় লাগে। সুতরাং এই সংকটের মোকাবিলা করার চালেঞ্জ অনেক বড় চালেঞ্জ। বামফ্রন্ট সরকারের শাসনে এত বড় চালেঞ্জ আর কখনও আসেনি। চ্যালেঞ্জটা শুধু কিছু মানুষকে লঙ্গর খানার খিচুড়ি খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা নয়, ফসল যতদূর সম্ভব বাঁচানর, আগামী ফসলের জন্য নতুন পরিকল্পনা করার ফসল উৎপাদনের লোকসানের যতটা সম্ভব পূরণ করে নেওয়ার চাষীদের হাতে উৎপাদনের উপকরণ পৌঁছে দিয়ে ফসল উৎপাদনের সাহায্য করার ও যথাসম্ভব কাজের সুযোগ সৃষ্টির একটা সামগ্রিক চ্যালেঞ্জ। শুধু স্লোগান আউড়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে ত্রাণের নামে দলবাজি করে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করা যাবে না। এর জন্য একটা গঠনমূলক উৎপাদনমুখী দৃষ্টিভঙ্গী চাই : যার নজির বামফ্রন্ট সরকারের চরিত্রে বিরল এটাই সব চাইতে বড় আশঙ্কা পশ্চিমবঙ্গবাসীর।

বোরো চাষ কমিয়ে গমের চাষের ওপর বেশী জোর দেওয়ার জন্য চাষীদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে এই গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীর একটা দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কৃষিমন্ত্রী কমলগুহ জানিয়েছেন রবি মরশুমে চাষের লক্ষ্যমাত্রা ২৪ লক্ষ হেক্টার থেকে কমিয়ে অর্দ্ধেক করার সিদ্ধান্ত হয়েছে ডি, ভি, সি,

(এর পর ১৪ পৃঃ দেখুন)

বিচ্ছিন্নতা কি ও কেন

— কালীপদ সরকার

দেশ বলতে কেবলমাত্র একটি সীমাবদ্ধ ভূ-বিভাগ এবং তার ভূ-প্রকৃতিকে বুঝায় না, মনে জাগ্রত হয় সেই ভূ-ভাগের অধিবাসীদের বংশ, ভাষা, আকৃতি, চরিত্র, ধর্মসংস্কৃতি, রাষ্ট্র, সমাজ এবং ঐতিহ্য বিধৃত আত্মিক ভাবমূর্তি। নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে এই ভাবমূর্তি হল ঐক্যের প্রতীক। এই ঐক্যবোধ থেকে সরে গিয়ে স্বাতন্ত্র্য ভাবনার শিকার হওয়ার নাম বিচ্ছিন্নতাবাদ, যা দেশদ্রোহিতার তুল্য। বিচ্ছিন্নতা আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক এবং ঐতিহ্য বিরুদ্ধ মতবাদ ভিত্তিক হতে পারে। বর্তমানে দেশে বিচ্ছিন্নতাবাদের ক্রমবিস্তার লক্ষ্য করলে উপরোক্ত সব কটি অন্তত শক্তিকেই সক্রিয় বলে স্বীকার করতে হয়।

বিচ্ছিন্নতাবাদ মাথা তুলে দাঁড়ায় যখন রাষ্ট্র দুর্বল হয় কিন্তু ভারত রাষ্ট্র দুর্বল নয়। রাষ্ট্র পরিচালনা করেন যে কংগ্রেস সরকার সংসদে তার অনুকূলে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা আছে, বাইরে আছে অকুণ্ঠিত জন সমর্থন এবং সরকার ও কংগ্রেসের নেতৃত্বে আছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যাঁর অভিজ্ঞতা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তা সংশয়াতীত। তাহলে দেশ থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলিকে নির্মূল করতে সরকার এত সন্দেহ দোলায়িত এবং দীর্ঘসূত্রী কেন?

বিখ্যাত রোমান সেনেটর সিসারোর একটি উক্তি মনে পড়ে। "Every evil thing is easily stiffled at its birth; allowed to become old it generally becomes too powerful." —Rise and Fall of the Roman Empire.

একে একে বিচ্ছিন্নতাবাদের ঘাটিকেন্দ্রগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখছি।

॥ আসাম ॥

তিন বছর ধরে আসামে অসমীয়াদের 'বিদেশী বহিষ্কার' আন্দোলন চলছে। আন্দোলন কখনো মারমুখো কখনো ধীরগতি। আন্দোলন আসাম রাজ্য তথা সমগ্র দেশের প্রভূত ক্ষয় ক্ষতি, প্রাণহানি, এবং জাতীয় উৎপাদন হ্রাস ঘটিয়েছে। আন্দোলনকারীরা রাজ্যে একটি রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে, যার ফলে সেখানে ১৯৮০ সালে লোকসভা নির্বাচন এবং ১৯৮১ সালে লোকগণনার মত সংবিধাননির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় নি। আসন্ন বিধান সভার নির্বাচন নিয়েও ভাবনা চিন্তা দেখা দিয়েছে।

আসাম রাজ্য ভেঙে মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় প্রভৃতি পৃথক রাজ্য গড়েও অসমীয়া স্বাতন্ত্র্যবাদকে তুষ্ট করা যায় নি। অসমীয়া আন্দোলনকারীরা 'বিদেশী' আখ্যা দিয়ে যাদের আসাম থেকে বহিষ্কারের দাবি করছে তারা হল পনের থেকে লক্ষ পূর্ব-পাকিস্থান থেকে বিতাড়িত বাঙ্গালী হিন্দু বাস্তুহারা, যারা ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে আসামে এসেছে এবং সরকারী ব্যবস্থা ও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সেখানে পুনর্বাসিত হয়েছে। সংবিধান, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিমূলক সনদের ভিত্তিতে উক্ত উদ্বাস্তুগণ ভারতীয় নাগরিক। তারা ভারতের যে কোন রাজ্যে বসবাসের অধিকারী। তাদের মধ্যে অনেকেই আসাম রাজ্যসরকার প্রণীত ভোটার তালিকাভুক্ত

এবং ইতিমধ্যে এ কা বি ক নির্বাচনে ভোটও দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা এদের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করতে কৃতসংকল্প।

আন্দোলনকারীরা মনে করে এই কয়েক লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তু যারা আসামে একান্তভাবে সংখ্যালঘু, অসমীয়া ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে বিপদ স্বরূপ। তাদের এই আশংকা অমূলক। কারণ বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘু, তাদের মধ্যে অনেকেই অসমীয়া ভাষা শিখে নিয়েছে, ধর্ম-সংস্কৃতিতে উভয়ই অভিন্ন এবং সকলেই আসামের জনজীবন প্রবাহে মিলে যেতে আন্তরিক ভাবে আগ্রহী। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা তাদের দাবিতে অটল, যে দাবি অবৈধ, অযৌক্তিক ও বাস্তবচিন্তাবর্জিত। লক্ষণীয় যে আন্দোলনের পুরোভাগে অসমীয়া নেতারা নেই।

আশ্চর্যের বিষয়, সরকার শক্তহাতে আন্দোলন দমন না করে একদল অপরিণতবুদ্ধি ছাত্র ও যুবা আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক করে চলেছেন এবং তাদের রাজনৈতিক স্বীকৃতি দিচ্ছেন।

আন্দোলনের মূলে যে অহম স্বাতন্ত্র্যবাদের অস্তিত্ব বিদ্যমান তা বিচ্ছিন্নতাবাদের নামান্তর এবং জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, অসমীয়াদের বিশেষ স্বার্থ ( ) রক্ষা করে সংবিধান সংশোধন করে কিছু রক্ষাকবচ দানের ব্যবস্থা করা হবে। আসাম রাজ্যকে আর একবার ভাগ করার কথাও উঠেছে। সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার জন্য রক্ষা-কবচের বিধান বোধগম্য, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের জন্য বিশেষ অধিকারের ব্যবস্থা কি স্বাতন্ত্র্যবাদের পিছনে ইন্ধন জোগানো নয়?

সরকার আগামী মার্চের মধ্যে আসামে বিধান-সভা নির্বাচন করতে চান। তাহলে নির্বাচনের আগে আসামে উপজাতীয় প্রকৃতির বিশেষ অধিকার মঞ্জুরের প্রস্তাব মুলতবী রাখা সমীচীন। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে বোঝা যাবে কত ধানে কত চাল। সরকারের পক্ষে তখন পরবর্তী পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে সহজতর হবে। সম্প্রতি আলোচনা বৈঠকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের যে সরকার সঙ্গে নিয়েছেন, এটি মন্দের ভাল এবং অবশ্যই সুবিবেচনা প্রসূত। কারণ বিষয়টি একটি জাতীয় সমস্যা।

অসমীয়া আন্দোলনকারীরা হুমকি দিয়েছে 'বিদেশী বহিষ্কার' দাবি মেনে না নিলে এবং ভোটার তালিকা থেকে তথাকথিত বিদেশীদের নাম বাদ না দিলে তারা আসামে প্রস্তাবিত বিধান সভা নির্বাচন হতে দেবে না। সরকারের উচিত দৃঢ়তার সহিত এই হুমকি ব্যর্থ করে দেওয়া। বিরোধী দলগুলিরও এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জাতীয় ভূমিকা পালনের দায়িত্ব সরকারের চেয়ে কম নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদের নিকট আত্মসমর্পণ কারো নিকটেই কোনভাবে অভিপ্রেত হতে পারে না।

॥ পানজাব ॥

দেশ বিভাগের ফলে যে দুটি প্রদেশ সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা হল বঙ্গ ও পানজাব। বাঙ্গালী হিন্দু ও শিখদের এই ক্ষতি অপূরণীয়। সামান্য কারণে তাই তাদের মনের সঞ্চিত বারুদ জ্বলে উঠে। কলিকাতা তাই মিছিল নগরী, অমৃতসর মোরচা বিক্ষুব্ধ।

শিখদের মধ্যে আকালিগণ অধিক গোষ্ঠী-সচেতন। ১৯৫৫ সালে মাস্টার তারা সিং-এর নেতৃত্বে আকালিগণ পানজাবী ভাষী সুবা গঠনের দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। অশান্তি ভারাক্রান্ত অসহায় মন অনেক সময়ই শান্তির সঠিক পথ খুঁজে পায় না, অভিযোগ হয় চিরসাথী।

দুর্ভাগ্যকে যত শীঘ্র সম্ভব ভুলে গিয়ে পরিবর্তিত পরিবেশ অনুযায়ী নতুন জীবন গড়াই হল বাঁচার পথ। শিখদের মধ্যে অধিকাংশ এই সত্য অনুধাবন করে দেশে ও দেশের বাইরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আকালি শিখদের একাংশ অভিযোগ-অবিচার নিয়ে ভাবিত থাকে এবং আন্দোলনের মধ্যে আত্ম তৃপ্তির সন্ধান করে।

পানজাবী সুবা গঠন দ্বারা আকালিদের সমস্যা দূর হতে পারে না এবং তা বিচ্ছিন্নতাবাদ ছাড়া আর কিছু নয় সরকার তা উপলব্ধি করেন। সঙ্গত কারণেই সরকার আকালিদের দাবি মেনে নিতে অস্বীকৃত হন। আকালিদের দাবি তীব্র হলে কিন্তু সরকার ১৯৬৬ সালে সেই দাবিই মেনে নিয়ে পানজাব ভাগ করে পানজাবী সুবা গঠন করেন। অপর অংশ হয় হরিয়ানা। পানজাবী সুবা পেয়ে কিন্তু আকালিগণ তৃপ্ত হল না। তারা পুনরায় বৃহত্তর পানজাবী সুবার দাবি নিয়ে আন্দোলন আরম্ভ করল। এই আন্দোলন এখন তুঙ্গে। বৃহত্তর পানজাবী সুবা গঠন করতে হলে পার্বত্য রাজ্যগুলির গায়ে হাত দিতে এবং সুসংহত ভৌগলিক পরিবেশকে বিনষ্ট করতে হয়। কাজটি তাই সহজসাধ্য নয়। অসম্ভব ও অসঙ্গত বলা চলে।

মাস্টার তারা সিং পরলোকে। বর্তমান আকালি আন্দোলনের নেতা হলেন সন্ত হরচাঁদ সিং লাংগোয়াল, শিরোমণি গুরুদ্বার প্রবন্ধক সমিতির সভাপতি সন্ত গুরুচরণ সিং তোহরা, পানজাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ সিং বাদল প্রভৃতি। আকালিদের আন্দোলন আসাম আন্দোলনের মত কখনো হিংসাশ্রয়ী কখনো অহিংস। তবে আকালি আন্দোলনের এখানেই শেষ কথা নয়। আকালিদের উগ্রপন্থী গোষ্ঠী ১৯৮০ সালে পানজাবের আনন্দপুর সাহেবে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে প্রস্তাব গ্রহণ করে, শিখরা একটি স্বতন্ত্র জাতি, তাদের চাই সার্বভৌম পৃথক বাসভূমি এবং পৃথক সংবিধান। এই প্রস্তাব খালিস্থান আন্দোলনের ভিত্তি। খালিস্থান আন্দোলনের নেতা সন্ত জারনেল সিং ভিনদ্রেনওয়ালে তার সশস্ত্র অনুগামীদের সঙ্গে অমৃতসরের শিখ স্বর্ণমন্দিরে অবস্থান করছেন।

বৃহত্তর পানজাবী সুবা আন্দোলন-নেতারা বলেন তাঁরা খালিস্থান দাবি সমর্থন করেন না। তবে সন্ত ভিনদ্রেনওয়ালের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি কিন্তু কিছু কম দেখা যায় না। বৃহত্তর পানজাবী সুবা ও খালিস্থান আন্দোলনের মধ্যে কোন যোগসূত্র নেই এ কথা ভাবা কঠিন। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত সর্দার স্বর্ণ সিং আকালি আন্দোলনের নেতাদের সহিত আপস আলোচনায় নেমেছেন। স্বর্ণসিং ও আকালি শিখ। আপসের সূত্র কি তা এখনো জানা যায় নি। তবে চণ্ডীগড় যে পানজাবের অন্তর্ভুক্ত হবে তা প্রায় নিশ্চিত।

।। জম্মু ও কাশ্মীর ।।

জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ অধিকার ব্যবস্থা রাজ্যটিকেই যে শুধু একটি অবাস্তব বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তায় ঝুলিয়ে রেখেছে তাই নয়, ভারতের অন্যত্রও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সামনে একটি অনিষ্টকর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বিশেষ অধিকার ব্যবস্থার কল্যাণে জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়নি, অথবা বিশেষ অধিকার না থাকলে কাশ্মীর ভারতের হাত ছাড়া হয়ে যেত এমন নয়।

কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তি হয়েছে প্রাক্তন কাশ্মীর মহারাজার বৈধ সিদ্ধান্ত এবং কাশ্মীর অধিবাসীগণ কর্তৃক সেই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করার ফলে। রাজ্য বিধান সভার নির্বাচনে এবং ভারতের লোকসভা নির্বাচনে পরিপূর্ণভাবে অংশ গ্রহণ করে কাশ্মীর বাসীগণ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের ভারতভুক্তিকে বার বার সন্দেহাতীত ভাবে অনুমোদনের প্রমাণ দিয়েছে।

কাশ্মীর প্রশ্ন বলে এখনো যে বাসি কথাটি চালু, তার সঙ্গে কাশ্মীরবাসীদের কোন সম্পর্ক নেই। কাশ্মীর রাজ্যের বৈধ ভারতভুক্তিকে সাময়িক বলে নাকচ করতে গিয়ে পাকিস্থান বিরোধ বাধায় এবং ভারত সুবিচারের আশায় বিষয়টিকে নিরাপত্তা পরিষদে টেনে নিয়ে কাশ্মীর প্রশ্ন সৃষ্টি করে এবং তাকে আন্তর্জাতিক গুরুত্ব দেয়। তারপর সিন্ধু-গঙ্গা দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। কাশ্মীর প্রশ্ন সামনে রেখে পাকিস্থান দুবার দুটি বড় যুদ্ধে ভারতকে শক্তি পরীক্ষার নামতে বাধ্য করেছে। পূর্ব-পাকিস্থান স্বাধীন বাংলাদেশ হয়েছে।

এত সব ঘটনার পর জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিশেষ অধিকার ব্যবস্থা টিকিয়ে রেখে কি একটি অনাবশ্যক জটিলতা জীইয়ে রাখা হয়নি? সম্প্রতি কাশ্মীর পুনর্বাসন আইন নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে তো ঐ বিশেষ অধিকার জাত। বিতর্কের জের শেষ পর্যন্ত কতদূর যাবে কে বলতে পারে!

(ক্রমশ)

(১০ পৃঃ পর)

ময়ূরাক্ষী ও কংশাবতী থেকে সেচের জল পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। কাজেই চাষের পরিমান কমান ছাড়া উপায় নেই কিন্তু দেখতে হবে যাতে যেটুকু জল পাওয়া যায় সেটুকু থেকে যতসম্ভব বেশী জমিতে যাতে ফসল ফলান যায় সেইদিক থেকে গমচাষের ওপর জোর দেওয়া যুক্তিসঙ্গত. কারণ গমচাষে বোরোর তুলনায় অনেক কম জল প্রয়োজন হয়। কিন্তু একজন চাষী বোরো চাষের চেষ্টা না করে গমচাষ করবেন কেন? সে কথাটা কৃষিমন্ত্রী বলেননি। সে ফসলে লাভ বেশী নেই ফসলের দিকে না ঝুঁকে চাষী কেন অন্য ফসল করতে যাবেন।

গমের চাষ পশ্চিমবঙ্গে বছর বছর কমছে, তার প্রধান কারণ হল চাষী গমের ঠিক মত বাজার পায় না, সেই অবস্থা না বদলালে চাষী নিজের সুবিধা দেখতে না পেলে কমলবাবুকে খুশি করার জন্য চাষীরা গম চাষ করবেন না। সেই জন্য এখন থেকেই ঘোষণা করতে হবে গম চাষ করলে কি বিশেষ সুবিধা পাবে। চড়া দামে আমরা বিদেশ থেকে গম আমদানি করতে পারি, চাষীকে আমরা কি ন্যায্য দরের আগাম আশ্বাস দিতে পারি না।

পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে গঠনমূলক উৎপাদন ফসল বাড়াও কর্মনীতি ও মজুতদার ও মুনাফাখোরদের সুযোগ না দেওয়ার খাদ্য নীতি গড়ে তুলতে হবে এটাই বর্তমান আন্দোলনের একমাত্র বিশেষ পথ, পশ্চিমবঙ্গের বাঁচার রাস্তা। ২৩.১০.৮২

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

SEPTEMBER—1982

Dist—CALCUTTA

Banerjee Satchidananda 55/1/A. P. M. R. Road, Calcutta 27
Biswas Smt Sova Rani w o Late Birendra Chandra Rabindra Palli, Nimta, Calcutta 49
Bose Smt Santi w/o Late Dhirendra Nath Bose Calcutta 50
Chakraborty Smt Namita 6A, Bhabanath Sen Street, Calcutta 4
De Smt Binapani w/o Late Saurindra Mohan Calcutta 38
Dutta Amalesh Chandra 14/3 Mahin Halder Street. Calcutta 26
Dutta Smt Nandarani w/o Late Jyotish Chandra Dutta Calcutta 25
Ganguly Smt Indira w/o Late Suresh Chandra Ganguly Calcutta 14
Guha Nalini 9H, Dalimtola Lane, (Restoration) Calcutta 6
Guha Khasnobish Naresh Chandra Calcutta 32
Guha Thakurta Smt Renukona w o Late Monoranjan Guha Thakurta Calcutta 54
Halder Gopal Christopar Road, Calcutta 14
Kar Roy Smt Gayatri w/o Late Surendra Kar Roy 34. Beliaghata Road, Calcutta 10
Majumdar Smt Ranibala w/o Late Ashutosh Majumdar Calcutta
Mukherjee Smt Rashmoni w/o Late Balaram Mukherjee Calcutta 36
Narayan Choudhury Nikhil Chandra Calcutta 84
Pal Motilal Kamalpur East, Dum Dum Calcutta
Roy Smt Sunity w/o Late Benoy

Dist—24 Parganas

Bose Satish Chandra, Authpur, 24-Parganas

Dist—Howrah

Bodhok Smt Nanda Rani w/o Late Dhirendra Bodhok, Khile, Gangadharpur, Howrah
Dhore Rash Behari, Khile Howrah
Hazra Smt Radharani w/o Late Radharaman Hazra, Howrah
Roy Chawdhury Binapani w/o Late Sarat Chandra Roy Chowdhury, Howrah

Dist—Hooghly

Hazra Smt Malina alias Radharani w/o Late Sannyasi. Hooghly

Dist—Burdwan

Ganguly Krishna Prosad P. & T. Colony, Durgapur

Dist - Bankura

Debi Smt Chandi Bala, w/o Late Pulin Behari Chatterjee, Akul, bankura

Dist—Birbhum

Dashi Smt Faringbala w/o Late Bhutnath Das, Birbhum
Singha Smt Umasashi w/o Late Jatindra Nath Singh, Birbhum

Dist—Nadia

Chaki Kumari Kalyani D/o Late Nareshchandra, Nabadwip
Ghosh Smt Sabitri w/o Late Nirmal Kumar Ghosh, Nadia
Misra Smt Kanaklata w/o Late Batakrishna Misra, Nadia
Pramanik Kunah Kuhali D/o Late Smt Renuka

Dist—Midnapore

Smt Nanibala w/o Late Bharat Chandra Bag Midnapore
Bera Smt Astami Midnapore
Bhakta Smt Jabakusum w/o Late Kunja Behari Bhakta Dharyashree
Bhunia Smt Sabitri w/o Late Narendra Nath Bhunia Midnapore
Das Manindra Nath Dumerdari Midnapore
Das Smt Manibala w o Late Debendra Nath Das ,,
Das Smt Mokshada Rani w/o Late Bhuban Mohan Das Midnapore
Dey Ganesh, Beltola, Midnapore
,, Smt Satadalbasini w/o Late Bhuban Mohan Dey Midnapore
Hanra Smt Snehalatata w/o Late Ashutosh Hanra Midnapore
Mahapatra Smt Charubala w o Late ogesh Chandra ,,
Maity Smt Kironbala w/o Late Jagannath Maity, Pachuria Midnapore
,, Smt Kusumbala w/o Late Rakhal Chandra Midnapore
Majhi Smt Jashodarani w/o Late bhupati Majhi Midnapore
Mondol Smt Badal w/o Late Debendra Nath ,,
Pahari Biswanath (Restoration Midnapur
Patra Smt Sabitri w/o Late Harakrishna Patra ,,
Thikulia Kr. Kuila Midnapore

Dist—West Dinajpur

Chatterjee Kumari Santirani d/o Late Nanibala Chatterjee
Fyuzdar Smt Nishibala w/o Late Kasi Pada Mohan Fouzdar, Dakra

Dist—Jalpaiguri

Ghosh Smt Bandita w/o Late Rabi Sankar Ghosh, Jalpaiguri

Dist—Murshidabad

Maitra Smt Sabitri w/o Late Kshitish Chandra, Murshidabad

Dist—Darjeeling

Chakraborty Satyendra Nath, Ashrampara, Siliguri
Chatterjee Ranjit Kumar New Milanpally, Darjeeling

Dist—Cooch Behar

Das Smt Mirarani w/o Late Jitendra Das, Cooch Behar

Regd.No R N.24511/71
DAVP—Regd
বার্ষিক :—মূল্য ১২.০০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
ষাণ্মাসিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77

(সম্পাদক)
শ্রীশশিভূষণ রায়চৌধুরী
।। সম্পাদকমণ্ডলী ।।
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীকল্যাণী রায়
শ্রীমলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক—
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রী

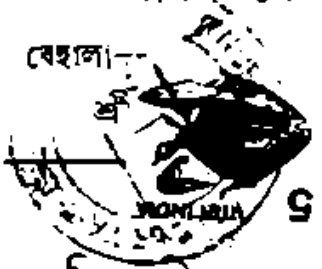

বিপ্লবী বাংলা
পড়ুন
ও
পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.৫০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বোমার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.১৫, ১৩। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বন্ধুর ডায়েরি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯শে এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাজির হত্যা প্রচেষ্টা—.১৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

চৈতালী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

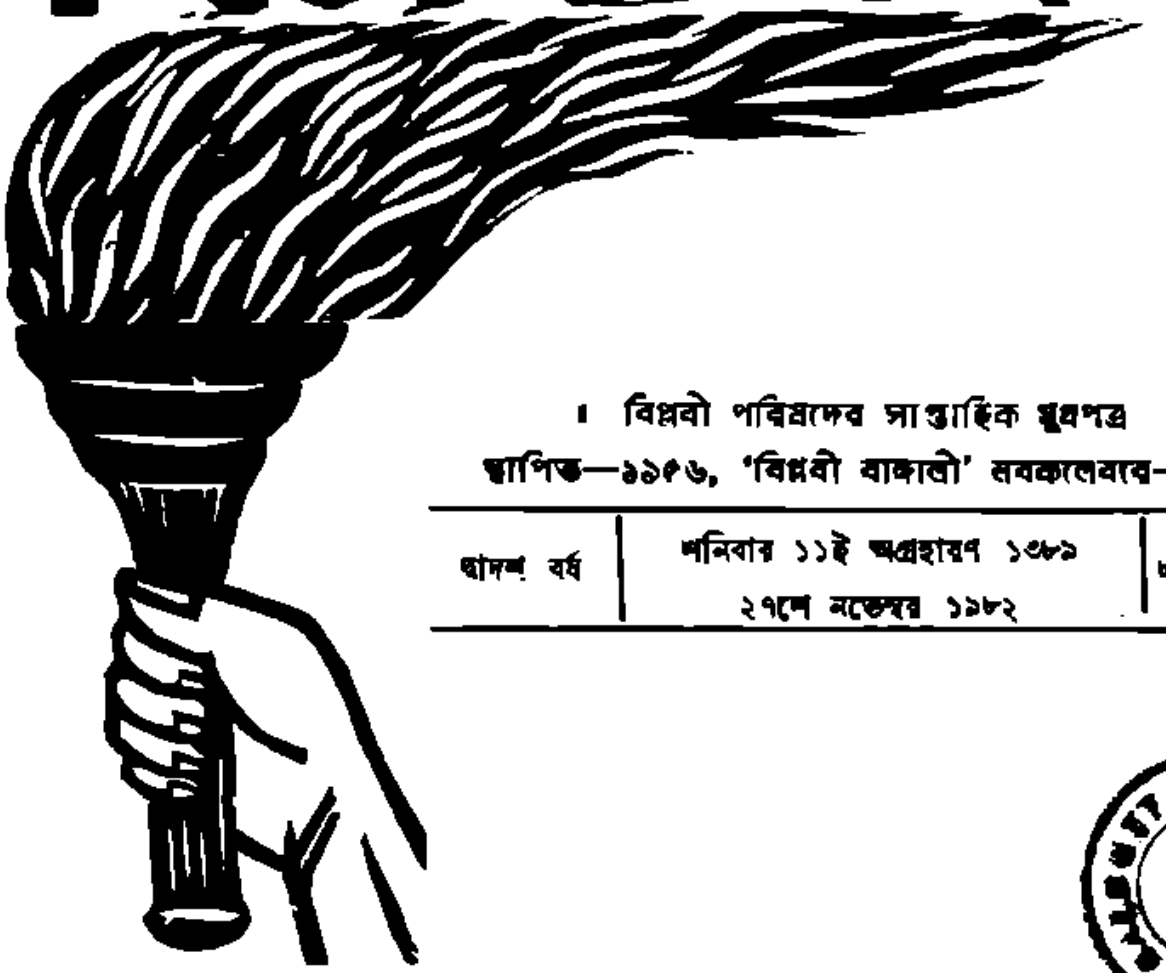

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ২৭শে নভেম্বর ১৯৮২	৮/৯ম সংখ্যা

CALCUTTA BOOK HOUSE

'আমার কামনা তোমাদের মধ্যে কয়েকজন মহান্ হউক,—কিন্তু তোমাদের নিজেদের জন্য নয়, তোমাদের অহংকার তৃপ্ত করার জন্য নয়। মহান্ হও দেশসেবার জন্য ; ভারতকে মহান্ করার জন্য।'

— ঋষি অরবিন্দ

Freedom fighters whose pension has been sanctioned

SEPTEMBER—1982

Dist—CALCUTTA

Chakraborty Smt Bani w/o Late Kulada Ch. 26
Chatterji Anil Ch. 113/3, M. B. Road, 60
Das Smt Namita w/o Late Sital Kanta, 32
Das Smt Parulbala w/o Late Ramesh Ch. 61
Das Smt Parul Rani w/o Late Santosh Kr. 166/2, Rai Bahadur Rd. 84
Dey Smt Hiran Bala, w/o Late Santosh Kr. Jatin Das Rd. 56
Ghosh shyam Charan 89
Mukherji Smt Kamala w/o Late Sailen, 28
Sarkar Jatindra Lal Prafulla Colony, 59
Sen Bejoy Bhusan 95 S. B. Rd, 26

Dist—24 Parganas

Basu Smt Sila w/o Late Kalipada, Udayrajpur.
Bhattacharji Smt Hemangini Debi w/o Late Anil, P-25 Kanangu Park Garden
Das Smt Kamala Prova w/o Late Surendra Mohan, Haltu.
Datta Smt Anila Bala w/o Late Rati Kanta, New Barrackpore
Dhar Jatindra Nath
Ganguli Smt Makhan Bala w/o Late Jagadish Ch. Kalyangarh
Mitra Smt Jyotisna w/o Late Harendra prasad, Nabapalli.
Mondol Smt Hazari Bala w/o Late Krishnapur.
Ray Smt Bibharani w/o Late Prafulla Ch. Dakbin Gobindapur.
Ray Sunit Madhyamgram.

Dist—Nadia

Poddar Smt Nani Bala

Distt—Howrah

Bhattacharji Kaumudi Kanta Jagacha
Bhattacharji Smt Nalini w/o Aakshoy Kumar Andul Mouri
Bhattachaaji Smt Usbangini w/o L Jaharlal Sibpur
Roy Girsir Kumar 66/5, Atindra Mukherji Lane Sibpur

Dist—Burdwan

Chakrabory Smt Dayamoyee w/o Late Durgapada Katwa
Chatterjee Smt Lila Devi w/o Late Sarbani Kumar Burdwan
Dastidar Smt Jyotsna w o Durjendra Nath Rasulpur

(এর পর বাম কলাম-এ দেখুন)

সম্পাদকীয়

অশান্ত পরিস্থিতির মোকাবিলা চাই

ভারতবর্ষের কয়েকটি প্রদেশে একদল মানুষ দেশের একাত্মতা, ঐক্য ও সংহতির কথা না ভেবে গোটা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজকর্ম করে, গায়েরজোরে তাদের দাবী আদায়ের চেষ্টা চালাচ্ছে। ব্যাপারটা এই যে তাদের দাবী যত অসঙ্গতই হোক, হোকনা কেন দেশের পক্ষে চরম ক্ষতিকর, তাদের হুকুম মত কাজ করতেই হবে দেশের সরকারকে। না করলে তারা দাঙ্গাহাঙ্গামা, লুঠতরাজ চালিয়ে এমনকি মানুষ খুন করে জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করে দেশের সরকারকে বাধ্য করবে নতজানু হয়ে তাদের আবদার মেনে নিতে। বলা বাহুল্য, এই দেশদ্রোহিতামূলক অপকর্ম চলতে দিলে, কোন দেশেই কোন সংবিধান সম্মত সরকারের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

এই উপদ্রব সুরু হয়েছিল মিজোরাম ও মণিপুরে, তারও বিকাশ ঘটল আসামে। অতি সম্প্রতি আরম্ভ হয়েছে পানজাবে। বহু দিনের পুরাণো এই ঘুণধরা আন্দোলন চালু ছিল কাশ্মীরে। এখন প্রকাশ্যেই এই সব অঙ্গরাজ্যে এই সব দেশদ্রোহীরা, অন্য প্রদেশের আন্দোলনের নজীর খাড়া করছে। এই আন্দোলনকারীদের প্রচেষ্টার মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত ঐক্যের সন্ধানও মিলছে তাদের প্রকাশ্য বিবৃতির মধ্যে দিয়ে।

ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। বিভিন্নধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষী, বিভিন্ন জাত্যাভিমানী মানুষ এখানে বাস করে। উপর উপর দেখলে মনে হয় এখানে যেন ভিন্ন ভিন্ন জাতি বাস করে। তাদের মধ্যে কোন ঐক্য নেই। একের সঙ্গে অন্যের যেন কোন মিল নেই। ভারতবর্ষকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেওয়াই যেন তাদের কাজ এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তারা যেকোন পন্থাগ্রহণ করতে পারে অবাধে। ইতিহাসের কোন শিক্ষাই তারা গ্রহণ করতে চায়না। আত্মকলহ, বিচ্ছিন্নতাকামী মানসিকতাই যে ভারতের স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে, একথাও তারা ভুলে গিয়েছে। তাদের অপকর্মের ফলে বহু শহীদের জীবনদান, বহু স্বাধীনতাসংগ্রামীদের অসীম দুঃখ কষ্ট বরণ করার পর যে আকাঙ্খিত স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তার কোন মূল্য এদের কাছে নেই। অথচ এরা স্বাধীনতা সংগ্রামের শরীক ছিলনা কখনও। এরা নেপোর দল, অন্যের কষ্টার্জিত দই মারতেই উদ্যত। এই পরিস্থিতিটা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক, এসত্য অনস্বীকার্য্য।

এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির মোকাবিলা করার চেষ্টা হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। হয়ত বা তাদের যুক্তির পথ দেখতে এবং গ্রহণ করাতে প্রচেষ্টা চলেছে। তা ভিন্ন, যে কোন সমস্যার সমাধানের জন্য শান্তিপূর্ণ আলাপ আলোচনার নীতিই গ্রহণ করা, এতে আপত্তির কিছু নেই। এটাই যে সভ্য সমাজ ও রাষ্ট্রের নীতি, এটাও স্বীকার করতে কোন বাধাই নেই। কিন্তু ভারতের এই সব অশান্তির মূল উৎস খুঁজে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, এ আলাপ আলোচনার অতিরিক্ত কিছু করতে হবে। অতীতের কোন ভ্রান্তনীতির ফলে যদি এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে সেদিকেও দৃষ্টি দিতে হবে এবং কোন দুর্বলতা ও ভ্রান্তি থাকলে তাকে দূর করতে হবে। অন্যথায় এক জায়গায় কোন সমঝোতা হলে, অন্য জায়গায়, অন্য সময়ে এই সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকবে। সেই জন্য মৌলিক সমাধান করতেই হবে।

এ সত্য আজ অনস্বীকার্য যে আমাদের রাষ্ট্রের তরফ থেকে যখন একটা দ্বিমুখীনীতি-অনুসরণ করার ফলে কঠিন সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছে। ভুলের মাশুল আজো দিতে হচ্ছে সমগ্র জাতিকে। হিন্দু মুসলমান ঐক্য অর্জন করতে যেয়ে অন্যায়ভাবে মুসলিম সম্প্রদায়কে তোষণ করা হয়েছে। দ্বিতীয় যুদ্ধোত্তর কালে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির, বিশেষ ইংরেজশক্তি যখন ধ্বংসম্মুখ, তখন তাদের ফাঁদে আমাদের নেতারা ধরা দিয়ে দেশবিভাগকে মেনে নিয়েছিলেন। বিদেশের কোন স্থান থেকে উচ্চারিত নেতাজীর সাবধান বানীকে কোন মূল্য দেওয়া হয়নি। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে হিন্দু, শিখ, মুসলমান, ক্রিশ্চান জাতির মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপন করে নেতাজী অনুকরণ যোগ্য অবদান রেখেছিলেন। দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে যখন দেশবিভাগ করা হল ও পাকিস্তান নামক নতুন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করা হল, তখন দ্বিজাতিতত্ত্বের নীতিতে যারা বিশ্বাসী ছিলেন, তাদের সোজা কথায় বলার দরকার ছিল তাদের আকাঙ্খিত রাজ্যে চলে যেতে। সেটা না করার ফলে ঐ ধরণের মানসিকতা সম্পন্ন লোকেরা এদেশে থেকে সাবোটাজ করার কাজে নিয়োজিত করতে থাকলো নিজেদের। তারপর দ্বিতীয় ভুল হল, কাশ্মীরের লড়াইতে আমাদের বীর জোয়ানরা যখন পাকিস্থানী হানাদের কাশ্মীর ছাড়া করে এনেছিল, তখন পশ্চিমী রাজ্যগুলির চক্রান্ত বুঝতে না পেরে তাদের পাতা ফাঁদে নেতারা ধরা দিলেন। কাশ্মীরের তদানীন্তন মহারাজা যখন ভারতরাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তির চুক্তিপত্র সই করলেন, র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ অনুসারে কাশ্মীরের সমস্যার সমাধান ত হয়েই গিয়েছিল এবং সেটাছিল আইনসঙ্গত। তবু কেন গণভোট নেওয়ার দাবী স্বীকার করা হল, সেটা দুর্বোধ্য এবং রাজনৈতিক দিক্‌দিয়ে দেশের পক্ষে চরম ক্ষতিকর। তারপর কাশ্মীরকে ৩৭০ ধারা অনুসারে কেন স্বতন্ত্র মর্য্যাদার অধিকারী করা হল, তার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায়না। আজ সেইদিন উপ্ত সর্বনাশের বীজ ভারতের ঐক্য ও সংহতির পথে পর্বত প্রমাণ বাধা হয়ে দাড়িয়েছে। শুধু তাই নয়, দেশের ভিতরে অন্য রাজ্যে বিভেদকারী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। আসামে যারা আন্দোলন করছে, তারাও এই পরিস্থিতির ধারক বাহক মাত্র। তারা সংবিধানগত দায়িত্ব, মানবতা ও বাস্তবতা কোন কিছুকেই মর্য্যাদা দিচ্ছেনা। তাদের যে অসঙ্গত জিদ, তার নিকট ভারত সরকার

মাথানত না করলে, তারা কোন সমাধানকেই মানবেনা বলে হুমকি দিয়ে চলেছে সমানে। এদের সঙ্গে এত দীর্ঘসময় ধরে আলোচনা করার কি থাকতে পারে, সেটা সধারণ বুদ্ধির অগম্য। ভারত সরকারের নমনীয় মনোভাবকে তারা দুর্বলতা বলে ধরে নিয়েছে। তৃতীয় যে সমস্যা চাঙ্গা করে তুলেছে বিপথগামী একদল শিখ সম্প্রদায়ের লোক, সেটাও রীতিমত উদ্বেগপূর্ণ। তাদের যে আবদার তা ভারতরাষ্ট্রের মেনে নেওয়া অসম্ভব। অকালীরা আসামের আন্দোলনের দৃষ্টান্ত নিজেদের স্বপক্ষে দাঁড় করিয়েছে নির্লজ্জভাবে। এদের দাবীটা কাশ্মীর ও আসাম থেকে আরো একধাপ এগিয়ে। হরিয়ানা, রাজস্থান, হিমাচল প্রদেশ থেকে অংশ কেটে তাদের "সাম্রাজ্যকে" দিয়ে দিতে হবে। চণ্ডীগড়ও দিতেই হবে। এর পর কবে শোনা যাবে দিল্লীপ্রদেশটাও দিতে হবে। এই তিন রাজ্যের আন্দোলনকারীদের পাগলামির মধ্যে একটা কৌশল আছে। ভারত সরকারকে টাকাকড়ি দিতে হবে, সমস্তশক্তিদিয়ে রক্ষা করতে হবে। তারা এটা ভালভাবেই জানে এটা না হলে যে কোনদিন একটা থাপ্পড় মেরে পাশ্ববর্তী রাজ্য তাদের গ্রাস করবে। কিমাশ্চর্য্যম্ অতঃপরম।

ভারতের বর্ত্তমান কর্ণধারদের এই পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। অতীতের ভ্রান্ত নীতিগুলিকে সংশোধন করতে হবে এবং আগামী দিনের নীতিকে বজ্রকণ্ঠে দৃপ্ত নির্ঘোষে প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সেটা হল, ভারতরাষ্ট্রের অঙ্গচ্ছেদ করে ভারতরাষ্ট্রকে যারা দুর্বল করতে চায়, তাদের সঙ্গে কোন আপোস নেই। দেশদ্রোহীদের যে প্রাপ্য শাস্তি, তাদের দিতে হবে। কোন সংশয়, কোন দ্বিধা, কোন দুর্বলতার স্থান এর মধ্যে থাকতে পারেনা। প্রয়োজন হলে সমগ্র জাতির সর্বনাশ সাধনের চেষ্টা করছে যারা, তাদের দেশছাড়া করতে হবে। অযথা কালক্ষেপ করা উচিৎ হবে না। তা করা হলে, দেশকে ধ্বংস হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনাকে কেউ রোধ করতে পারবেনা। অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে এই প্রকার আত্মদ্বন্দের জন্য, বিচ্ছিন্নতাকামী মনোভাবের জন্য, দেশকে স্বাধীনতা হারাতে হয়েছে। দৃঢ়তা, চাই সঙ্কল্পনিষ্ঠা, চাই নিখাদ দেশপ্রেম। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। হয় উপযুক্ততা প্রমাণ করতে হবে, নতুবা ইতিহাসের আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। কোন পথ সরকার বেছে নেবেন, দেশবাসী অসীম উদ্বেগের সঙ্গে সেদিকে লক্ষ্য রাখছেন।

দেশের সমস্ত চিন্তাশীল ও দেশপ্রেমিক মানুষ দাবী করে শ্রীমতী গান্ধী জীবনমরণ পণ করে এই অশান্ত পরিস্থিতি মোকাবিলা করুন ও ভবিষ্যত এমন সর্বনাশা আন্দোলনের পথ চিরতরে বিনাশ করুন।

———

জাতীয় পতাকার বিবর্তন

—সুকুমার পাল

ভারতীয় জনজীবনের আশা আকাংখার প্রতীক ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত চক্রলাঞ্ছিত জাতীয় পতাকা নানান বিবর্তনের ফলশ্রুতি, ১৯০৬ থেকে ১৯৪৭ সাতবার জাতীয় পতাকা নিয়ে ধ্যানধারণার পরিবর্তন ঘটেছে।

ভারতীয় জাতীয় পতাকা সম্পর্কিত ভাবনার প্রথম অভ্যুদয় বঙ্গভঙ্গের সেই টালমাটাল দিনগুলিতে। ১৯০৬ সালের ৭ আগষ্ট সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার পারসী বাগান পার্কে প্রথম পতাকা উত্তোলন করেন, তিনি যে পতাকা উত্তোলন করেছিলেন সেটি ছিল ওপরে সবুজ, মাঝে হলুদ ও নীচে লাল।

।। দ্বিতীয় পর্যায়—১৯০৭ ।।

১৯০৭ সালে প্যারিসে কিছু ভারতীয় বিপ্লবী এক সম্মেলনে সমবেত হয়ে দেখেন একমাত্র ভারত ছাড়া আর সব দেশেরই জাতীয় পতাকা আছে। তাঁরা তখন মাদাম কামার নেতৃত্বে একটি জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করার সংকল্প গ্রহণ করেন। গৈরিক সাদা ও সবুজ এই তিনটি রঙ দিয়ে এই পতাকা তৈরী হয়। গৈরিক অংশে ছিল সাতটি তারা ও একটি পদ্ম (প্রথমে ছিল ৮টি পদ্ম)। মধ্যের সাদা অংশে দেবনাগরীতে লেখা ছিল বন্দেমাতরম্। নিচে সবুজ অংশের বাঁদিকে সূর্য ও ডানদিকে চন্দ্র আঁকা হয়।

।। তৃতীয় পর্যায়—১৯১৬ ।।

ঠিক এক দশক অতিক্রান্ত হতে না হতেই জাতীয় পতাকার আবার পরিবর্তন ঘটে। ১৯০৭ সালে পরিকল্পনামাফিক যে পতাকা প্রস্তুত করা হয়েছিল তার রূপান্তর ঘটল হোমরুল আন্দোলনের সময়। ১৯১৬ সালে অ্যানি বেসান্ত পরিকল্পনা করেন যে—৫টি লাল ও ৪টি সবুজ রঙ পরস্পর সমান্তরালভাবে স্থাপন করে জাতীয় পতাকা তৈরী হবে, পতাকার বামধারে ঊর্ধ্বে ইউনিয়ন জ্যাক এবং তার নীচে সপ্তর্ষিমণ্ডল আকারে সাজানো সাতটি তারা থাকবে।

।। চতুর্থ পর্যায়—১৯২১ ।।

এবার মহাত্মাজীর পরিকল্পনা। ১৯২০ সালে তিনি পুনরায় জাতীয় পতাকার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন এবং তার পরিপ্রেক্ষীতে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কিন্তু কোন ফল না হওয়ায় মহাত্মাজী ১৯২১ সালে উপরে সাদা, মধ্যে সবুজ ও নীচে লাল—এইভাবে পতাকা প্রস্তুত করেন। পতাকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন—সাদা হচ্ছে সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়ের, সবুজ হচ্ছে মুসলমান সম্প্রদায়ের আর লাল হল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতীক। এবং জাতীয় উন্নয়নের চিহ্ন হিসাবে থাকবে—পতাকার উপর চরকার ছবি তিনটে রঙকে স্পর্শ করে।

।। পঞ্চম পদক্ষেপ—১৯৩১ ।।

এবছর করাচী কংগ্রেস অধিবেশনে জাতীয় পতাকা গঠনের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি সুপারিশ করেন যে, জাতীয় পতাকা সম্পূর্ণ গৈরিক রঙ-এর হবে। বাঁদিকে চরকার ছাপ থাকবে। কিন্তু এটি শেষ পর্যন্ত অনুমোদিত হয়নি। তাই এই বৎসরই একটি তিন রঙ-এর পতাকা জাতীয় পতাকা রূপে গৃহীত হয়।

উপরে গৈরিক, মধ্যে সাদা, নীচে সবুজ এবং মধ্যস্থলে একটি চরকার ছাপ।

।। ষষ্ঠ পরিকল্পনা—১৯৪২ ।।

পুনরায় ১৯৪২ সালে কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক স্থির হয় জাতীয় পতাকার রূপ হবে—'উপর হতে নিচে সমান্তরালভাবে জাফরান, শ্বেত ও সবুজ। মধ্যভাগে শ্বেত অংশে চরকা শোভিত বর্ণগুলি গুণবাচক; যথা :—জাফরান—ত্যাগ ও সাহস, শ্বেত—সত্য ও শান্তি, সবুজ—বিশ্বাস ও শৌর্য। চরকা জনগণের আশা ও আকাংখার প্রতীক।

। ৭ম ও শেষ অধ্যায়—১৯৪৭ ।।

জাতীয় পতাকা নিয়ে যখন সুদীর্ঘ ৪০ বছর ধরে ছিন্নভিন্ন রাজনীতি ও ব্যক্তিগত প্রভাবে অবমাননা করা হচ্ছে তখনই গণপরিষদকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। ১৯৬৭ সালে ২২ জুলাই গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে পূর্বোক্ত জাতীয় পতাকার কিছু রূপান্তর ঘটিয়ে যবনিকা আসে। তবে ৬নং পতাকাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। গণপরিষদের সিদ্ধান্ত মত চরকার পরিবর্তে সম্রাট অশোকের স্তম্ভ শীর্ষের পাদদেশের চক্রটিকে গ্রহণ করা হয় এবং এই বৎসরের ১৪ আগষ্ট পরিষদের মধ্যরাত্রীর অধিবেশনে ভারতীয় নারীদের পক্ষ থেকে জাতিকে এই পতাকা অর্পণ করা হয়। গণপরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সপ্তমও বর্ধিত পতাকার চেহারা দাঁড়ায়—জাফরান, সাদা ও সবুজ। সাদা অংশে অশোক চক্রের ছাপ। ইহার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ৩ : ২। ৩৫ বছর ধরে এটাই ভারতের জাতীয় পতাকা।

।। জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য ।।

ভারতের জাতীয় পতাকা সমান্তরাল ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। প্রতিটি বর্ণই এক একটি আদর্শের প্রতীক। পতাকার ঠিক কেন্দ্রস্থলে অশোকচক্রের ছাপ। মহামতি অশোকের ছিল আদর্শনিষ্ঠা, ত্যাগ, সত্যানুরাগ, অহিংসা, জীবে প্রেম। যুদ্ধ বর্জন, অন্যান্য জাতির সহিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ইত্যাদি নীতিগুলি আজও আদর্শনীতি বলে মানুষ মনে করে। ভারত তাই অশোকের শাসনাদর্শকেই অনুসরণ করে চলে। সমান্তরাল রংগুলির অর্থ হিসাবে ধরা হয়েছে যে, গৈরিক—ত্যাগ ও সেবার প্রতীক; শ্বেত—শান্তি ও পবিত্রতার প্রতীক; সবুজ—নিষ্ঠীক কর্মশক্তি ও জীবনধর্মের প্রতীক আর অশোকচক্র উন্নতি ও প্রগতির প্রতীক।

।। ব্যবহার করার নিয়ম ।।

ক) এই পতাকার মর্যাদা ও স্থান সকল পতাকার উর্ধ্বে। জাতীয় পতাকার ডানদিকে এবং উর্ধ্বে কোন পতাকা রাখা চলেনা।

খ) সরকারী কার্যালয়ে এই পতাকা উত্তোলিত থাকবে।

গ) জাতীয় উৎসবের দিনে এই পতাকা প্রত্যেকেই নিজ নিজ গৃহে উত্তোলন করতে পারবেন কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে অবশ্যই নামিয়ে নিতে হবে।

ঘ) জাতীয় শোকদিবসে সরকারী দপ্তরগুলিতে উত্তোলিত পতাকা অর্ধনমিত করতে হবে।

ঙ) বিশেষ কোন উপলক্ষে যদি কোন মিছিল বার হয় তাহলে পুরোভাগে থাকবে জাতীয় পতাকা এবং সর্বশেষে থাকবে অন্যান্য পতাকা।

চ) জাতীয় পতাকা বা প্রতীকের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা কোন লঘু ব্যাপারে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ।

ছ) জাতীয় পতাকার অমর্যাদা রাষ্ট্রের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন রূপে গণ্য করা হয়। জাতীয় পতাকার সম্মান প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্তব্য।

সৌজন্য : পরিবর্তন/১১-৮-৮২

অফিস কল কারখানায় বংগসন্তান সংখ্যালঘু কেন ? প্রতিকার চাই

—ষ্টাফ রিপোর্টার

এই প্রতিবেদনে বঙ্গসন্তান বলতে শুধু বাংলা-ভাষীদের বুঝায় না যাঁরাই পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা তাঁদের সবাইকে ধরা হয়েছে।

রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রকাশিত পরিসংখ্যান হতে সংগৃহীত তথ্য :—

চটকল শিল্পে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কর্মীর মধ্যে এই রাজ্যের সন্তানের হার ১৯৮১ সালে ২৫·৩৭ শতাংশ আগে ছিল ২৯·১৭ সতাংশ অর্থাৎ ৪ ৬০ শতাংশ কমেছে গত তিন বছরে।

সূতাকল কাপড়ের কলে মোট নিযুক্ত ৫২·২০৬ জনের মধ্যে বঙ্গসন্তানের হার ১৯৮১তে হল ৫৪ ৮১ শতাংশ আগে ছিল ৫৫·৯৯ শতাংশ বিগত কয়েক বছরে এই হার ১·১৮ শতাংশ কমেছে। ইঞ্জি-নিয়ারিং শিল্পে ছোট, বড়, মাঝারি সব মিলিয়ে ২লক্ষ ৪৪ হাজার কর্মী কাজ করে তার মধ্যে গত বছর বঙ্গসন্তান ছিল ৬০·১২ শতাংশ ১৯৭৮ সালে এই হার ছিল ৬১·৪৬ শতাংশ, অর্থাৎ কমেছে ১·৩৪ শতাংশ।

লোহা ও ইসপাত শিল্পে নিযুক্ত ৪১ হাজার ৩২৮ জন কর্মীর মধ্যে শতকরা ৫৪·১৮ জন বঙ্গ সন্তান কয়েক বছর আগে ছিল ৪৪ ৫৬ শতাংশ অর্থাৎ ৯·৬২ শতাংশ বেড়েছে।

মুদ্রণ শিল্পে নিযুক্ত ১৪৬১৮ জন কর্মীর মধ্যে ১৯৮১ সালে ৭৫ ১৮ শতাংশ বঙ্গসন্তান, এই হার ১৯৭৬ ৭৭ সালে ছিল ৭৭·৬৭ শতাংশ অর্থাৎ কমেছে ২·৪৯ শতাংশ।

কাঁচ শিল্পে নিযুক্ত ৭৪৩৪ জন কর্মীর ১৯৮১ সালে ৩৯·৭৫ শতাংশ বঙ্গসন্তান এই হার ১৯৭৮ সালে ছিল ৪৯·১১ শতাংশ অর্থাৎ কমেছে ২০·৬৪ শতাংশ রাসায়নিক শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ৩৪২০৯ জন বঙ্গ সন্তানের হার হল ৫৭·৪৩ শতাংশ ১৯৭৫ সালে এই হার ছিল ৭৯·৩৮ শতাংশ ১৯৭৭ সালে ৭৯·৭৩ কমেছে প্রায় ২০ শতাংশ।

কাগজ শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৮·০২৪ বঙ্গ সন্তানের হার ২৮·৯১ শতাংশ ১৯২৬ সালে এই হার ছিল ৩১·৪৯ শতাংশ অর্থাৎ কমেছে ১·৫৮ শতাংশ।

এবার শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা ১৫৩৮০ তাদের মধ্যে বঙ্গ সন্তানের হার ছিল ৭১·৭৯ শতাংশ বর্তমানে কমে ৩৬ শতাংশ হয়েছে।

অন্যান্য শিল্পে ১৯৮১ সালে নিযুক্ত কর্মীর শতকরা ৫০·২১ জন বঙ্গ সন্তান, ১৯৮০তে এই হার ছিল ৫৫·২৯ শতাংশ ৪·৩৮ শতাংশ কমেছে।

সংগঠিত শিল্পে নিযুক্ত কর্মী সংখ্যার বঙ্গ সন্তানের হার ১৯৮১ সালে দাঁড়িয়েছে ৪২·৭৩ শতাংশ, ১৯৮০ সালে এই হার ছিল ৪৩·৮৩ এক বছরে কমেছে ১·৩০ শতাংশ। ১৯৭৬ সালে এই হার ছিল ৪৬·৬৬ শতাংশ অর্থাৎ পাঁচ বছরে শিল্পে বঙ্গ সন্তানের চাকরীর হার সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী কমেছে ৪·১৩ শতাংশ, এই হার ১৯৮২ সালেও কমতির দিকে।

এতকাল ব্যবসা বাণিজ্য, কেরাণী, টাইপিষ্ট, টেকনিকেল, ইনসিওরেন্স, বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিমান ইত্যাদিতে বঙ্গসন্তানের চাকরীর হার বেশ বেশী ছিল, কিন্তু ক্রমশ বঙ্গসন্তান পিছিয়ে পড়ছে।

সড়ক পরিবহনে বঙ্গ সন্তানের চাকরী সামান্য কিন্তু ট্রাকে বঙ্গসন্তান সব সময়ই সংখ্যালঘু। কার

ও লরী ড্রাইভারদের মধ্যে মাত্র শতকরা ৩৪ জন এই রাজ্যের সন্তান।

কেরানীদের শতকরা ৯১ জন, সেলসম্যানদের শতকরা ৭৬ জন, টেকনিকেল কর্মীদের শতকরা ৬৬·৩১ জন পরিচালনা কর্তৃপক্ষের শতকরা ৭০ জন অধস্তন কর্মীদের শতকরা ৬৬·৫০ জন বঙ্গ সন্তান। অন্যান্য কাজে নিযুক্ত মোট ৪১ শতাংশ এই রাজ্যের লোক। সরকারী হিসাবে দেখা যায় ১৯৭৯ সালে বেঙ্কিং-এ শতকরা ৯১·৫৬ জন বঙ্গ সন্তান ছিলেন তার হার ১৯৮১ সালে কমে দাড়িয়েছে ৭৭·২১ শতাংশ, অর্থাৎ কমে ১৪·৩৫ শতাংশ গত দুই বছরে। ইনস্যাণ্ড ট্রেনসপোর্টে বঙ্গ সন্তানের চাকরীর হার ১৯৭৫ সালে ছিল ৫০ শতাংশ, ১৯৮১তে কমে দাড়িয়েছে মাত্র ৮·২৫ শতাংশ অর্থাৎ কমেছে ৪১·৭৫ শতাংশ, বিদ্যুৎ উৎপাদনী ব্যবস্থায় ১৯৭৯ সালে বঙ্গ সন্তানের হার ছিল ৮৬·৭৬ শতাংশ দুই বছরে ১৯৮২তে দাড়িয়েছে ৪৭.২১ শতাংশ অর্থাৎ কমেছে ৩৯·৫৫ শতাংশ ১৯৭৯ থেকে ১৯৮২ সাল এই দুই বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে বঙ্গ সন্তানেব চাকরীর হার কমেছে ২·৫৮ শতাংশ। এই সময়ে এই রাজ্যে অন্য রাজ্যের লোক বিশেষত বিহার, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, দক্ষিণ ভারতের লোকদের বাংলাদেশে নিযুক্তি বেড়েছে, অথচ এইসব রাজ্যে ব্যবসা, বাণিজ্যে সদাগরি অফিসে, কলকারখানায় বঙ্গসন্তানদের স্থান নেই।

পরিসংখ্যান বিশ্লেষণে দেখা যায় কেবলমাত্র লোহা ও ইস্পাত শিল্প বাতীত অন্য যে কোন নিয়োগে মোটেই উৎসাহী নয়, বরং কৌশলে বঙ্গ সন্তানদের এড়িয়ে চলার নীতিই গ্রহণ করেছে। বর্তমান রাজ্যসরকার শিল্পপতিদের কোন প্রকার চাপ দিতে অনিচ্ছুক, কারণ চাপ দিলে শিল্পপতিরা অন্য রাজ্যে শিল্প স্থানান্তরিত করিতে পারে। শিল্পপতিরা সরকারের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বঙ্গ সন্তানদের ওপর অবিচার করছে। রাজ্যের সন্তানদের রক্ষা করতে অসমর্থ সরকারের গদি দখল করে রাখার কোন্ নৈতিক অধিকার আছে।

তৃতীয় বিশ্বের ১১০টি দেশের মধ্যে ৯০টিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকারের অস্তিত্ব নেই। আমরা ৩৫ বছর ধরে অনেক ভুলভ্রান্তি সত্বেও ভারতবর্ষকে এমন একটি গণতান্ত্রিক অবস্থায় দাড় করিয়েছে যাতে সারা পৃথিবীর প্রশংসা কাড়তে সমর্থ হয়েছি। কারিগরি কুশলতায় ভারতের স্থান তৃতীয়, শিল্পে দশম স্থান, বেজোট দেশগুলির মধ্যে ভারতের নেতৃত্ব অনস্বীকার্য, আমাদের দুর্বলতা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সুদৃঢ় করার জন্য সে রকম দেশব্যাপি আন্দোলন ও সংগ্রাম প্রয়োজন আঞ্চলিক সংগ্রামের জন্য তা গড়ে উঠতে পারছে না। গত পনর বছরে দেখা যায় সর্ব্বভারতীয় আন্দোলন বলে কোন আন্দোলন গড়ে উঠেনি। নির্ব্বাচন ছাড়া দেশব্যাপি আন্দোলন বলতে কিছু নেই। আন্দোলন, সংগ্রাম আলোড়ন এখন আঞ্চলিক হয়ে উঠেছে, যেমন পাঞ্জাব, আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড, মেঘালয় প্রভৃতিতে। গত কয়েক বছর ধরে কৃষক সংগ্রাম নাম নিয়ে বিত্তবান চাষীদের যে আন্দোলন দেখা দিয়েছে তা মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু সীমানা পার হতে পারেনি।

সারা দেশে খণ্ড খণ্ড আন্দোলন অসংখ্য, কিন্তু আন্দোলনে জাতীয়তা বোধের অভাব, তার চেয়েও বড় অভাব সংগঠন ও নেতৃত্বের ফলে আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত সর্ব ভারতীয় জাতীয় কৃতিত্বে না পৌঁছে আঞ্চলিকতায় পর্যাবসিত হতেছে। এই রূঢ় বাস্তব সত্যকে রাজনৈতিক নেতারা স্বীকার করে সঠিক

পথে এগুতে পারছেন না। ফলে দেখা যায় দক্ষিণে ডি, এম, কে, এ, ডি, এম্ কে তেলেগু দেশম, পাঞ্জাবে আকালি দল দিন দিনই আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আধিপত্য বিস্তার করছে। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের স্রোতধারার সঙ্গে পরিচিতির অভাব এর মূল কারণ। ভারতবর্ষে এখন আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তা এমন জটিলভাবে মিশে আছে যে দুটী স্রোতধারার সঙ্গে একই সঙ্গে নিপুণভাবে চলতে না পারলে বিভ্রান্তি ও বিফলতা অবশ্যম্ভাবী। দেশের রাজনৈতিক জীবনেও এর প্রকাশ পেয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যেতেছে, ঐক্যের বদলে মত ও পথের বিরোধই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এমন কি ইন্দিরাগান্ধীর পর কংগ্রেস টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নতুবা কেন্দ্র বিন্দু দিল্লি থেকে সরে বহুকেন্দ্রিক হবে। ভারতের সংহতি বজায় রাখা কঠিন হবে।

আঞ্চলিক দাবী তুললেই ভারতের সংহতি বিপন্ন অথবা খর্ব হবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তা আপাত দৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী হলেও একে অন্যকে পুষ্ট করছে, আরও করবে ভবিষ্যতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন কোন রাজ্য নিজের রাজ্য, ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও নৈতিক বোধ শালীনতার সীমা ছেড়ে উৎকট হয়ে উঠছে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ ম্লান করে দিতেছে। রুখবার জন্য সৃষ্টি করতে হবে সকলরাজ্যের যৌথ দায়িত্বে যৌথ পরিকল্পনা বুঝতে হবে গোটা ভারতের অগ্রগতি ছাড়া ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেতে পারে না। সেই জন্য তৈরী হতেছে বড় বড় শিল্প কমন্ মার্কেট, যুক্তি-সিয়ারী বৈদেশিক নীতি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, যানবাহন, সতর্ক পাহারারত পৃথিবীর চতুর্থ বৃহত্তম ভারতীয় বাহিনী।

আঞ্চলিকতা একেবারে বাদ দিয়ে সর্বভারতীয় অগ্রগতি এগুতে পারে না, আঞ্চলিকতার স্রোতধারা হতে পুষ্টি তুলে আনতে হবে জাতীয়তাকে সুস্থ ও সবল রাখার জন্য। দুয়ের মধ্যে ভারসাম্য রচনা করাই আজকের রাজনীতির প্রধান চেলেঞ্জ। ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে ভারতবর্ষের জাতীয়তা বিপন্ন হবে। আঞ্চলিকতা লাগামহীন ভাবে চললে ভারতবর্ষ খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে, আবার আঞ্চলিক দাবী মিটিয়ে দেওয়ার প্রয়াস না থাকলে ভারতের জাতীয়তাকে মুষড়ে দিবে।

এই দৃষ্টিতেই বঙ্গ সন্তানদের দাবী মানা দরকার বাংলা দেশের সদাগরি অফিসে ও কলকারখানায় বঙ্গ সন্তানদের স্থান অগ্রণী করতে হবে। বঙ্গ সন্তানরাই বন্ধ করার সঙ্কল্প নিয়ে আন্দোলন গড়ে তুলবে এতে ভারতবর্ষের জাতীয়তা বিঘ্নিত হবে না, বরং অন্যান্য রাজ্যবাসীদের যৌথ অগ্রগতি ও জাগরণের সম্বিৎ ফিরে আসবে।

নিরাপত্তার অভাবে—জনগণ শংকিত

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

এরাজ্যের জনগণ বহুতর অভাবের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয়েছে বামফ্রন্ট শাসনের সূচনা থেকেই; তন্মধ্যে বিদ্যুতের অভাব, পানীয় জলের অভাব, শান্তিশৃঙ্খলার অভাব, পুলিস প্রশাসনে ও সাধারণ প্রশাসনে নিরপেক্ষতার অভাব, শিল্প-বাণিজ্যে স্থিতিশীলতার অভাব, নাগরিক জীবনে নিরাপত্তার অভাব, নারীর মর্যাদা রক্ষার অভাব, শাসকদলের অবিমৃষ্যকারীতার ফলেই। অন্যান্য আরো নানারূপ অভাব আছে যথা খাদ্যাভাব, বস্ত্রাভাব, বাসস্থানাভাব, স্বাস্থ্যাভাব, শিক্ষার অভাব, সেচের জলাভাব, কলে-কারখানায় ও ক্ষেতে-খামারে শান্তি-শৃঙ্খলার অভাব প্রভৃতি বহুবিধ অভাব যা বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি এম দলের কর্মী ও সমর্থকদের এবং আশ্রিত দুর্বৃত্তদের দৌরাত্ম্যে প্রকট হয়ে উঠেছে।

এমন অবিচার অত্যাচার, ব্যাভিচার, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি পূর্ব্বে ছিল কি? বামফ্রন্ট আমলেই ঐসবের মাত্রা কেন সীমাহীন অবস্থায় পৌঁচেছে?

সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করার জন্য সি পি এম দল কোমর বেঁধে নেমেছে। তাদের ধারণা মানুষকে ভয় দেখিয়ে সেই ভীতি বিহ্বল মানুষ জনের উপর জোর-জুলুম চালিয়ে তারা নির্বিবাদে খুন, জখম, ভেড়ী লুঠ, ব্যাঙ্ক লুঠ, জমির ফসল লুঠ গহনার দোকান লুঠ, নারীধর্ষণ প্রভৃতি ঘৃণ্য অত্যাচার চালিয়ে দুর্বৃত্তদের দিয়ে এবং রক্ষিত দলের সাহায্যে সুখে রাজত্ব করবে। রাতারাতি ধনী হবার পন্থা ওরা ঐ ভাবেই ঠিক করে রেখেছে। রাজ্যের পুলিস বাহিনী যদি বাধা দেয়, তবে তাদেরও কৌশলে জীবনহানি ঘটিয়ে ওরা সি পি এম দলপতিদের সাহায্যে দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে পার পেয়ে যায়।

জনগণের ধারণা—সি পি এম দলের হত্যাকারীরা, লুঠেরারা, এমন কি নারীধর্ষণকারীরা পর্যন্ত আদালতে কখনো সাজা পাবে না, কারণ বামফ্রন্ট সরকার ওদের সব সময়েই রক্ষা করবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পুলিস অফিসাররা পর্যন্ত খুন হচ্ছে প্রকাশ্য দিবালোকে। অবস্থা বর্তমানে যে কি মারাত্মক রকমের ভয়াবহ তা তিলজলার ও-সি, গঙ্গাধর ভট্টাচার্যের দুর্বৃত্তদের গুলিতে মৃত্যুবরণ সপ্রমাণ করে। পূর্ব্বপরিকল্পনামত উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়েই সি পি এম দলের দুর্বৃত্তরা এরাজ্যে সাধারণ নিরপেক্ষ ও সি পি এম বিরোধীদের মূলোচ্ছেদ করার জন্যই খুনের রাজনীতিকে চালু করেছে। যেখানেই পুলিস নিয়ম মেনে চলতে চায় সেখানেই সি পি এম দলের লোকেরা পুলিসের ওপর জঘন্য হিংস্র আক্রমণ চালায় দলবদ্ধ ভাবে সশস্ত্র অবস্থায়।

টংতলা ও তিলজলার ঘটনাগুলি বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে সঠিক ভাবে তদন্ত করা হলেই প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হবে এবং অনেক মন্ত্রীরও স্বরূপ এব্যাপারে প্রকাশ পাবে। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও যে ধোয়া তুলসীপাতা নন তাও প্রকাশ পাবে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত হলে, আর সেই ভয়েই মুখ্যমন্ত্রী কিছুতেই বিচার বিভাগীয় তদন্তে রাজি হতে পারছেননা। পুলিস এ্যাসোসিয়েশনের বিচক্ষণ কর্তাব্যক্তিরাও সেই জন্যেই বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী করেছেন। জনস্বার্থে ও আরক্ষা বাহিনীর মনোবলকে অটুট রাখতে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, অন্যথায় আসল রহস্যজনক ঘটনাবলী চাপা পড়ে যাবে ও প্রকৃত দোষীরা ও নেপথ্যের

ইত্যাদিরা আইনের দণ্ড হতে মুক্তি পাবে। পুলিস কর্মচারীদের আক্রমণ, আহত বা নিহত করার পূর্বে মিথ্যা রটনার মাধ্যমে পুলিসের বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত উপায়ে জনগণকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করার কাজে সি পি এম দলের নেতা, হাকনেতা, কর্মী ও সমর্থকরা বিপুল উৎসাহে আসরে নামছে।

এস, আই অসীম ব্যানার্জিকে আক্রমণ, তার বিভসবার ছিনতাই ও তাকে হত্যার চেষ্টা টংতলায় যারা করেছিল, তারা যে সি পি এম দলের সঙ্গে যোগসাজসেই তা করতে পেরেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ আর নেই। সরকার বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে ভীত কেন? পুলিসের সাধারণ কর্মীরাও তা জানে। সরকার সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয় পায় কেবল সি পি এম দলের মুখোশ খুলে যাবে বলেই, আর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে সেই আতঙ্কে।

পুলিসের মধ্যে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি এর আগেও ছিল এবং এখনো আছে, কিন্তু বর্তমানের মত বিশৃঙ্খলা ও উচ্ছৃঙ্খল অফিসারদের অগ্রাহ্য করার মনোভাব পূর্বে দেখা যায়নি কেন? তখন পুলিসের মধ্যে দলাদলি ছিলনা। তাদের একটাই এ্যাসোসিয়েশন ছিল। যুক্তফ্রন্টের আমলে নন্, গেজেটেড্ পুলিস কর্মীদের জন্য একটা সংস্থা তৈরী হয় সি পি এম দলের লেজুড় সিটুর প্রভাবাধীনে। বর্তমানে উক্ত সিটু প্রভাবাধীন সংস্থাই পুলিসের মধ্যে উগ্র মনোভাব ও উপরওয়ালাদের পদে পদে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

জন-নিরাপত্তার জন্যই পুলিসী ব্যবস্থার প্রয়োজন বোধ করে সরকার, কিন্তু এরাজ্যে দলীয় ক্যাডারদের দিয়ে মানুষকে এমনকি পুলিস অফিসারকেও ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলছে বামফ্রন্ট সরকার সুকৌশলে আর এব্যাপারের সাক্ষ্যবহন করছে দৈনিক সংবাদপত্রগুলির প্রচারিত সংবাদ। সংবাদ সংস্থার বা সংবাদ পত্রের উপর বামফ্রন্ট যতই চাপ সৃষ্টি করুকনা কেন, যথাসময়ে বামফ্রন্টের কীর্তিকলাপ সব কাগজেই প্রকাশ পাচ্ছে।

এর একটাই কারণ এবং তা হচ্ছে এই যে, এ রাজ্যের বুদ্ধিজীবি দল-নিরপেক্ষ ব্যক্তিগণ সি পি এম এর আসল কারসাজি দেরীতে হলেও সম্যক উপলব্ধি করেছে বিগত পাঁচ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের নমুনা দেখে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরেই পুলিসের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচার কত অধিক মাত্রায় বেড়েছে তা রাজ্যবাসী লক্ষ্য করে বিস্মিত ও বিরক্ত। সব চেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, সরকার তার আশ্রিতজনকেও নিহত হতে দেখলে কোন যোগ্য ব্যবস্থা নিতে অক্ষম, কেবল মাত্র সি পি এম দলস্বার্থে। এরাজ্যের প্রকৃত কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সজাগ হতে হবে জনস্বার্থে। প্রয়োজনবোধে বামফ্রন্টের পক্ষপাতদুষ্ট শাসন থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন পশ্চিমবঙ্গে প্রবর্তন করার মত সঠিক অবস্থা হয়েছে কিনা তা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখা একান্ত দরকার।

বিচ্ছিন্নতাবাদ কি ও কেন

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের)

— কালীপদ সরকার

॥ দক্ষিণ ভারত ॥

বিচ্ছিন্নতাবাদের এক বৃহৎ মনোভূমি তামিল ও তেলেগু ভাষা অধ্যুষিত দক্ষিণ ভারত। ঝড় যে রুদ্র মূর্তিতে সেখানে উঠেছিল তা অবশ্য থেমে গেছে তবে থামার আগে ঝড় ভারতীয় ঐক্যের বনস্পতির কয়েকটি কাণ্ডকে এমনভাবে ভেঙ্গে দুমড়ে দিয়ে গেছে যে জীবনের নতুন পাতা গজানো সেখানে প্রায় অসম্ভব। 'আংরেজি হটাও'-এর হাউলিং মেজরিটির চাপের নিকট সরকারের নতি স্বীকার ছিল ঝড়ের কারণ। ইংরাজ অধিকার এবং ইংরাজি ভাষা যে এক নয় বরং উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান, হিন্দি প্রেমিক রাষ্ট্র নেতাদের এই সহজ সত্যটাকে বুঝতে না চাওয়া হল রাজনৈতিক অপরিণামদর্শিতা এবং দুরদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাস। ইংরাজদের দেওয়া শাসন ব্যবস্থা, সিভিল ও ক্রিমিনাল কোড এবং বিচার পদ্ধতির ন্যায় ইংরাজি ভাষাও যে ভারতীয় ঐক্যের সহায়ক এ কথাটা তারা ভুললেন কি করে ? হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার সরকারী সিদ্ধান্ত দক্ষিণ ভারতকে দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগম অর্থাৎ দ্রাবিড়ীস্থান ভাবনায় উন্মোখিত করেছে।

ভাষানীতির ভয়াবহ পরিণাম দেখে সরকার পিছু হটলেন। ইংরাজি ভাষাকেও অনির্দিষ্ট কালের জন্য লিংক ল্যাংগুয়েজ রূপে সরকারী হিন্দি ভাষার পাশে রাখা হল। কারো ওপর জোর করে হিন্দি ভাষা চাপানো হবে না বলে প্রতিশ্রুতির পর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল। প্রতিশ্রুতি ও আশ্বাস প্রদান আজও অব্যাহত। কিন্তু তাতে কোন ফল হয়েছে কি ? বিশ্বাস ভাঙ্গা যত সহজ, গড়া তত সহজ নয়।

অহিন্দিভাষীদের অসুবিধা দূর হয় নি। হিন্দির পাশে ইংরাজিকে সরকারী ভাষা রূপে রাখায় অহিন্দিভাষীদের মাতৃভাষার সহিত ইংরাজি অথবা হিন্দি শিখতে হয়, পক্ষান্তরে হিন্দিভাষীদের কেবল মাতৃভাষা হিন্দি শিখলেই চলে। মাতৃভাষায় দক্ষতা লাভ যত সহজ, অন্য ভাষায় তা কি কখনো সম্ভব • ত্রিভাষা সূত্র কার্যকর হয় নি। তাহলে ভাষার প্রশ্নে দেশবাসীর মধ্যে নাগরিক অধিকারগত বৈষম্য রয়েই গেছে। তা ছাড়া প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু ! ডি, এম, কে পন্থীরা তাই দাবি করছে সংবিধান সংশোধন করে ভাষা প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান করা হোক। ইংরাজির সঙ্গে হিন্দিকে সরকারী ভাষা করলে, হিন্দিভাষীদের ক্ষেত্রে ইংরাজী অথবা অপর একটি চালু ভারতীয় ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। হিন্দিভাষীরা কি এই দাবি মানতে চাইবে ? ভাষার প্রশ্নে সরকার অহিন্দি ভাষীদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক করে ছেড়েছেন মনে করলে অন্যায় হবে কি ?

সম্প্রতি তামিলনাড়ুর পেরিয়াকুলামে লোকসভার যে উপ-নির্বাচন হল তাতে কংগ্রেস (ই) এবং কমিউনিস্ট সহ সকল জাতীয় দলগুলির প্রার্থীদের জামিন বাজেয়াপ্ত হয়েছে। ভোট পেয়েছে দুই আঞ্চলিক দল ডি. এম. কে এবং এ. আই. এ ডি এম. কে। শেষোক্ত দলের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। এই নির্বাচন ছিল দলগত জনপ্রিয়তার মাপকাঠি। কোন নির্বাচনী জোট ছিল না। নির্বাচনের ফল সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করল, তামিল ভারতে গান্ধী-ইন্দিরা, মার্কস তথা বি. জে পি-র হিন্দুরাষ্ট্র ভাবনা কত অসহায় এবং ভাষার প্রশ্ন কত দৃঢ়মূল।

আমাদের সংবিধান দেশের পনের শতাংশ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মনোতুষ্টির জন্য ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রনীতি প্রবর্তন করতে পারে, পারে না চল্লিশ শতাংশ অ-হিন্দি ভাষীর ভাষাগত বৈষম্যবোধের দাবির প্রতি গুরুত্ব দিতে। হিন্দুযুগে কোন আঞ্চলিক ভাষা সরকারী ভাষার মর্যাদা পায় নি, সংস্কৃত ছিল সরকারী তথা সংযোগ রক্ষাকারী ভাষা। মুসলমান যুগে সংস্কৃতের স্থান নেয় পারসিক, ইংরাজ আমলে ইংরাজি। স্বাধীন ভারতে হিন্দিকে রাষ্ট্র ভাষা করতে যাওয়াকে মুসলমান ও ব্রিটিশ আমলের মত শাসকের ভাষা মনে করাটা কি একান্তই অমূলক? সেই কারণেই কি অহিন্দি ভাষীরা সরকারী ভাষা নীতিকে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বলে মনে করে না?

হিন্দিকে সরকারী ভাষা করেও কিন্তু ইংরাজির অপরিহার্য গুরুত্বকে উড়িয়ে দেওয়া যায় নি। লাভের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি হয়েছে। দক্ষিণ ভারতকে বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। তামিল নাড়ুর প্রভাব অন্ধ্র, কর্ণাটক এবং কেরলেও সম্প্রসারিত।

॥ পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরা ॥

এ দুটি রাজ্যেও বিচ্ছিন্নতাবাদ সক্রিয় হবে তার প্রকৃতি ভিন্নতর। পশ্চিম বাংলা ও ত্রিপুরার রাজ্য সরকার দুটি মার্কসবাদীরা দখল করেছে। নির্বাচন যন্ত্রকে তারা এমনভাবে দলীয় স্বার্থে কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করেছে যে রাজ্যদুটিতে নির্বাচন হাস্যকর প্রহসনে পরিণত। প্রচলিত নির্বাচন পদ্ধতির প্রয়োগকৌশল এ দুটি রাজ্যে মার্কসবাদীদের শাসন অনড় করে রাখবে। মার্কসবাদীরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। তারা চায় মানুষের ব্যক্তি সত্তা ও নিজস্ব ঐতিহ্য থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দলীয় একনায়কত্বের কঠোর শাসনাধীনে এক নতুন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে যার ভিত্তি ভ্রান্ত অর্থনীতি ও হিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের আন্তর সংবেদনশীলতা ও সৃষ্টিশীল নিগূঢ় সত্তাকে বিলুপ্ত করে, বিদ্বেষ ও ঘৃণাভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা যে মার্কসবাদের নীতি তা ভারতীয় ঐতিহ্য ভাবনার বিপরীত। মার্কসবাদ মানুষকে বেশি স্বার্থপর ও আত্মকেন্দ্রিক করে এবং আদিম পশু প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করতে শেখায়। সে কারণে ইহাও বিচ্ছিন্নতাবাদ।

পশ্চিম বাংলায় বর্তমানে মার্কসবাদী এবং জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এক অঘোষিত যুদ্ধ চলেছে। মার্কসবাদীদের পিছনে আছে বামফ্রন্ট সরকার এবং জাতীয়তাবাদীদের পুরোভাগে কংগ্রেস (ই)। সরকারী ক্ষমতা হাতে থাকায় মার্কসবাদীরা কিছু বিশেষ সুবিধা পেয়েছে। যার ফলে পাঁচ বছরে পাঁচ হাজারের মত কং (ই) কর্মী ও সমর্থক খুন হয়েছেন। রাজ্য ব্যাপী চলেছে সন্ত্রাসের রাজত্ব। কেন্দ্রের কং (ই) সরকার সব কিছু দেখেও নীরব, নিষ্ক্রিয়।

॥ ঝাড়খণ্ড, নেপালী ভাষী উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্যবাদ ইত্যাদি ॥

উপরোক্ত স্বাতন্ত্র্যবাদী আন্দোলনগুলির মধ্যে ঝাড়খণ্ড আদিবাসী রাজ্য গঠনের দাবি বেশি প্রবল। আসাম ও পানজাবের স্বাতন্ত্র্যবাদীদের স্বার্থরক্ষাকল্পে কিছু রক্ষাকবচের ব্যবস্থা চালু হলে, ঝাড়খণ্ড আন্দোলনকারীদের দাবি নাকচ করা হবে কোন যুক্তিতে? এইভাবে ভারত কি খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যাবে না?

'A person who is religiously enlightened appears to me to be the one

who has to the best of his ability, liberated himself from the fetters of selfish desires and is pre-occupied with thoughts, futings and aspirations to which he clings because of their super-personal value.

In this sense religion is the age-old endevour of mankind to become clearly and Completely conscious of these values and goals and Constantly to strengthen and extend their effect.

"Science without religion is lame."

—Science and Riligion.

॥ বিচ্ছিন্নতাবাদের হেতু ॥

বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎপত্তির পিছনে কোন কোন ক্ষেত্রে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার ও অবহেলার কথা অস্বীকার করা যায় না। তবে সেই অবিচারের মূল অতীতের গর্ভে নিহিত। স্বাধীনতার পর সরকার যে সেই অবিচার ও অসাম্য দূর করতে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট সে কথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। দেশে ও সমাজে অবিচার ও অসাম্য থাকলেই বিচ্ছিন্নতাবাদী হতে হবে এ কেমন কথা! এমন কোন দেশ কোথাও আছে যেখানে অবিচার অসাম্য নেই? বিশ্ব প্রকৃতিই অসাম্যের স্রষ্টা।

"it is false that equality is a law of nature. Nature has made nothing equal." —Vauvenargues.

বিচ্ছিন্নতাবাদ তাই কেবল অর্থনৈতিক কারণ প্রসূত নয়। আরো কিছু আছে তার পিছনে।

১) ব্রিটিশ সরকার আদিবাসী, উপজাতি এবং অনগ্রসর হিন্দুদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তা বিদ্বেষী এবং ব্রিটিশ অনুগত একটি বিশেষ শ্রেণী তৈরী করতে চেয়েছিল। তাদের বিশেষ আর্থিক সুযোগ সুবিধা দিত। ব্রিটিশ যে স্বাতন্ত্র্যের মনোভাব এদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিল বর্তমান বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে তারই প্রভাব।

২) ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের ভেদনীতির জঘন্যতম নিদর্শন। এই আইনে ছিল সাম্প্রদায়িক নির্বাচন প্রথা চালু করে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগের পূর্ব প্রস্তুতি, হিন্দুজাতিকে বর্ণহিন্দু ও তপশিলী হিন্দু দুই শ্রেণীতে ভাগ করে হিন্দু ঐক্য ধ্বংসের চক্রান্ত এবং প্রাদেশিক স্বশাসণ (Provincial autonomy) প্রবর্তন করে আঞ্চলিক স্বার্থ-সচেতনতা জাগিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদের ভূমি তৈরি। বলা বাহুল্য, ভারতীয় সংবিধান এই কুখ্যাত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের উপর ভিত্তি করে রচিত। সেই কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ সংবিধানেই বর্তমান। অধিকন্তু সংবিধান রচনাকারী গণপরিষদের সভাপতি ছিলেন এমন এক নেতা যাঁর হিন্দুধর্ম-বিদ্বেষ এবং জাতীয়তাবাদ বিরোধিতা ইতিহাস-স্বীকৃত।

৩) ব্রিটিশ ধাঁচের গণতন্ত্র এবং আধা ফেডারাল রাজ্যভিত্তিক স্ব-শাসন ব্যবস্থার ব্যর্থতা। নির্বাচনে দুর্নীতির প্রসার, ভোট সংগ্রহের নীতিহীন প্রয়াস এবং রাজ্যভিত্তিক আঞ্চলিকতা বৃদ্ধি জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপদ সৃষ্টি করছে। রাজত্বের অপচয়ও ঘটাচ্ছে।

৪) আদিবাসী, উপজাতি, খণ্ডজাতি এবং তপশিলীদের জন্য বংশভিত্তিক বিশেষ অধিকার, আর্থিক সুবিধা ও রক্ষাকবচের বিধান। অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার ভিত্তিতে বিশেষ সাহায্য দানের পরিবর্তে বংশভিত্তিক বিশেষ অধিকার প্রদান নতুন ধরণের কায়েমী স্বার্থ সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্নতাবাদে উৎসাহ জুগাচ্ছে।

৫) সংবিধানের 'ধর্ম-নিরপেক্ষ' নীতি সম্পূর্ণ ভাবে নেতিবাচক এক ঐহিক দর্শন মনোভাবে জাতিকে আবৃত করেছে, যা জড়বাদী মার্কসবাদের ক্রম বিস্তারের পথ খুলে দিয়েছে। ভারতের মোট জন সংখ্যার শতকরা পঁচাশি ভাগ হিন্দু, হিন্দু ধর্ম অতীতের দুর্যোগঘন দিনে জাতীয় সংহতি রক্ষা করে এসেছে এবং এখনো অসমীয়া, দ্রাবিড়ী, নেপালী ঝাড়খণ্ডী, আকালি প্রভৃতি বিচ্ছিন্নতাপন্থীদের মধ্যে ভারতীয় ঐক্যের একমাত্র সঞ্জীবনী প্রবাহ। সেই হিন্দুধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি না দেওয়া।

সকল বৃহৎ রাষ্ট্রেরই কিছু না কিছু আঞ্চলিকতা আছে। ভারত তার ব্যতিক্রম নয়। তবে আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক কিংবা তান্ত্রিক বিচ্ছিন্নতাবাদকে নিষ্ক্রিয় করে যে চেতনাসঞ্চারী আদর্শ ভাবনা সমগ্র জাতিকে ঐক্যের দৃঢ় বন্ধনে প্রযুক্ত করে রাখে, হিন্দুধর্মকে নির্বাসন দিয়ে তার শূন্য স্থানে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্র তেমন কোন আদর্শ কথায় এবং আচরণে মিল রেখে, জাতির সামনে তুলে ধরতে পারেনি।

এবার প্রতিকার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। উৎপত্তির কারণ বিশ্লেষণের মধ্যে সে এসম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু আভাস দেওয়া হয়েছে।

১) রাষ্ট্রপতি প্রধান গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

২) সংসদের উচ্চ কক্ষের রাজ্যসভা, বিলোপ।

৩) রাজ্য গুলিতে বিধানসভার পরিবর্তে রাজ্যপালের শাসন প্রবর্তন।

৪) প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি এবং লোকসভাকে রাষ্ট্রশক্তির একমাত্র উৎস হিসাবে গ্রহণ। ফেডারাল ধরণের রাষ্ট্রতান্ত্রিক শাসনের বিলোপ।

৫) [illegible] ধর্মের পুনর্বাসন, সে ধর্ম

॥ উপসংহার ॥

বহু খণ্ডজাতি, ধর্ম সম্প্রদায়, ভাষা ও বংশের বৈচিত্র্য অধ্যুষিত দেশ ভারতের পক্ষে ফেডারাল ব্যবস্থা জাতীয় ঐক্য-পরিপন্থী। ইউনিটারি অর্থাৎ কেন্দ্রপ্রধানে শাসন কাঠামোই ভারতের পক্ষে উপযোগী। সে শাসন তন্ত্রের পরিচালককে হতে হবে শক্তি সম্পন্ন।

Liberty too must be limited in order to be possessed—Edmund Burke. এই কথা মনে রেখে শক্তিধর রাষ্ট্র প্রধানের প্রস্তাব রেখেছি। ভারতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় যে ভারতের ভৌগলিক অখণ্ডতা, জাতীয় সংহতি এবং বৈষয়িক উন্নতি তখনই নিবিঘ্ন ছিল, যখন দেশে মৌর্য, গুপ্ত, পাল সাম্রাজ্যের ন্যায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মুঘল ও ব্রিটিশ শাসন বিজাতীয় হলেও, দৃঢ়তার কারণে দেশের ঐক্য সাধনে শক্তি জুগিয়েছিল।

গণতন্ত্রের ভীমরতি ঘটলে অরাজকতা অথবা স্বৈরতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। 'The only remedy against democracy is soldier.' এই জার্মান প্রবাদ তখন বাস্তবমূর্তি পরিগ্রহ করে। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতকে তাই যথাপূর্বে সতর্ক হতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারের ন্যায় বিরোধীদেরও ভূমিকা আছে। কারণ গণতান্ত্রিক কাঠামোতে সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সমবায়ে চলে শাসন ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে মিঃ Disraeli-র একটি কথা স্মরণীয় 'No Government can be long secure without a formidable opposition.' ভারতে বিরোধীদলগুলি নীতিনিষ্ঠ দায়িত্ব সচেতন নয় বলে তারা 'formidable opposition' বা দীর্ঘকাল ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের বিকল্প হতে পারেনি।

সম্পাদকীয়

প্রতীক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল দীর্ঘদিন ধরেই এই রাজ্যের অধিবাসীদের মনে একটা ধারণার সৃষ্টি করে এসেছে যে একবার তাদের পক্ষে ভোট দিয়ে তাদের এই প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করার সুযোগ করে দিলে গৌড়জনের জন্য তারা ধরায় স্বর্গ এনে দেবে। কিন্তু গত সাড়ে পাঁচ বছর এরা ক্ষমতাসীন আছেন। তার ফলাফল বিচার বিশ্লেষণ করলে একমাত্র অন্ধ স্তাবক বা বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত সকলেই অনুভব করছেন যে স্বর্গরাজ্যের পরিবর্তে এই রাজ্যে একটি জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হতে চলেছে। পশ্চিমবাংলাকে যেভাবে জাতীয়ের সর্বনাশের অতলতলে নিয়ে যাচ্ছে তাতে বাঙ্গালীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে চলেছে নিশ্চিতভাবে।

আইন শৃঙ্খলার অবস্থা শোচনীয়। ইজ্জত ধন, মান জীবন ভয়ঙ্করভাবে বিপন্ন। শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নৈরাজ্য সৃষ্টি করে বাঙ্গালী জাতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তোলা হয়েছে। দলবাজীর খাতিরে অপরাধীদের কোন সাজা দেবার ব্যবস্থা নেই। পরন্তু তাদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে নিছক দলবাজীর খাতিরে। গ্রাম পঞ্চায়েৎগুলিতে কোটি কোটি টাকা অনবরত হচ্ছে। ছুরির দায়ে ধরা পড়লেও, দলীয় স্বার্থের জন্য প্রশাসনযন্ত্র উদাসীন, নীরব, নিষ্ক্রিয়। এদের দৌরাত্ম্যের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে পুলিশ কর্মচারীরা পর্যন্ত নিহত হচ্ছেন, সাংঘাতিকভাবে আহত হচ্ছেন সে ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের তরফ থেকে কেউ প্রতিবাদ করলে তাদের কি অবস্থা হবে সহজেই অনুমেয়।

অর্থনৈতিক অবস্থা কতটা শোচনীয় হয়েছে, এবং এই ধস বন্ধ করতে না পারলে, আরো কতটা অসহনীয় হবে, তা বুঝতে কোন অসাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয়না। নিজেদের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে এই রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা প্রায় দেউলিয়া পর্যায়ে নেমে আসছে। আয়ের কোন হিসাব না করে সস্তা হাততালি পাবার লোভে এবং দলীয় স্বার্থ কায়েম করতে বে-হিসাবীভাবে খরচের অঙ্ক বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। একবারও এরা ভেবে দেখেনি যে এই খরচপত্র কিভাবে সঙ্কুলান হবে এবং একাজ করলে জনগণের অর্থ-নৈতিক দুর্দশা কতটা বেড়ে যাবে। যদি একাজ উৎপাদন ভিত্তিক পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য ব্যয়িত হত, ঠিকভাবে কাজ চললে আজ হোক, কাল হোক একটা সুফল পাবার আশা থাকত। কিন্তু খরচের একটা সিংহ-ভাগ ব্যয়িত হচ্ছে অনুৎপাদক খাতে এবং সেটা জনগণের কল্যাণের জন্য নয়, পরের কষ্টার্জিত পয়সায় মুষ্টিমেয় দলবাজদের স্বার্থসাধনের জন্য। কিন্তু অর্থনীতির নিয়মানুযায়ী এর বিষম প্রতিক্রিয়া হতে বাধ্য এবং ক্রমশই সেটা প্রতিভাত হচ্ছে। যদি কোন লোক, নিজের সামর্থ্যের বাইরে যেয়ে এলোপাথাড়ি খরচ করে, তবে সে একটি বেকুব বলে চিহ্নিত হয়। প্রশাসক দের সম্বন্ধে একথা বললে তারা ষড়যন্ত্রকারী বলে আখ্যাত করবে প্রতিবাদকারীদের।

কিন্তু নিছক দলীয় স্বার্থ সচেতন প্রশাসক-দল যাই বলুক না কেন, অবস্থার কোন হের ফের হবেনা তাতে। বরং জনগণের দুর্দশা যে ক্রমাগত বেড়েই চলবে, তার নিশ্চিত আভাস মিলতে সুরু করেছে। কোটি কোটি টাকা কর্মচারীদের পারিশ্রমিক দেওয়ার ফলে রাজ্যের অর্থ ভাণ্ডারও প্রায় শূন্যের কোঠায় দাঁড়িয়েছে। কর্মচারীদের সুখ সুবিধা দেখা হবেনা এটা কারো বক্তব্য নয়। কিন্তু সামর্থ্যের হিসাব না করে, শুধু বাহাদুরী দেখাবার জন্য কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও মহার্ঘভাতা বাড়িয়ে দিলে, শিল্প, কৃষি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকক্ষেত্রে অভাব ঘটে, এই সামান্য বুদ্ধিটুকুর যদি না থাকে এদের, তবেত দারুণ উদ্বেগ সৃষ্টি হতে বাধ্য। কর্মীরা কাজ করবে না, অথচ ক্রমবর্দ্ধমান হারে সুবিধা সুযোগ ভোগ করবে, এটা চলতে থাকলে শেষপর্য্যন্ত সাধারণ মানুষের পকেট মারা ভিন্ন কোন উপায় থাকেনা। বামফ্রন্টের সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি সমীক্ষা করলে, এই সত্যই প্রমাণিত হবে।

বাসের ভাড়া, বিদ্যুৎ-এর হার বাড়াতে এরা বাধ্য হচ্ছেন। কারণ কোটি কোটি টাকা ভরতুকি দিয়ে আর কতদিন ঠাট বজায় রাখা যায়? প্রস্তাবের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবেনা উৎপাদন ও কার্যক্ষমতা বাড়াবার প্রচেষ্টার কোন প্রতিশ্রুতি। দুধের দাম বাড়াতে যেয়ে একটু থমকে গিয়েছেন এরা, যদিও এ সম্ভাবনাকে প্রতিহত করার কোন ক্ষমতা এদের নেই। শেষ পর্য্যন্ত বাড়বেই, তবে ধীরে সুস্থে, একটু একটু সইয়ে নেবার পর। একটা ধোকা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে যে দুধের সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত না করে একাজ করা হবেনা। তবে যানবাহনের অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন ও বণ্টনের শোচনীয় ব্যর্থতা থাকা সত্ত্বেও এইখাতে মূল্যমান বাড়ান হল কেন? যত আজে বাজে কৈফিয়ৎ দেওয়া হোকনা কেন, মৌলিক কারণ একই। ভাড়ার শূন্য। এরা বোধহয় ভুলে গিয়েছেন যে একপয়সা ভাড়া বাড়াবার জন্য, এরাকি অপকর্ম করেছিলেন সে দিন।

এটা হল, যাকে চল্‌তি কথায় বলে, সবে সুরু। এখানেই এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান ঘটান আজ প্রায় শিবেরও অসাধ্য ব্যাপারের রূপ নিচ্ছে। এদের অযোগ্যতা, অপদার্থতা, জনস্বার্থের প্রতি উদাসীনতার বোঝা আজ সাধারণ মানুষকে বইতে হবে রক্তদিয়ে।

হাওড়া সেতুর কাজ ব্যাহত হচ্ছে টাকার অভাবে। কোন নতুন শিল্প গড়ে উঠছেনা; যার ফলে বেকারীত্ব ভয়াবহভাবে বেড়েই চলেছে। এই বামফ্রন্ট সরকারের জনদরদের নমুনা? এই তাদের নেতৃত্বের উৎকর্ষতার পরিচয়? এরা মনে হয় চারিদিকে একটা নৈরাশ্যের ছবি দেখতে পাচ্ছে। তাই "এলো মেলো করে দে মা লুটে পুটে খাই" নীতি অনুসরণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এটা হচ্ছে, 'জল ঢেলে ফুটা-পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার' মত একটা হাস্যকর মানসিকতা।

এই পরিস্থিতির আমূল পরিবর্ত্তন না করতে পারলে, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব মুছে যাবে। কোথায় গলদ, কোথায় ত্রুটি, কিভাবে সেগুলি সংশোধন করে একটা সুস্থ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলা যায়, সে দিকে প্রশাসকদলগুলির কোন দৃষ্টি নেই। অথবা যে ফ্রাঙ্কেনষ্টাইন এরা সৃষ্টি করেছে, সেই দৈত্য আজ মুখব্যাদান করে

এদের গিলতে আসছে, সেজন্য সুকৌশলে সব দোষ কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিয়ে মুখরক্ষা করার শেষ কৌশল অবলম্বন করছে।

এটা বিশ্বাস করতে পারিনা যে রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্বামীবিবেকানন্দ ঋষিঅরবিন্দ, আচার্য্যজগদীশচন্দ্র, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী, নেতাজীর মত মহামানব প্রসবিনী বঙ্গমাতা আজ বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছেন। বাংলার কংসে কারায় কি কংস হন্তার আবির্ভাব হবেন? বিপ্লবের পীঠস্থান বাংলায় কি সবই "নিতে যাওয়া ভলকানো, ভাজা ভিসুভিয়াস" কেউ নেই -

আমরা শুধু অবাক বিস্ময়ে ভাবছি যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি, রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন বাঙ্গালীরা কি এই ধ্বংসযজ্ঞের নীরব দর্শক হয়েই থাকবেন? বাঙ্গালী জাতির মুক্তিদাতার আশু আবির্ভাবের প্রতীক্ষা করাই এবং তাকে স্বাগত জানিয়ে বলতেচাই, "তোমার আসন শুন্য আজি, হে বীর পূর্ণকরো।

॥ বিচ্ছিন্নতাবাদ কি ও কেন ॥

(১৪পৃ: পর)

গণতন্ত্রের পবিত্র ভাবমূর্তি ভারতে যে ভাবে ভোটতন্ত্রের ভেলকি বাজিতে পরিণত হতে চলেছে, তাতে অনকার ওয়াইল্ডের পরিহাসপূর্ণ কথাটাই মনে পড়ে—'গণতন্ত্র হল জনগণের জন্য, জনগণ কর্তৃক, জনগণের মাথার ওপর মাথামোটা বেঁটে লাঠির রাজত্ব।'

যা বলা হল এতক্ষণ তা একটি বিপ্লবী মনের ভাবনা চিন্তা ছাড়া আর কিছু নয়। বিপ্লবী পরাজয় স্বীকার করতে জানে না। সে চির আশাবাদী। তাঁর অন্তরে তাই প্রতিক্ষণ ধ্বনিত হচ্ছে সেই মহাবাণী—'এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিচ্ছিন্ন ভারত বেঁধে দেব আমি।' ধর্ম কুসংস্কার নয়, জীবনের অমৃত। ধর্ম বিজ্ঞানের শত্রু নয়। বর্তমান বিশ্বের বিজ্ঞানীপ্রবর এলবার্ট আইনস্টাইনের উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

দার্শনিক এডওয়ার্ড ইয়াং আরো একটি চমৎকার কথা বলেছেন এ সম্পর্ক। By night an atheist half believes God.'

আর একটি বক্তব্য দিয়ে শেষ করছি—দেশবাসীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হতে বসেছে যে, সহজ কথায় তা যত যুক্তিসম্মত হোক না কেন, সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় না। বৈধ আন্দোলনেও ফল হয় না। সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে চাই প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন, বনধ্ পালন, ট্রামবাস ট্রেনের ক্ষতিসাধন, পথ অবরোধ এবং পরিশেষে প্রাণহানি। এই সর্বনাশা ধারণা কি সরকারের দূরদৃষ্টি ও দৃঢ়তার অভাবের কারণে গড়ে ওঠে নি? নাশকতামূলক ঘটনার পর সরকার যদি পিছু হটেন, আপসের জন্য ব্যগ্র হন এবং হাঙ্গামাকারীদের দাবি মেটাতে এগিয়ে যান, তাহলে তাকে কি ধরণের রাষ্ট্রনীতি বলা চলে? লক্ষ্যহীন, সুচিন্তিত ইতিকর্তব্য-বর্জিত রাষ্ট্রনীতি কি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিস্তারে শক্তি জুগাচ্ছে না? এই নীতির আশু প্রতিবিধান চাই।

লিয়নেদ ব্রেজনেভ

'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ,
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায় কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।'

সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট রুশ রাজনীতির দক্ষ পরিচালক লিওনিদ ব্রেজনেভ গত ১০ই নভেম্বর ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৫। গত ১৮ বছর কাল তিনি ছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অবিসংবাদী নেতা। ১৯৬৪ সাল থেকে ব্রেজনেভ রুশ কমিউনিষ্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক। লেনিনের বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রকৃত উত্তরসূরী ও শান্তির একনিষ্ঠ প্রবক্তা লিওনিদ ব্রেজনেভ কেবল মাত্র সোভিয়েত রুশের নয়, সকল কালের সকল দেশের গৌরবোজ্জল সফল রাষ্ট্রনায়কদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

ব্রেজনেভ একজন হটাৎ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রনেতা ছিলেন না। রুশ বিজ্ঞান একাদেমির বিশিষ্ট ইনজিনিয়ার ব্রেজনেভ সাধারণ দলীয় কর্মী থেকে অভিজ্ঞতা, অধ্যবসায় এবং আদর্শ নিষ্ঠার বলে ক্ষমতার উচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর অসামান্য প্রতিভা উপরে ওঠার দরজাগুলি তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এ ক্ষেত্রে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে তিনি অনন্য এবং উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

মস্কোয় উদিত হওয়ার আগে জন্মস্থান ইউক্রেন প্রদেশ নেতা এবং জার্মাণীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অগ্রণী সৈনিকের ভূমিকা ব্রেজনেভকে খ্যাতির আসনে প্রতিষ্ঠিত করে। যুদ্ধ শেষে তাঁর পদ ছিল মেজর জেনারেলের। যুদ্ধ বিধ্বস্ত রাশিয়ার পুনর্গঠনে তিনি শিল্প ও কৃষি বিভাগের সার্থক সংগঠক রূপে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। ব্রেজনেভ তাঁর বহুমুখী সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ লাভ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্মানগুলি—অরডার অব লেনিন, অরডার অব রেড ব্যানার, অর্ডার অব রেড স্টার, অর্ডার অব আলেকজান্দার নেভস্কি ইত্যাদি পদক।

স্তালিনের বজ্র কঠোরতা এবং ক্রুশ্চেভের বল্গাহীন আচরণের মধ্যে লিওনিদ ব্রেজনেভ ছিলেন বাস্তববাদী সমন্বয় সাধক। সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৯৭৭ সালের সংশোধিত সংবিধান তাঁর প্রগাঢ় রাষ্ট্রনীতি জ্ঞান, সমাজতন্ত্রের তাৎপর্যবোধ এবং মানবিক উপলব্ধির ঐতিহাসিক অবদান। দেশের অভ্যন্তরে তিনি যেমন শান্তি ও সহনশীলতার নীতি গ্রহণ করে কমিউনিস্ট সমাজ ব্যবস্থায় এক স্থিতিশীল শক্তি এনেছিলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তিনি সমঝোতা ও শান্তির নীতি অনুসরণ করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনাকে দূরে ঠেলে দিতে সফল হয়েছিলেন। হেলিসিংকি সম্মেলন ব্রেজনেভের শান্তি নীতির অন্যতম দৃষ্টান্ত।

শান্তি সমঝোতা দুর্বল বাকসর্বস্ব রাজনীতিকের দ্বারা যে সম্ভব নয় সে সত্য লিয়নিদ ব্রেজনেভ ভাল করে বুঝতেন এবং সেই কারণে অস্ত্র প্রতিযোগিতা, বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন এবং কূট কৌশল প্রয়োগে তিনি কখনো শিথিলতা দেখান নি। ফলে ব্রেজনেভের নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়া বিশ্বশান্তির প্রচণ্ডতম শক্তিশালী প্রতিরক্ষক হয়েছে। যুদ্ধবাজ ধুরন্ধর রাষ্ট্র নায়করা সেই কারণে বড় রকমের যুদ্ধ বাধাতে দ্বিধাজড়িত, শঙ্কিত।

রাশিয়া কর্তৃক আফগানিস্থানে সৈন্য প্রেরণ নিয়ে অনেকেই অনেক কথা বলেন। তাদের অনেকেই একদেশদর্শিতার দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টি ব্যাখ্যা করে

থাকেন। বস্তুত: আফগানিস্থানে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপ একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক চক্রান্তের জালে বিস্তারে যথাপূর্ব প্রতিরোধ ব্যবস্থা। চক্রান্তটি পশ্চিম এশিয়ায় যে সংঘর্ষের ক্ষেত্র তৈরি করতে উদ্যত হয়েছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্ত অঞ্চল উত্তপ্ত করেছিল, তাকে প্রতিহত করে স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে আফগানিস্থানের অনুরোধে সেখানে সৈন্য প্রেরণ অসঙ্গত বলে মনে করার কোন হেতু নেই। উত্তপ্ত এলাকা থেকে চক্রান্তকারীরা হাত গুটালেই সোভিয়েত রাশিয়া সৈন্য সরিয়ে নেবে এই ঘোষণার মধ্যেই রুশীয় শান্তির নীতি সুপরিস্ফুট। সোভিয়েত ইউনিয়ন আফগানিস্থানকে গ্রাস করতে চায় না। সে কথাও রাশিয়া বার বার বলেছে।

কার্য কারণ সম্বন্ধ বিচার না করে আফগানিস্থানে রাশিয়ার সামরিক হস্তক্ষেপকে একতরফা ভাবে নিন্দাকরা কিংবা তাকে আগ্রাসন বলা অযৌক্তিক। পক্ষান্তরে এই বলিষ্ঠ পদক্ষেপ প্রয়াত নেতা ব্রেজনেভের রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির গভীর জ্ঞানের পরিচয় বহন করে।

লিওনিদ ব্রেজনেভের আকস্মিক প্রয়াণে ভারতের সকলেই দলমত নির্বিশেষে গভীর শোক প্রকাশ করেছে। কারণ তিনি ছিলেন ভারতের অকৃত্রিম সুহৃদ। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী ঐতিহাসিক প্রয়োজনের ভিত্তির উপর রচিত, তথাপি ব্রেজনেভের নেতৃত্বকালে রুশ-ভারত মৈত্রী ও সহযোগিতা কেবল একটা কূটনৈতিক দলিলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা একটি সজীব ও ক্রিয়াশীল সহমর্মিতার বন্ধনে পরস্পর শ্রদ্ধার ভিত্তিতে এবং বিকাশমুখী সহযোগিতায় দুটি বড় রাষ্ট্রের মানুষকে, মতবাদের বিভিন্নতা সত্ত্বেও, ঘনিষ্ট করেছে। যা নিঃসন্দেহে বিশ্বের শান্তি ও সহাবস্থানকে অনেকখানি বিপদমুক্ত করেছে।

লিওনিদ ব্রেজনেভের মত সফল রাজনৈতিক জীবনের দৃষ্টান্ত ইতিহাসে কমই আছে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে জীবনের রথ এগিয়েই চলেছিল কোনদিন থেমে থাকে নি কিংবা পিছনে হটে নি। তিনি কমিউনিস্ট এবং অ-কমিউনিস্ট উভয় দুনিয়ার মানুষেরই আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি পেয়েছেন জীবনে ও জীবনের অবসানে। ব্রেজনেভের মনোবাসনা ছিল পৃথিবীতে এমন একটি যুগের সম্ভবনা জীইয়ে তোলা যেখানে জাতিগত বিভেদ ও বিরোধের পরিবর্তে, সমঝোতা ও সৌভ্রাতৃই হবে বিশ্ব নীতি। সেই জন্য তাঁর বুদ্ধিমত্তা ও কূটকৌশলে রাষ্ট্রপুঞ্জ বার বার সংকট কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

ব্রেজনেভের মৃত্যুর পর তাস সংবাদ সংস্থা তাঁকে যে লেনিনের যোগ্য উত্তরাধিকারী বলে স্বীকৃতি জানিয়েছে তার মধ্যে মরণোত্তর ভাবাবেগ অথবা অতিরঞ্জন ছিল না। ব্রেজনেভ সত্যই ছিলেন তাই। ১৯ বছর সোভিয়েত রাশিয়ার কর্ণধার ছিলেন। তারপর ব্রেজনেভ রাষ্ট্রের হাল ধরলেন ১৮ বৎসর ধরে। রাষ্ট্রনায়কের শাসন পদ্ধতিতে পার্থক্য থাকলেও এঁরাই হলেন সোভিয়েতের দৃঢ়স্থিতি ও শক্তিবৃদ্ধির জনক। স্তালিন সোভিয়েত রাষ্ট্রনীতিকে জাতীয় স্বার্থের বুনিয়াদের উপর স্থাপিত করেছিলেন ব্রেজনেভ সহ স্তালিনের উত্তরসূরীরা সেই নীতিকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ব্রেজনেভের মৃত্যুর সঙ্গে একটি যুগের অবসান হল, যারা মনে করেন তাদের ধারণাকে সমর্থন করা যায় না। সোভিয়েত রাশিয়া চলে কয়েকটি

মৌলনীতির উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিত্ব যত বড়ই হোক এই মৌল নীতিগুলি তার চেয়েও বড়। ব্রেজনেভের স্থান যিনি গ্রহণ করেছেন সেই আনদ্রোপভ ও অভিজ্ঞ রাজনীতিক এবং তাঁর শাসন আমলে রুশ রাষ্ট্রনীতিতে কোন বড় রকমের রদবদল হবে এমন আশা করাকে অলীক কল্পনা বলতে হয়। তাছাড়া যৌথ নেতৃত্বের শৃঙ্খলা ও দায়িত্ব আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী সম্পর্ক ঐতিহাসিক কারণে সংগঠিত। ভারত সোভিয়েত গ্রহ-মণ্ডলের উপগ্রহ নয়। সুতরাং এই বন্ধুত্ব দুই স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের পরস্পর প্রয়োজন ভিত্তিক। তাঁবেদারির কোন ছাপ নেই এই মৈত্রীতে। ভারত চায় এই মৈত্রী সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হোক এবং বর্তমান সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়ক আনদ্রোপভের শাসনকালে তা আরো দৃঢ় ও বিস্তারশীল হোক। তাহলেই প্রয়াত রাষ্ট্রনেতা লিওনিদ ব্রেজনেভের স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান জানানো হবে।

— কালীপদ সরকার

পরলোকে প্রবীণ বিপ্লবী কেদারনাথ সমাদ্দার

প্রবীণ বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামী কেদারনাথ সমাদ্দার গত ১লা নভেম্বর ৮২ বরিশাল (বাংলাদেশ) এর হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। গুরুতর পীড়িত অবস্থায় গত ২০শে সেপ্টেম্বর তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর।

প্রাক স্বাধীনতাযুগের রক্তঝরা সংগ্রামের দিনে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রথমে কেদারনাথকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। পরবর্তীকালে বিপ্লবী নেতা সতীন্দ্রনাথ সেনের আহবানও তাঁকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। বরিশালের বিভিন্ন জেলে, হিজলী ও দেউলী বন্দীশিবিরে—এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তানী কারাগারে তিনি বিশবছরেরও অধিক সময় কারাবাস করেন। শাসকের রক্তচক্ষু এই অদম্য বিপ্লবীর সংগ্রামী চেতনাকে স্তব্ধ করতে পারেনি, তাঁর প্রয়াত আত্মার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই ও পরিজনদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

প্রথম সত্যাগ্রহী

মলয় ঘোষ

আচার্য বিনোবা ভাবের মহাপ্রয়াণ এই শতকের একটি অন্যতম প্রধান ঘটনা। মহাপ্রয়াণ না বলে একে ইচ্ছামৃত্যু বলাই সংগত হবে। আচার্য তাঁর অস্তিত্বরক্ষার প্রয়োজনকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন, তাই অনশনের মাধ্যমে জাগতিক রক্তমাংসের শরীরকে পরিত্যাগ করে, নিজেকে মিলিয়ে দিলেন মহা জাগতিক আবর্তনের সঙ্গে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী, যিনি আচার্যের অত্যন্ত প্রিয়পাত্রি ছিলেন, তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধও এই দধীচির আত্মহনন রোধ করতে পারেনি। বিনোবা ভাবের মহাপ্রয়াণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় একটি ঐতিহ্যের অধ্যায়ের অবসান হলো।

১৮৯৫ সালের ১২ই সেপ্‌টেম্বর মহারাষ্ট্রের কুলাবা জেলার এক ব্রাহ্মণ পরিবারে বিনায়ক ভাবের জন্ম। বরোদায় ছাত্রজীবনে কৃতি ছাত্র হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল। এই সময় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের আদর্শ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। গান্ধী-মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে ১৯২১ সালে তিনি ওয়ার্ধায় 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৩ সালে নাগপুরে সত্যাগ্রহ করার দরুণ তাঁর ছমাসের কারাবাস হয়। হরিজনদের দাবী আদায়ের সংগ্রামে ১৯৪০ সালে ও ১৯৪৯-এ তিনি আবার মোট সাড়েতিন বছরের কারাভোগ করেন। ১৯৫১তে বিনোবার নেতৃত্বে ভূদান যজ্ঞ সারাদেশে আলোড়ণ সৃষ্টি করে। সুদীর্ঘ ১৩বছর ধরে মোট ৪০,০০০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করে তিনি ৪৫লক্ষ একর জমি ভূমিহীনদের মধ্যে দান করেন। আমার ভাণ্ডার আছে ভরে, তোমাদের সবাকার ঘরে'—বিশ্বকবির এই বাণী ছিল বিনোবার—ভূদানযজ্ঞের মূল আদর্শ। ১৯৫১ সালে তেলেঙ্গানার কমিউনিস্ট আন্দোলনের রক্তঝরা দিনগুলিতেও তিনি তেলেঙ্গানার বুকে ভূদান যজ্ঞের গতি অব্যাহত রেখেছিলেন।

গান্ধীজীর সাবরমতী আশ্রমে আশ্রয় গ্রহণ করে বিনোবা ঐতিহাসিক ডাণ্ডী মার্চের সহায়ক আন্দোলন হিসাবে ওয়র্ধায় আন্দোলন গড়ে তোলেন। ১৯৩৮এ প্রতিষ্ঠিত হলো 'পউনার আশ্রম'—যেটিকে বিনোব ভাবের ব্রত ও আদর্শের পাদপীঠ বলে বর্ণনা করা যায়। ধাম নদীর তীরে এই আশ্রমে বসেই তিনি বিশ্বের একাধিক ভাষা শিক্ষা করেন। পদযাত্রাকালে মধ্যপ্রদেশের চম্বল উপত্যকার দস্যুসর্দার মানসিং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল—মানুষের চরিত্র পরিবর্তন এর গান্ধীনীতির এতো-বড়ো বাস্তব প্রয়োগ খুবই বিরল।

১৯৬৫ সালে দক্ষিণ ভারতের হিন্দী ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে রক্তক্ষয়ী ভাষাদাঙ্গা শুরু হয়, বিনোবার অনশনের ফলে সেই দাঙ্গা প্রতিহত হয় এবং সরকারী নীতিও পরিবর্তিত হয়।

১৯৭৪ এ তিনি মৌনব্রত গ্রহণ করেন, ১৯৫৭ এ লেখা ছেড়ে দিলেন। ১৯৭৬এ শুরু হয় গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন। কেরল ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সব রাজ্যেই গোহত্যা নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু ঐদুটি রাজ্যেও গোহত্যা বন্ধের জন্য বিনোবাজী অনশনের সিদ্ধান্ত নেন—তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে সেই অনশন প্রত্যাহৃত হয়।

গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সত্যাগ্রহের গান্ধীবাদী বলতে মুষ্টিমেয় মানুষের মধ্যে আচার্য বিনোবা ভাবের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। আদর্শনিষ্ঠ, সত্যানুরাগ, মানবপ্রেম ও নিবেদিত জনসেবায় তাঁর জীবনচর্চার উপকরণ ছিল। সত্যাগ্রহ তাঁর কাছে রীতিরক্ষার নিয়মমাত্র ছিলনা, এটি ছিল তাঁর জীবনধারণের লক্ষ্য। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাকেই বাস্তবে প্রয়োগ করতেন। ঈশ্বরের প্রতি অগাধ বিশ্বাস তাঁর সমগ্র জীবনকে ঘিরে ছিল। একাধারে স্বাধীনতা সংগ্রামী, বিশিষ্ট ভাষাবিদ ও অনেক সংগ্রামের অক্লান্ত নায়ক তাঁর জীবিতকালেই তাঁকে দেশবাসীর কাছে কিংবদন্তীর নায়ক করে তুলেছিল। কিন্তু প্রচারের মোহ তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। বরং প্রচারবিমুখতাই তাঁকে বরণীয় করেছিল—বর্তমান যুগে যার উদাহরণ বিরল। মহাত্মাগান্ধীর ভাষ্যে প্রথম সত্যাগ্রহী বিনোবাজী সত্যাগ্রহের মাধ্যমেই স্বাভাবিক মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

একে একে নিভিছে দেউটী

অবিভক্ত বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন অল বেঙ্গল ষ্টুডেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশনের (ABSA) অন্যতম মূল সংগঠক বিপ্লবী সুধীন মজুমদার আর আমাদের মধ্যে নেই। অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে গিয়ে ঘাতকের নির্মম ছুরিকাঘাতে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে।

অকুতোভয় এই বিপ্লবীর সমগ্র জীবন ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত। পরাধীন ভারতবর্ষে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। দেশের ছাত্রশক্তিকে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে ১৯২৮ সালে অন্যান্য সহকর্মীর সাথে গড়ে তুলেছিলেন ABSA-এর মতো শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও এই আপোষহীন বিপ্লবীর সংগ্রামী চেতনা তাঁকে নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রার দিকে আকৃষ্ট হতে দেয়নি। সামাজিক বিবিধ অন্যায় ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি বার বার রুখে দাঁড়িয়েছেন। ট্রেন ডাকাতি প্রতিরোধ করতে গিয়ে একাধিকবার তাঁর জীবন বিপন্ন হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত এইরূপ একটি ঘটনাই এই অদম্যসাহসিক বিপ্লবীর জীবনের উপর ছেদ টেনে দিল। তাঁর এই আকস্মিক মহাপ্রয়াণ সমাজ, জাতি ও দেশের পক্ষে এক নিদারুণ ক্ষতি। বর্তমান সমাজে সর্বস্তরে চরম অবক্ষয়ের মধ্যে এই ধরণের কিছু মানুষই আমাদের মুখগুলিকে বহন ক'রে নিয়ে যান। প্রয়াত বিপ্লবীর অমর আত্মার শান্তি কামনা করি ও পরিজনদের জানাই সমবেদনা।

Dist—Bankura

Kabiraj Smt Nirmala w/o Late Bhabataran Kabiraj, Tilori

Mondol Smt Bhutibala w/o Late Amiya Ratan, Chan

Dist—Birbhum

Ghosh Smt Maya (Self Freedom Fighter) Rampurhat

Dist—Midnapore

Dinda Smt Alaka Sundari w/o Late Bibhuti Bhusan Gopalchak

Ghorai Smt Barada Sundari w/o Late Chandi Charan Dayaldasi

Gole Rash Behari, Haria

Maity Smt Niroda Bala w/o Lete Debendra Lal Anandapua, Moyna

Maity Smt Surabala, Tulantapara

Manik Smt Daksbyani w o Late Gunadhar Deuly

Bradhan Smt Bishunpriya w/o Leat Ramesh Chandra, Ramnagar

Sanki Smt Jamini Bala w/o Late Kanai Lal, Changra

Sinha Smt Kadambini w/o L Bhabesh Chandra D. Danka

Sinha Nandalal, Judges Court Compound, (Midnapore Town)

Dist—Purulia

Roy Sasanka Sekhar, Manguria

Dist—Malda

Chaudhuri Smt Kamala w/o Late Satyendra Kumar, Malda

Dist—Cooch Behar

Bhattacharji Smt Jyostana w/o Late Shyam Kamal, Cooch Behar

Sarkar Smt Sarada w/o Late Rabindra, Elajaner Kuthi Cooch Behar

Dist—Unspecified

Das Gupta Smt Phulrani w/o Late Sushil Chandra

Sarkar Jyotirindra Mohan

Sarkar Smt Santwana w/o Late Anil Krishna

Regd. No. N. 24511/71
DAVP—Regd
Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
P. Regd. WB/NC 77
বার্ষিক ৬৫.—মাশুল ১৮.০০ টাকা
বার্ষিক :—১০.০০ টাকা
মূল্য—৩০ পয়সা

30

সওয়া সের গমের পাকচক্র

[illegible] সওয়া সের গমের' না-কি শুধু সাধুসন্তদের জন্য একজন পুরোহিতের কাছ থেকে সওয়া সের গম ধার নিয়েছিলেন। প্রতি ফাল্গুন মাসে যখন ফসল কাটার সময়ে পুরোহিতের একটি বাড়তি গম নিয়েও দেখে তার দেনার হিসাব মেটে না। পুরোহিত ধনবান মহাজন হয়ে ওঠেন এবং নানা পাকেচক্রে সওয়া সের গমের দাম চক্রবৃদ্ধি হারে এসে দাঁড়ায় ৬০ টাকা। তবুও সরকারের নিজস্ব মেটে কারণ হাতিনি সরকারের মাথায় ৯২০ টাকা ঋণের বোঝা চেপেছে। সারা জীবন পুরোহিতের খোশামদি করেও ঋণের ঋণের বোঝা নিয়েই মারা যায়। [illegible] সত্য ঘটনা।

- এইসব দুর্ভাগাদের মুক্তির জন্য ১৯৭১ সালে আইন করা হয়। মহাজনদের হাত থেকে এই সামান্য মকুবের বিজ্ঞপ্তি সওয়াসেরে শেষ কথা নয়। ওদের জন্য নতুন কারবারও তো ব্যবস্থা করতে হবে।
- ১৯৮০-৮১ সালে ১ লক্ষ ২১ হাজার সালবন্দ মজুরদের মধ্যে ১ লক্ষ ১ হাজার জনকে নতুন কাজ দেওয়া হয়েছে।
- এরই সঙ্গে সঙ্গে জমা যারা বেকার তাদের জন্য গণপাগল, দুর্বিপাগল, মজুর চাষ আর ক্ষেপণ শিল্প উৎপাদন ইত্যাদি চালু করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বহু পরিকল্পনার এইসব ক্ষেত্রগুলির জন্যে ৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হবে।
- ক্ষেতমি জমির ভূমিহীন কৃষকদের জন্যে ন্যূনতম মজুরী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এই ন্যূনতম মজুরী জমির বাইরেই থাকবে।

[illegible] বিনামূল্যে জমা নীচের কুপনটি ভরে পাঠিয়ে দিন।

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible] নাম _____
ঠিকানা _____
_____ পিন _____

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

আর্থিক সমতা আনার যে স্বপ্ন তা পূরণ করতে হলে সবদিকে [illegible]

সম্পাদক—শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী, সম্পাদকমণ্ডলী—সর্বশ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি) কালীপদ সরকার, পুষ্প চ্যাটার্জী, কামাখ্যা রায়, মলয় ঘোষ। প্রকাশক ও মুদ্রক—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত, দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—শ্রীবারীন ঘোষ, বেহালা—শ্রীনন্দগোপাল পাল।

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

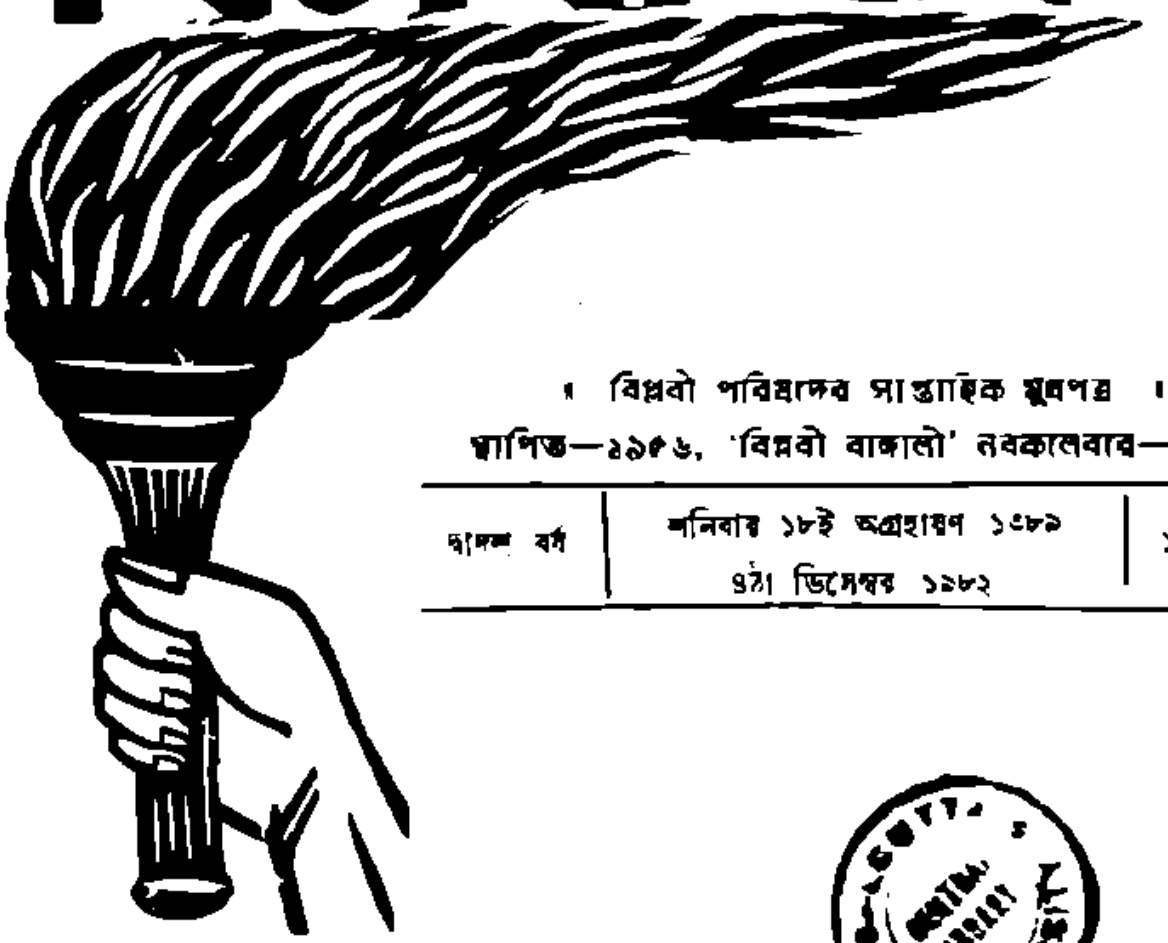

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবরে—১৯৭৯

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৮২	১০ম সংখ্যা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

নবযুগ আসে বড়ো দুঃখের মধ্য দিয়ে। এত আঘাত এত অপমান বিধাতা আমাদের দিতেন না, যদি এর প্রয়োজন না থাকত।

—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদকীয়

শোচনীয় অবস্থা

বিগত কিছুদিন যাবৎ পশ্চিম বাংলায় কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে লঘু করে দেখা চলে না। একটু গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করলে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে এদের মৌল কারণ একটিই। সেটা হল আইন শৃঙ্খলার চরম অবনতি, যা-খুসী তাই করার মানসিকতা ও তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই নেওয়া হবে না। এই বিশ্বাস, দলীয় আশ্রয় এবং প্রশ্রয় পাওয়া যাবেই বলে একটা ভরসা। প্রশাসক দলগুলি যে এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কোন মোকাবিলাই করতে পারছে না, এই সত্যটি পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। দেশের মধ্যে অপরাধপ্রবণ মানুষ অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে, এটা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু গভীর উদ্বেগের কারণ হয়েছে যেটা সেটা হল প্রশাসকেরা এদের সংযত করার কোন প্রচেষ্টা করছেন না। বরং সব ব্যাপারটাকেই অত্যন্ত লঘু করে দেখা এবং এই সমস্যার উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে, মানুষকে ধোকা দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করছে এসব ব্যাপার অতি তুচ্ছ এবং এজন্য ভাবনা চিন্তার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক নেতাদের কৌশলকে অভ্রান্ত মনে করে, কট্টর দলীয় কাডার ব্যতীত, এই অপপ্রয়াসকে কেউ কাণা কড়িও মূল্য দিতে পারছেনা। এই অশুভ শক্তির কুপ্রভাব আরো কতদূর বিস্তৃত হবে এবং কবে এবং কোথায় এর শেষ, তা বুঝতে না পেরে, জনসাধারণ অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা এবং গভীর উদ্বেগের মধ্যে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছে। দেশের মানুষ ত তাদের বিচার বিশ্লেষণ করার শক্তি, ভালমন্দ বিচার করার ক্ষমতা ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচার বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিতে পারেন না, কোন বিশেষ লোকের একটা বিবৃতির উপর আস্থা স্থাপন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলি কথার তুবড়ি দিয়ে নস্যাৎ করার অপচেষ্টা যিনিই করুন না কেন—তা কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলই হোক বা কোন দলনেতা বা মুখ্যমন্ত্রীই হোন না কেন—মানুষ তাকে নিন্দা করবেই এবং পরিস্থিতির পরিবর্তন দাবী করবেই, কারণ তারা ত কোন দল বিশেষের বা প্রশাসক দলগুলির নিকট বিবেক এবং বুদ্ধিমত্তাকে বাঁধা দেন নি।

কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিলজলার পুলিশ অফিসার খুন, ও বাকইপুরে পুলিশ অফিসারকে বেধড়ক প্রহার করে প্রায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া, এই প্রকার ঘটনাগুলির মধ্যে অন্যতম প্রধান ঘটনা। সি, পি, আই (এম) দলের অন্যতম প্রধান নেতা কান্তি গাঙ্গুলী সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী যে সাফাই গেয়েছেন, তার নজীর খুঁজে পাওয়া শক্ত। বিচার বিশ্লেষণ না করে, তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তার থেকে তাকে বে-কসুর খালাস দিয়ে সার্টি ফিকেট দিলেন কি করে, সেটা দুর্বোধ্য। একথা কোন সুস্থমস্তিষ্ক মানুষ বলবে না যে অভিযোগ উঠেছে বলে, কাউকে কোন তদন্ত না করে ফাঁসী দেওয়া হোক্। তবে সাত তাড়াতাড়ি কোন তদন্ত না করেই তাকে দোষমুক্ত করার প্রচেষ্টাকেও কেউ সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক বলে মেনে নিতে পারেনা।

অতি সম্প্রতি মহাকরণে সরকারী কর্মচারীরা টি, ভি, তে এশিয়ান গেম্‌সের খেলা দেখা নিয়ে যে কাণ্ড করেছেন, তার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে উচ্ছৃঙ্খলতা কোন স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে। কাজকর্ম ফেলে

রেখে সরকারী কর্মচারীরা টি, ভি তে খেলা দেখার জন্য গায়ের জোর খাটাতে পারে, এটা কল্পনা করাও যায় না। অবশ্য এটা অনস্বীকার্য্য, দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থীরা যে ধরণের রাজনীতিকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন, সেটাই আজ বুমেরাং হয়ে ফিরে আসছে তাদের উপর। এদের স্পর্দ্ধা কতদূর যেতে পারে, সেটা বোঝা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে অমান্য করা ও তাকে গালিগালাজ করার মধ্য দিয়ে। অবশ্য কর্মচারীদের সরকারী দলের অনুগামী বলে যারা পরিচিত তারা বিবৃতি দিয়েই খালাস যে তাদের কোন কর্মী একাজ করেনি। বিরুদ্ধদল অনুগামীরাই এ কাজ করছে, সেকথা এখনও পর্য্যন্ত না বললেও, ভবিষ্যতে বলবে কিনা বলা শক্ত। মুখ্যমন্ত্রীকে অপমানিত করেছে বলে সব প্রধান সংবাদ পত্রগুলি খবর ছেপেছে। মুখ্যমন্ত্রী নিজে না বলে, তার দলের অন্যতম প্রধান নায়কের মারফৎ লোককে জানিয়েছেন যে মুখ্যমন্ত্রী অপমানিত বোধ করেন নি। মুখ্যমন্ত্রী উদারতাবশতঃ বা দলের ভাবমূর্ত্তি রক্ষার জন্য এ কাজকে তার প্রতি অপমান-সূচক বলে গ্রহণ না করতে পারেন, সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার যদি হোত তবে সেটা একটা আলাদা ব্যাপার বলে গণ্য হতে পারত। তা ভিন্ন, মান-অপমান বোধ সকলের একই রকমের নাও হতে পারে। প্রশ্নটা হচ্ছে, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদের একটা গৌরব আছে, তিনি যে দলভুক্তই হোন না কেন। সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে যারা একাজ করেছে, তারা যে দলভুক্ত হোক না কেন, তারা গর্হিত কাজ করেছে। তাদের যথাযথ শাস্তি না দিলে, পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে, এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গবাসীদের আশঙ্কা নয়, পুলিশ ও মহাকরণের দায়িত্বশীল ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদেরও এই আশঙ্কা।

তারপর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে। দিল্লীতে সব রাজ্যের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পশ্চিম বাংলার তরফ থেকে যা প্রদর্শন করা হয়েছে, সেটা অত্যন্ত নিম্নমানের। তার দ্বারা পশ্চিমবাংলার মুখে চুণকালি মাখান হয়েছে, এটা এ রাজ্যে প্রত্যেক সুস্থ মানুষ মনে করছেন। এমন কি সি, পি (এম) দলের একজন বিশিষ্ট নেতাও মনে করেছেন এবং কার দোষে এমন ঘটনা ঘটেছে, তার তদন্তও দাবী করেছেন। অথচ পরমাশ্চর্য্য এটাই যে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাকে নস্যাৎ করে দিতে চাইছেন। কিন্তু কেন? তার দলীয় লোকদের মুখোস খুলে যাবে সেজন্য, অথবা পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিকে 'অপ সংস্কৃতি' বলে প্রমাণিত করার আগ্রহে একাজ করা হয়েছে? এটা চরম অযোগ্যতা ও অপদার্থতার নিদর্শন বলেই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের ধারণা বদ্ধমূল হলে, সেটা কি অযৌক্তিক হবে?

প্রধান প্রশ্ন হল, সব কিছু ধামাচাপা দেওয়ার এই অদ্ভুত প্রচেষ্টাই কি সর্বশেষ উত্তর হবে? সর্বক্ষেত্রে এই যে ব্যর্থতার নিদর্শন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে, তাকে আর কতদিন ঢেকে রাখা যাবে এই অপকৌশলের দ্বারা? পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অবাক বিস্ময়ে ভাবছে এই শোচনীয় পরিস্থিতির অবসান কবে এবং কোথায় ঘটবে। ইতিহাস কিন্তু সাক্ষ্য দেয়,যে অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে, বিধাতার রুদ্র রোষে তাদের 'তৃণ সম দহে'।

———

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম যোদ্ধা—আজীবন বিপ্লবী প্রমোদ দাশগুপ্তের জীবনাবসান

দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৯ শে নভেম্বর বিদেশের মাটিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন আজীবন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী প্রমোদ দাশগুপ্ত। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। অকৃতদার, বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই অক্লান্ত সৈনিক ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী আন্দোলনের একজন প্রধান প্রবক্তা ছিলেন।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলায় কুমোরপুর গ্রামে ১৯১০ সালের ১৩ই জুলাই প্রমোদবাবুর জন্ম যদিও বরিশালেই তাঁর শৈশব অতিবাহিত হয়। প্রাক্‌স্বাধীনতা যুগের বিপ্লববাদী আন্দোলনে তাঁর আদর্শ ছিলেন বপ্লবগুরু পুলিনবিহারী দাস। পরবর্তীকালে স্বাধীনতাসংগ্রামী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত তাঁকে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা দেন। বিপ্লবীদল অনুশীলন সমিতিরও তিনি সক্রিয় সদস্যপদ লাভ করেন। প্রধানতঃ ছাত্রাবস্থা থেকেই প্রমোদবাবু বিপ্লবী আন্দোলনের একজন বিশ্বস্ত সৈনিক হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন।

১৯১৮ সালে কলিকাতায় আসার পর তাঁর কর্মক্ষেত্র আরও প্রসারিত হয়। সতীশ পাকড়াশী, রবি সেন প্রমুখ অনুশীলন সমিতির নেতাদের সঙ্গে একযোগে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অভিযোগে এইসময় তাঁকে গ্রেপ্তার করে বকসার ও দেউলী ক্যাম্পে নির্বাসনে পাঠানো হয়। সেখানে অন্যান্য সহকর্মীর সঙ্গে তিনি কমিউনিস্ট কনসলিডেশন গ্রুপ গড়ে তোলেন। জীবনের বিভিন্ন স্তরে প্রয়াত শ্রীদাশগুপ্ত মোট ১৩ বছর কারাবাস করেন। কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হওয়ার পর তাঁকে বেশ কিছুদিন অজ্ঞাতবাসেও থাকতে হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে প্রমোদবাবু প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৯৪৯ সালে কাকদ্বীপ ও অন্যান্য অঞ্চলে বিখ্যাত তেভাগা আন্দোলনের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক। কম্যুনিস্ট মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ও 'স্বাধীনতা' সম্পাদনার দায়িত্বও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি বিভক্ত হওয়ার পর তিনি নবগঠিত সি-পি-এম দলের দায়দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজের কাঁধে তুলে নেন। একনিষ্ঠা, অনমনীয় দৃঢ়তা ও আপোষহীন প্রত্যয়ের যাদুকাঠিতে এই দলকে তিনি ভারতবর্ষের একটি অন্যতম রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলেন। সি-পি-এমের তিনি ছিলেন রাজ্য-কমিটির সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় পলিটব্যুরোর সদস্য।

ব্যক্তিগত জীবনে প্রয়াত শ্রীদাশগুপ্ত ছিলেন মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন মনের একজন দরদী মানুষ। পার্টির প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা এই মার্জিত রুচিরই পরিচায়ক। টেগোর সোসাইটির প্রাণপুরুষ বিপ্লবী পান্না-লাল দাশগুপ্ত তাঁর অগ্রজ।

প্রমোদ দাশগুপ্তের আকস্মিক প্রয়াণে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতবর্ষে সি-পি-এম দল নিঃসন্দেহে একটি বিরাট ধাক্কা খাবে। প্রশাসনের ক্ষেত্রে বামফ্রন্টের মধ্যে জ্যোতিবাবু যেমন প্রয়োজনীয় সংগঠনের ক্ষেত্রে ফ্রন্টের চেয়ারম্যান প্রমোদবাবু ও ছিলেন তেমনি অপরিহার্য। সরকারী কাজকর্ম ও পলিসি নির্দ্ধারণেও তাঁর মতামত অনেকখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া, সি-পি-এমের প্রতিটি শাখা সংগঠনের ওপরেও ছিল তাঁর একাধিপত্য। প্রমোদবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে এই প্রতিটি সংগঠনের উপরেই আঘাত আসবে। সে আঘাত এই দলের নেতারা কিভাবে কাটিয়ে ওঠেন,—সেটুকুই দেখার।

বিপ্লবী পরিষদ ও বিপ্লবী বাংলার পক্ষ থেকে আমরা আমাদের এককালের সহকর্মী স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীর যোদ্ধা প্রয়াত প্রমোদ দাশগুপ্তের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানাই ও তাঁর পরিজনদের জানাই আন্তরিক সমবেদনা।

স্পেনে সোস্যালিষ্ট পার্টির জয় কিসের ইঙ্গিত

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

দীর্ঘ ৪৩ বছর পর শতকরা ৭৬ টা ভোট পেয়ে স্পেনে সোস্যালিষ্ট পার্টি শাসন ক্ষমতা লাভ করল। এতে ব্রেজনেভের অকমিউনিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে শান্তি ও বন্ধুত্বের সেতু গড়ে তোলার নীতির জয় সূচিত হল। ব্রেজনেভের নীতি হল আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী প্রয়াস ব্যর্থ করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব মজবুত করা।

স্পেনের সেনাবাহিনীর এক অংশ দেশের এই পরিবর্তন রোখার চেষ্টা করেছিল। স্পেনের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের সম্পর্ক ফ্রাঙ্কোর আমল থেকেই অত্যন্ত ঘনিষ্ট। সেনাবাহিনী ছিল স্পেনের ক্ষমতার অধিকারী, এদের সমর্থনে পুষ্ট সরকারই এতদিন স্পেনে রাজত্ব চালিয়েছে। ন্যাটোর সঙ্গে তাঁর গাটছাড়া প্রথম থেকে: ফলে স্পেনের অর্থনীতির নাভিশ্বাস উঠেছে, শতকরা ১৬ জন স্প্যানিশ বেকার, মুদ্রাস্ফীতি ৪৮ শতাংশ, জ্বালানী ও পেট্রোকেমিকেলের তীব্র অভাব। শিল্প ক্ষেত্রে মন্দা। এমন একটা সংকট জনক পরিস্থিতিতে স্পেনে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন হল। সোস্যালিষ্ট পার্টির নেতা ৪৯ বছর বয়স্ক ফেলিপ গঞ্জালেস ঘোষণা করলেন ন্যাটোর সঙ্গে স্পেনেরসম্পর্ক নতুন করে বিবেচনা করা হবে, লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে, চীন সোভিয়েত সহ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলির সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টি করা হবে। সেনাবাহিনীর পুনর্বিন্যাস করা হবে এবং দেশের অর্থনীতির ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ কঠোর করা হবে। স্পেনের জনগণ মুক্তির নিশানা পেল, সোস্যালিষ্ট পার্টিকে শতকরা ৭৬টী ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করল।

স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায় গণতন্ত্রের গতি অগ্রগতির পথে না গিয়ে পিছনের দিকে চলছিল, ৪৩ বছর পর আবার নতুন মোড় নিল।

১৯৩১ সালে এক সাধারণ নির্বাচনের মধ্য দিয়ে স্পেনে ঘটেছিল রাজতন্ত্রের অবসান. সে নির্বাচনে জিতেছিল রিপাবলিকান পার্টি। ১৯৩৬ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনে জয়ী হয়েছিল রিপাবলিকান, সোস্যালিষ্ট কমিউনিষ্ট এবং নির্দলীয় গণতন্ত্রবাদীদের নিয়ে গঠিত পপুলার ফ্রন্ট, ছয় মাসের মধ্যে ১৯৩৬ সালের ১৮ জুলাই জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো স্পেনের সেনাবাহিনীর কতক অংশ হাত করে পপুলার ফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। পাজি জার্মানী, ফেসিষ্ট ইতালী এবং সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির মদতে এবং স্পেনের প্রাক্তন ডিকটেটর গু বিভেরার ফেসিষ্ট ফ্যালাঞ্জে পার্টির সমর্থন নিয়ে মরক্কো থেকে জেনারেল ফ্রাঙ্কো হামলা শুরু করল। তিন বছর সেই গৃহ যুদ্ধ চলল। পপুলার ফ্রন্টের সমর্থনে গঠিত হল ফ্যাসি বিরোধী ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেড। ভারতের অবিসম্বাদী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সমর্থন দিলেন, নিজে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে যাওয়ার বাসনা প্রকাশ করলেন। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডে যোগ দিলেন, সারা দুনিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবি শিল্পী ও সাহিত্যিক ব্যালফ ফকস, ব্রিটিশ কমন সভার কমিউনিষ্ট সদস্য ভারতের সাকলাতওয়ালা প্রাণ দিলেন স্পেনের মাটিতে। ফেসিষ্টদের গুলিতে আন্তর্জাতিক রাখী বন্ধন ঘটল স্পেনের মাটিতে ভাই স্পেনে সোস্যালিষ্টদের জয় সারা দুনিয়ার

ফাসী বিরোধীদের জয়—যাঁরা রক্ত দিয়েছেন তাঁদের আত্মদান সফল।

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে ফ্রাঙ্কো প্রতিষ্ঠিত হল। ফ্রাঙ্কো নিজেকে সর্বশক্তিমান ডিকটেটরে পরিণত করে রক্তের বন্যায় ডুবিয়ে দিল সমস্ত রাজনৈতিক দল ও গোষ্ঠী। গঠন করল একমাত্র বৈধ পার্টি ন্যাশনাল মুভমেণ্ট, তার অগ্রগতিতে শাসন চলল ৩৬ বছর। ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে বয়োবৃদ্ধ ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করলেন তাঁর মৃত্যুর পর তার উত্তরাধিকারী হিসাবে স্পেনের যুবরাজ কার্লোস গু বরবোন ক্ষমতার সিংহাসনে বসবেন। ১৯৭৫ সালের ২২ নভেম্বর ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর যুবরাজ জুয়ান হলেন স্পেনের নিয়মতান্ত্রিক রাজা। প্রতিশ্রুতি মত রাজা জুয়ান কার্লোস ১ পার্লামেন্টের অনুমতি নিয়ে ১৯৭৭ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি সহ সব পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে দিলেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করলেন। তার আগেই ১৯৭৬ সালে ফ্রাঙ্কোর আমলের প্রধান মন্ত্রী কার্লোস অ্যারিকাস কে বরখাস্ত করে অ্যাডোলফো সসাবেজ গঞ্জালেস ন্যাশনাল মুভমেণ্ট পার্টির নেতা হলেন। গৃহ যুদ্ধের পর ১৯৭৭ সালের ১৫ জুন প্রথম সাধারন নির্বাচনে প্রধান মন্ত্রী সুয়াবেজ গঞ্জালেসের ইউনিয়ান অব ডেমক্রেটিক সেন্টার (ইউ, ডি, সি) পার্লামেন্টের দুইটি সভাতেই লংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। দ্বিতীয় বৃহত্তম দল মার্কসবাদী স্প্যানিশ সোসালিষ্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (পি, এস, ও) দু বছর পর দলের আভ্যন্তরিন গোষ্ঠী দ্বন্দের দরুণ সুয়াবেজ সরকার ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলে ১৯৭৯ সালে আবার সাধারণ নির্বাচন হয়। সে নির্বাচনেও ক্ষমতাশীন দলের বৃহদাংশ অন্যান্য দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে জয়লাভ করে। প্রধান মন্ত্রী হন লিওপোল্ডো কালভো সোতেলো। ১০ মাসের মধ্যেই আবার ইউ, ডি, সি তে ভাঙ্গন হয়। দল থেকে বামপন্থীরা বেরিয়ে গিয়ে সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগ দেয়। ইউ, ডি, সিতে তখন ১৩টি গোষ্ঠি পার্লামেন্টে গরিষ্ঠতা হারিয়ে কার্লভো সোতেলোকে নতুন নির্বাচন করতে হয়। নির্বাচনে সোস্যালিষ্টদের সুনিশ্চিত জয় বুঝতে পেরে সেনাবাহিনীর একাংশ নির্বাচনের ঠিক আগে ক্ষমতা দখল করার চক্রান্ত করেছিল। চক্রান্ত পণ্ড করে দিয়ে সোস্যালিষ্ট পার্টি জনগণের রায়ে জয়ী হল।

স্পেনের আগে ফ্রান্স ও গ্রীস সোস্যালিজমকে বরণ করে নিয়েছে। ইংলাণ্ডের লেবার পার্টিও বর্তমান নেতৃত্ব পুরাপুরি বামপন্থীদের হাতে। কমন্স সভায় দুইটি গুরুত্বপূর্ণ উপ-নির্বাচনে লেবার পার্টি জয় লাভ করেছে—তন্মধ্যে একটিতে ছিল শ্রীমতী থ্যাচারের রক্ষণশীল দলের সভা। পশ্চিম জার্মানিতে ও হেলমেট কোহল (দক্ষিণ পন্থী) সম্প্রতি ক্ষমতাশীল হলেও ষ্টুটগার্ট, বন, পশ্চিম বার্লিনে লক্ষ লক্ষ জার্মান কোহেল সরকারের বিরুদ্ধে প্রায় প্রতিদিন সভা শোভাযাত্রা করছেন। আগামী নির্বাচনে হেলমুট কোহলের জয়লাভ সুনিশ্চিত নয়। কাজেই দেখা যায় মার্কিন পুষ্ট পশ্চিম দেশগুলি মার্কিন আওতা থেকে বের হয়ে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দিকে ঝুঁকছে। আশা করা যায় ইউনি আন্দ্রোপভের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ব্রেজনেভের পশ্চিমা-য়ুরোপের নীতি আরও জোরদার হবে। ইন্দিরাজীর নেতৃত্বে ভারতের বৈদেশিক নীতিও এর অনুকূলে। এই পরিস্থিতিতে রেগনের নেতৃত্বে মার্কিনের আগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী নীতির পরাজয় অবশ্যম্ভাবি। বিভিন্ন দেশ শান্তির পথে সহ অবস্থানের নীতিতে আস্থাবান হবে।

চীনের রাজনীতি

—রাজনৈতিক সমীক্ষক

ইংরাজীতে chineese puzzle (চৈনিক ধাঁধা) বলে একটা কথা আছে। কবে এবং কি কারণে এটা বলা হয়েছিল জানা নেই তবে চীন দেশের রাজনীতি একটা ধাঁধা বলে আজও দুর্বোধ্য মনে হয়। এবিষয়ে বিশ্ববাসীর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। চীন দেশ জাপানী দের কবল থেকে মুক্ত হবার পর, চীনে নেতৃবৃন্দ কি চান সেটা অন্যের নিকট বোধগম্য হয় নি। চীন একটি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র বলে ঘোষিত হলেও অন্য এবং প্রতিবেশী প্রধান কমিউনিষ্ট সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের মনকষাকষি ও ঝগড়া বিবাদ লেগেই আছে। পঞ্চশীল নীতির অন্যতম প্রবর্ত্তক হলেও, তারা হঠাৎ ভারতকে আক্রমণ করে বসল, বিরাট "হিন্দি-চীনি ভাই ভাই" এর পরিস্থিতিটাকে নস্যাৎ করে দিল। মাও-সে-তুং বেঁচে থাকতে তিনি তার নিজস্ব মতাদর্শ নিয়ে চীন দেশকে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর অন্তর্ধানের পর, সব ওলট পালট হয়ে গেল। এমন কি মাও পন্থীদের সাজা দেওয়া হল। চীন কমিউনিষ্ট বলে নিজেদের পরিচয় দিলেও, ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত পাকিস্তানের সঙ্গে আঁতাত করতে তাদের বিবেকের কোন দংশন অনুভূত হল না। সাম্প্রতিক কালে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতেও তারা দ্বিধা করল না। ভারতের খানিকটা অংশ দখল করে নিতেও তাদের ন্যায় নীতিতে বাধল না। এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আলাপ-আলোচনার পথেও তারা চলছে না, যদিও মুখে তারা শান্তিপূর্ণ সমাধানের নীতিতে বিশ্বাসী বলে বলছে। কিন্তু তাদের কাজকর্মের মধ্যে এর কোন প্রমাণ মিলছে না। চীনের বিদেশ মন্ত্রী হুয়াং হুয়াকে যেমন অশোভন ভাবে হটিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেটাও রীতিমত বিস্ময়কর। ভূতপূর্ব বিদেশ মন্ত্রীর অপরাধ ত দেখা যাচ্ছে যে তিনি দীর্ঘ সময় রাশিয়ার নেতাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেছিলেন তাঁর বিশ্বাস ছিল যে রাশিয়ার সঙ্গে পুরাণো বিবাদ মিটিয়ে নেবার সম্ভবনা আছে। বিদেশ মন্ত্রী চীনের তরফ থেকে কোন চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর করেন নি তিনি তার আলোচনার ফলাফল নিশ্চয় চীনে নেতৃবৃন্দের সামনে রাখতেন। কিন্তু সে পর্য্যন্ত ও সইল না। 'স্বাস্থ্য খারাপ' বলে একটা বাজে কৈফিয়ৎ দিয়ে তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। পঞ্চশীল নীতিতে যে চীনের কোন আন্তরিক বিশ্বাস নেই এই কাজের দ্বারা সেটাই প্রমাণিত হল আর একবার। গায়ের জোরে অন্য কোন দেশকে, বিশেষ করে রাশিয়ার মত শক্তিশালী দেশকে চীনের আজ্ঞা-বহ হতে বাধ্য করা যাবে বলে যদি চীনের বর্ত্তমান রাষ্ট্র নায়কেরা মনে করেন, তবে তাঁরা নিশ্চয়ই মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। ভারতের যে সব রাজনীতিবিদ চীনের সঙ্গে সমঝোতা করার সপক্ষে আশা পোষণ করেন, চীনের কাজ কর্ম দেখে তার শিক্ষা গ্রহণ করবেন কি?

তারা কি চীনের নেতাদের মতিগতি দেখে অতঃপর বিবেচনা না করে সেই সমঝোতার বাঁধ বুলি আউড়ে যাবেন এবং আমাদের পররাষ্ট্র নীতিকে আক্রমণ করে চলবেন? তাঁরা কি হৃদয়ঙ্গম করবেন না, বিশ্বের বহুদেশ ভারতের পররাষ্ট্র নীতির প্রশংসা করছেন? এ কাজ না করলে, বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করা যাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না। সমঝোতা এবং বন্ধুত্ব একতরফা হতে পারে না। উভয় পক্ষের আন্তরিকতা, আগ্রহ ও সুস্থ মানসিকতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই নিন্দুকেরা চৈনিক ধাঁধার শিকার হবেন না বলে আমরা আশা করি এবং তাদের অনুরোধ করি ধৈর্য্য ধারণ করতে

সংবাদ বিচিত্রা

সত্যদাস বৈরাগী

॥ আগে ছিনু ধনঞ্জয় এবে সত্যদাস/
নাম মিছে শব্দ ব্রহ্মে স্বরূপ প্রকাশ ॥

আখড়ার বড় গোঁসাই বলেন, ধনে নেই আকিঞ্চন যার, বৃথা ধনঞ্জয় নাম তার। ও নাম চলবে না ধনঞ্জয়। তাই নাম পরিবর্তন। গোঁসাইজী জিন্দাবাদ।

● ●

॥ সকল ব্রত করল 'রুদ্দী' বাকি আছে
ভীম একাদশী ॥

আগামী ৭ই নভেম্বর থেকে কলিকাতায় নাট্যকার-অভিনেতা উৎপল দত্তের প্রযোজনায় 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' অভিনীত হতে চলেছে। এতকাল উৎপলবাবু সামাজিক নাটকে সত্যের চোখ বেঁধে কাণামাছি খেলে খেলে এবার পৌরাণিক নাটকে হাত দিয়েছেন। হাতের এমনি গুণ, দিবসে দেখার তারা রাত কেঁদে হয় খুন। যাঁরা উৎপল বাবুর 'ফেরারী ফৌজ' কিংবা বৈশাখী মেঘ' নাটক দেখেছেন তাঁরা জানেন রাজনৈতিক মতলবে ইতিহাসকে কত জঘণ্যভাবে বিকৃত করা যায়।

এক প্রেস বৈঠকে 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস' নাটকের দ্রৌপদী চরিত্র ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উৎপল দত্ত বলেন, 'পঞ্চস্বামীর অজ্ঞাতবাস জনিতপলায়নী মনোভাবই তাঁর মধ্যে বর্ষণ আকাঙ্খার জন্ম দিয়েছিল এবং দ্রৌপদী কীচকের দ্বারা ধর্ষিত হবার ইচ্ছাতেই দ্বিতীয়বার কীচক সান্নিধ্যে গিয়েছিলেন।' (আঃ বাঃ ১৪, ১০, ৮২)। মহাভারত উৎপল দত্তের ব্যাখ্যা সমর্থন করেনা। এবার কংগ্রেস নয়, হিন্দুশাস্ত্র কমরেড দত্তের লক্ষ্য। কীচকের ভূমিকায় নামবেন স্বয়ং উৎপল দত্ত।

● ●

॥ ভয়াবহ খরা শস্যহানি রাজ্য ব্যাপী
দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ॥

সারা দেশে ১৮৭ জেলায় খরা। পশ্চিম বাংলায় আমন ধানের শতকরা পঞ্চাশ ভাগ নষ্ট হতে চলেছে। টাকার হিসাবে ক্ষতির পরিমাণ ৫০০ কোটি। ফসলের ক্ষতি টাকায় পূরণ হয় না। ঘাটতির সবটা কেন্দ্রের পক্ষেও মেটানো সম্ভব নয়। তবে ভরসার কথা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখার্জি বলেছেন, খরার দরুণ খাদ্যাভাব মেটানোর মত মজুদ খাদ্য কেন্দ্রের আছে। কা চিন্তা মরণে রণে।

প্রাচীন কালে লোকে বলত, 'রাজার পাপেতে হৈল মুলুকে আকাল।' পাপ পুণ্য বিচার উঠে গেছে। একালে লোকে বলে, আকালের কারণ

প্রাকৃতিক বিপর্যয়। তবে আকাল রোখার কাজ রাজার। রাজা মানে সরকার। সরকার যদি সে কাজ না করেন তাহলে কর্তব্যচ্যুতির অপরাধ-জনিত পাপে সরকার দায়ী।

১) গত তিন বছর এ রাজ্যে বড় কৃষকদের ওপর লেভি ধার্য করে সরকার দুর্দিনের জন্য খাদ্য-ভাণ্ডার গড়েন নি। ভাণ্ডার তাই শূন্য।

২) সেচ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন্দ্র যে কয়েক কোটি টাকা দিয়েছে রাজ্য সরকার তার সদ্ব্যবহার করেন নি।

৩) রাজ্যের ভুয়ো রেশনকার্ড বাজেয়াপ্ত হয়নি, যার সংখ্যা নাকি এক কোটি।

সংবাদ: রেশন দোকানের মাল বাংলা দেশে পাচার হয়। সরকারী গুদাম থেকে ডেলিভারি নেওয়া খাদ্য মাঝপথে উধাও হয়ে যায়। খাদ্য সংকটের জন্য এ সব ব্যর্থতাও কিছুটা দায়ি।

● ●

॥ পুলিসী গুলী চালনার ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ শীর্ষে ॥

আইন শৃঙ্খলা রক্ষার রাবতে ১৯৮০ সালে ভারতে পুলিস ৭৪১ বার গুলী ছোঁড়ে এবং তাতে নিহত হন ৩৩৭ জন। ঐ বছরে পশ্চিম বাংলায় পুলিস গুলী চালায় ২৪৮ বার এবং তাতে মরেন ৬২ জন। এ ব্যাপারে পশ্চিম বাংলা শীর্ষে।

(আঃ বাঃ ১৭,১০,৮২)

● ●

॥ কোচবিহারে রাজনৈতিক সংঘর্ষ, খুনখারাপি, ধর্ষণ, জমি দখল বেড়েই চলেছে ॥

গত চার মাসে কোচবিহারে ৫০টি খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে। মেখেলিগঞ্জে ৪, মাথাভাঙ্গা ৭, সদর ৬, তুফান গঞ্জ ১২ এবং দিনহাটা ১। অভিযোগ—সব খুনই করেছে বামফ্রন্ট সমর্থকরা। তারা খুন জখম নারী ধর্ষন কোন কিছুতেই দ্বিধা করে না। অধিকন্তু তারা অভিযোগ কারীদের শাসায়, মারধোর করে এবং কেস তুলে নেবার জন্য দাপিয়ে বেড়ায়। পুলিস অপরাধীদের ধরে না, আদালতে রিপোর্ট দেয় আসামীরা ফেরার।

(আঃ বাঃ ১৪,১০,৮২)

০ ০

॥ যেদুর্গা প্রতিমা পুলিস নিয়ে গেল, না এল মণ্ডপে ফিরে, না হল পূজা ॥

ঘটনার স্থান বারাকপুর চিড়িয়া মোড়স্থ স্কুল প্রাঙ্গন। পূজার উদ্যোক্তা 'যুব শক্তির মানস'। কাণ্ডটা করল টিটাগড় পুলিস। উদ্যোক্তারা পূজার অনুমতি থানায় না পেয়ে গিয়েছিল মহকুমা শাসকের কাছে। সেখানে ফল না পেয়ে যায় হাইকোর্টে। হাইকোর্ট অবশ্য উদ্যোক্তাদের আবেদন মঞ্জুর করে মহকুমা শাসককে পূজার অনুমতি দেবার নির্দেশ দেন।

ইতিমধ্যে পুলিস পূজাঙ্গন থেকে প্রতিমা তুলে নিয়ে প্রতিমা নির্মাতা শিল্পী বারাসতের নলিনী পালের জিম্মায় রাখে।

অন্যদিকে 'যুবশক্তির মানস' মনোবাসনা পূরনের জন্য হাইকোর্টে ছুটাছুটি করতে থাকে। পুলিশ শেষ পর্যন্ত যখন উদ্যাক্তাদের প্রতিমা' ফিরে নিয়ে যেতে বলে নন্দিনী পালের বাড়ি থেকে, তখন তাদের পক্ষে পূজার আয়োজন করার সময় থাকে না। বিশ্বজননীর পূজা আর হয়ে ওঠে না।

(যুগান্তর ২৯। ১০। ৮২)

।। বিশ্ব ব্যাংকের রিপোর্ট কি বলে ? ।।

বিশ্ব ব্যাংকের উন্নয়ন সংক্রান্ত রিপোর্টে প্রকাশ চীন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মাথা পিছু বার্ষিক আয় সব চেয়ে বেশি পাকিস্তানে। পাকিস্তানে ৩০০ ডলার (২৭০০ টাকা), চীনে ২৯০ ডলার (২৬০০ টাকা), ভারতে ২৪০ ডলার (২১০০ টাকা)। ভারতের কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান সংস্থার হিসাবে বর্তমান বাজার দরে ভারতের মাথা পিছু বার্ষিক আয় ১৫৩৬ টাকা ৯০পয়সা। ভারতে মাথাপিছু আয় সর্বাধিক পানজাবে ২২৭৮টাকা, দ্বিতীয় স্থান মহারাষ্ট্রের ২০২১টাকা (আঃ বাঃ ১৩/১০/৮২) হায়! পশ্চিম বাংলা।

• • •

।। "তোর মোর খুনাখুনি যারে যেবা পারে"—
বাইশ মনসা মঙ্গল ।।

খুন করতে করতে মাথায় খুন চড়ে। পশ্চিমবাংলার সন্ত্রাস রাজত্বে দুষ্কৃতকারীরা বুঝে নিয়েছে গলায় লাল রুমাল বেঁধে মানুষ মারলে কসুর হয় না। বরং কয়িয়াদীর হয় উলটো কসুর, খুনীর বাড়ে জোর। গত ২৯শে অক্টোবর তিলজলা থানার ও. সি গঙ্গাধরবাবুর প্রাণ নিল এবং ২রা নভেম্বর বারুইপুর অঞ্চলে এস. আই অসীম ব্যানার্জিকে গুরুতর জখম করল যারা, তারা কারা ?

যেখানে কর্তব্যরত পুলিসের এই হাল, সেখানে সাধারণ মানুষের অবস্থা কেমন তা কি আর বলার প্রয়োজন থাকে ? গত সাড়ে পাঁচ বছরে পাঁচ হাজারের ওপর লোক খুন হয়েছে এ রাজ্যে। কটা কেসে অপরাধীর শাস্তি হয়েছে ? কেন হয় নি ?

এ সব প্রশ্নের উত্তর নেই। উত্তর চাইবার সাধও নেই কারো। সকলেই 'চাচা আপন বাঁচা' মন্ত্র জপ করছে মুখে কুলুপ এঁটে। এর নামই সন্ত্রাস রাজত্ব। যার শেষ পরিণাম গৃহযুদ্ধ নয় আত্ম বিলোপ।

• • •

।। Earth changes but thy soul and God stand sure ।।

—Robert Browning.

আটক বাদশা খান গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে। ৯২ বছর বয়স্ক সীমান্ত নেতা খান আবদুল গফফর খানকে গত ৩০শে অক্টোবর নিষিদ্ধ রাজনৈতিক কার্য কলাপে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে পাক সরকার আটক করেন। অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক বাদশা

খান ভৌগলিক রাজ্যের বাদশা নন, তিনি নিপীড়িত মানবাত্মা রাজ্যের চিরন্তন বাদশা, গান্ধীজীর সত্য ও অহিংসার জীবন্ত প্রতীক। মনু বলেছেন, 'কর্ম-পাক্ষ বিবেকার্থম'—পক্ষধর যান যা কিছু করেন তার পিছনে থাকে তাঁর বিবেকের নির্দেশ। এই বীর দুঃখভর বনস্পতি-তুল্য মহামানব অন্যায়ের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে চলেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক মহাবিপ্লবী বাদশা খানের রোগ-মুক্তির জন্য ভারতবাসী ভগবানের নিকট প্রার্থনা জানায় এবং অবিলম্বে আটক আদেশ তুলে নিতে অনুরোধ জানায় পাকিস্তান সরকারকে।

• • •

। লাগে টাকা দেবে গৌরীসেন
মোরা বসি মধুচক্রে করিতে লেহন ।।

কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের অর্থসচিবকে দিল্লিতে তলব করেছেন। অক্টোবর মাসে রাজ্য সরকার রিজার্ভ ব্যাংক থেকে প্রায় একশতকোটি টাকা অতিরিক্ত তুলে ফেলেছেন। ওভার ড্রাফটের সীমা ছাড়িয়ে এই টাকা তোলা হয়েছে। জানা গিয়েছে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের সচিব রাজ্য সরকারের অর্থসচিবকে ফোন করে তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়ে দিয়েছেন। ["শোক ক্ষোভে চ হৃদয়ং প্রলাপৈরেব ধার্যতে"—উত্তর চরিত/বিদ্যাসাগর]

(আঃ বাঃ ৫/১১/৮২)

।। ফুলে সৌরভ নেই, নৈবেদ্য ভক্তিহীন
মন্ত্রপাঠে মন্ত্রতানেই, পূজক অর্বাচীন ।।

সম্প্রতি কালীপূজা নিয়ে কতকগুলি ঘটনার সংবাদ পাওয়া গেছে। সংবাদগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে হয় যে, অনেক স্থলেই পূজাটা একটা অভব্য ছেলে-খেলায় পরিণত হয়েছে। জনসাধারণকে এ বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। উৎসব হৈ হল্লা করার বহু উপলক্ষ্য আছে দরকার হলে আরো পাঁচটা বাড়তি উপলক্ষ্য তৈরি করাও যায়। পূজা ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এর একটি জাতীয় সংস্কৃতিগত চরিত্র আছে, তার ভাবমূর্তি নষ্ট করার অধিকার কারো থাকতে পারে না।

কলিকাতার তালতলার এক সার্বজনীন পূজার কালী প্রতিমা মাতাল বনাম পূজাকমিটির সংগঠক-দের বচসার ফলে ভাঙচুর।

হাওড়া পাঁচলা থানা এলাকায় পূজা করা নিয়ে গণ্ডগোল থামাতে পুলিসকে লাঠি ও গুলী চালাতে হয়েছে। কালী প্রতিমা গেছেন থানায় পুলিসের হেফাজতে।

বেলঘরিয়ায় সি. পি. এম অফিসের লাগা সামনের পূজামণ্ডপ দু'দলের সংঘর্ষে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভোজালির কোপ পড়ে মা কালীর মুণ্ডে। পুরোহিত কে পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। অকুস্থলে পুলিস পিকেট বসে।

আরো কিছু অশালীন কর্মকাণ্ডের সংবাদ আছে। পড়িলে রাহুর দৃষ্টি, রাজ্যে হয় অনাসৃষ্টি। মস্তান চালায় সমাজ, ধ্বংসে হয় কৃষ্টি।

।। জানা আছে জনগণ বলিদানের পাঁঠা
জোর গলায় তবু বলি 'গরিবের সরকার' কথাটা ।।

বাস ও ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধির সরকারী প্রস্তাব বামফ্রন্ট কমিটি মঙ্গলবার (১৬/১১/৮২) অনুমোদন করেন। বিদ্যুতের দাম বাড়াতেও ফ্রন্ট রাজি হয়েছেন।

ট্রাম বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া দেখে দুধের দাম বাড়ানো হবে কিনা ঠিক হবে। (আঃ বাঃ ১৭, ১১, ৮২) আহা কি মজা কি মজা !

পরিবহন, বিদ্যুৎ পর্ষদ ও দুগ্ধ প্রকল্প চলছে লোকসানে। লোকসানের দায় মেটাতে সরকারকে ভরতুকি দিতে হয় পরিবহনে বছরে ২৬ কোটি টাকা, দুগ্ধ প্রকল্পে বছরে ৯ কোটি টাকা এবং বিদ্যুৎ পর্ষদে বিশ বাইশ কোটি টাকা। দুধ কেমন সাপ্লাই হয়, লোড শেডিং কতটা এবং বাসে ট্রামে নিত্য যাত্রীরা কি সুখে চলেন তা বলতে হবে না। সরকারী তহবিলের টাকাগুলো এভাবে খরচা না হলে তা দিয়ে জনকল্যাণ মূলক কাজ হতে পারত। মোট লোকসানের পরিমাণ বছরে ৬৫ কোটি টাকা। একটা রেকর্ড !

তলা ফাঁক চৌবাচ্চায় যত জলই ঢালুন না কেন, ফাঁক দিয়ে তা বেরিয়ে যাবেই। বছরের পর বছর এ অবস্থা চলতে পারে না। প্রাইভেট বাসের মালিক বাস চালিয়ে ভাগ্য পরিবর্তন করেন। ট্রাম কোম্পানি রাষ্ট্রীয়করণের আগে লাভ করতে। জানকুনির মাদার ডেয়ার পরিচালনার গুণে গত বছর ৫ কোটি টাকা লাভ করেছে। তাই সরকারের উচিত পরিবহন, বিদ্যুৎ ও দুধ প্রকল্পের লোকসান ঠেকাতে একটা কমিশন নিয়োগ। থাকমণিরা কি বলেন ?

॥ পরামর্শ দিলেরে চাচা নয়নে দেখলে না
বাড়িলে কম্বলের লোম যে কম্বল থাকে না ॥

সি পি. এম-এর সর্বভারতীয় নেতা নামবুদরি পাদ এবং বাসবপুন্নায়া পশ্চিম বাংলার রাজ্য পার্টির নেতাদের সতর্ক করে দিয়েছেন যে সমাজ বিরোধীদের যেন কোন ভাবে দলের কাছাকাছি আসতে না দেওয়া হয় এবং সমাজ বিরোধীরা পার্টির কোন স্তরে প্রশ্রয় পাচ্ছে এমন ধারণা যেন জনসমাজে কিছুতেই না সৃষ্টি হয়। (আঃ বাঃ ১৪।১১।৮২)

সাধু সাধু ! বড় কর্তারা কি জানেন না অ্যাকসান স্কোয়াড চালায় কারা ? কারা দলের পেশীসঞ্চালক ? দেখেও না দেখার ভাণ করেন বুদ্ধিমান !

● ●

॥ নাগারা বাজায় কড়া নাকাড়া
ফিজো লালডেংগার মিলেনা সাড়া ॥

গত ১৭ই নভেম্বর সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায়কদের সমর্থনপুষ্ট কংগ্রেস (ই) দলনেতা এ. সি. জামির-এর নেতৃত্বে নাগাল্যাণ্ডে এই প্রথম কংগ্রেস ক্ষমতায় এল। হর্ষোৎফুল্ল জনগন কোহিমায় শোভাযাত্রা, সমাবেশ করে এবং কং (ই) মন্ত্রি সভার প্রতি অভিনন্দন জানায়। নাগাল্যাণ্ডের আয়তন ১৬,৫২৭ বর্গ কি: মি:, লোক সংখ্যা সাড়ে পাঁচ লক্ষ, প্রতি বর্গ কিলো মিটারে বসতি ৩২ জন। কৃষি ও কাঠ শিল্প জনগণের প্রধান উপজীবিকা। ক্ষুদ্র রাজ্য হলেও সীমান্ত রাজ্যটির গুরুত্ব কম নয়। আশা করা যায়, কংগ্রেসের শাসনে রাজ্যে স্থিতিশীলতা দৃঢ়তর এবং আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

● ●

॥ নেতাজীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু আমেরিকা
মানে নি (যুগান্তর ১৫।১১।৮২)

মর্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মহাফেজ খানা থেকে মাল মশলা নিয়ে জৈনিক মতিলাল ভার্গব 'দক্ষিণ-পূর্ব

এশিয়ার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু' নামে একখানা বই লিখেছেন। তা থেকে জানা যায় মার্কিণ গোয়েন্দা দপ্তরে টোকিও বেতার পরিবেশিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যুর সংবাদ সমর্থন করে নি। তবে মার্কিণ মুখ্য সামরিক পর্যবেক্ষক মিঃ বেনেট উক্ত সংবাদের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করেও ১৯৪৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী বলেছিলেন, তাঁর বিশ্বাস সুভাষ চন্দ্র বসুর মৃত্যু হয়েছে। যুক্ত রাষ্ট্রের এ কথায় কি বা নতুন আছে। 'এহো বাহ্য, আগে কহ আর'।

• • •

। বৃদ্ধস্য বচনং গ্রাহ্যমাপৎকালে হ্যুপস্থিতে'।

প্রবীন কমিউনিস্ট নেতা এস, এ, ডাঙ্গে বলেছেন, জাতীয় অগ্রগতির জন্য গণতান্ত্রিক "স্বৈরতন্ত্র" কাম্য। (সোঃ কোঃ ১।১০।৮২) সময়োপযোগী এই সত্য কথাটা বলার জন্য তাঁকে অভিনন্দন জানাই। সাইত্রিশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা গেছে, ভারতের বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ মার্কা গণতন্ত্র ফল প্রদ নয়। যে দেশের রাজনীতি করা গণতান্ত্রিক আচরণ বিধি মেনে চলতে অভ্যস্ত অথবা আগ্রহী নন, সেখানে অবাধ গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। নিয়ন্ত্রিত ডিকটেটারশিপ হল প্রতিশেধক।

● ●

। অথ এশিয়াড কথা।

দিল্লিতে নবম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বত্রিশ দেশের পাঁচ হাজার ক্রীড়া প্রতিযোগী ও কর্মকর্তা এবং বাইশ রকমের খেলা নিয়ে বিস্তারে, ব্যাপকতায়, রূপসজ্জায় এবং বর্ণাঢ্যে এবারকার এশিয়াড সুপার এশিয়াডে পরিণিত। অলিম্পিক গেমস-এর বড় কর্তাসহ উপস্থিত বিদেশী ক্রিড়াবিদগণ একবাক্যে দিল্লির আয়োজনের ভূয়সী প্রসংসা করেছেন। প্রত্যেক ভারতীয় যার জন্য গর্ব অনুভব করতে পারেন।

কিছু ক্ষুদ্রচেতা গরিব দরদীর ছদ্মবেশে এশিয়াডের ব্যয়ভার সম্পর্কে কটু কাটব্য করেছেন। আকাশীরা এশিয়াড ভণ্ডুল করতে সক্রিয় আছেন। দু একটি বিরোধী রাজনৈতিক দলও চুপ করে বসে নেই। এদের আসল মতলব হল, ইন্দিরা গান্ধীর সরকার এত বড় একটা সাফল্য অর্জন করবে তা কি করে হয়। যেমন ভাবে পারো তার সুনাম নষ্ট কর। হায় রে দুর্বুদ্ধি! এরা বুঝে না, এশিয়াড পণ্ড হলে স্বদেশের মুখেই কালিমা লেপন হবে।

বাদশা শাহাজানের বিপুল অর্থ ব্যয়ে তাজমহল গড়েছিলেন। তাজমহল না গড়ে টাকাগুলো তিনি গরীব প্রজাদের মধ্যে দান খয়রাতের জন্য— তাঁর ষোল জন সুবাদারের হাতেও দিতে পারতেন। তারা সে টাকা ভাগ করে দিতেন মনসবদার, ফৌজদার এবং কাজিদের মধ্যে বিতরণের জন্য। তারপর কি হত? কতটা গরিবরা পেত? দেশ তখনো দারিদ্র ছিল দারিদ্র দূর হত কি? বিশ্ববাসী কিন্তু স্বল্পমেয় তাজমহল দেখতে পেত না। এশিয়াডের জন্য যে টাকাটা খরচ হল তা লোকই পেয়েছে।

এশিয়াডে নানা দেশের মানুষের সমাবেশ এবং খেলার অংশ গ্রহণ সৌভ্রাত্র ও শান্তি প্রতিষ্ঠারও অন্যতম উপাদান। Man dose not live by bread alone. কূচক্রীদের অগ্রাহ্য করে এশিয়াড সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে চলছে। জয় হোক এশিয়াডের, জয় হোক ভারতের জাতীয় আবেগের।

Regd No R. N. 24511/71
DAVP—Regd
বার্ষিক :—ডাক :৮.০০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
বাষ্মাষিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—৩০ পয়সা

দায়ী সম্পাদক ।।
শ্রীবিশ্বনাথ রায়চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীকামাখ্যা রায়
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "ভোলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

ঃ বিজ্ঞপ্তি ঃ

বালেশ্বর আত্মোৎসর্গ স্মারক সমিতি

BENOY-BADAL-DINESH DA 5

(December 8, 1982)

Baleswar Martyrdom Re[illegible] brance Committee invites you to pay homage to the sacred memory of the martyrs—Benoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, in front of their portraits at the Writers' Buildings (1st floor) on the 8th December, 1982, Wednesday, at 12 noon sharp in observance of the 52nd anniversary of their heroic fight for freedom of India.

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বিপ্লবী বাংলা

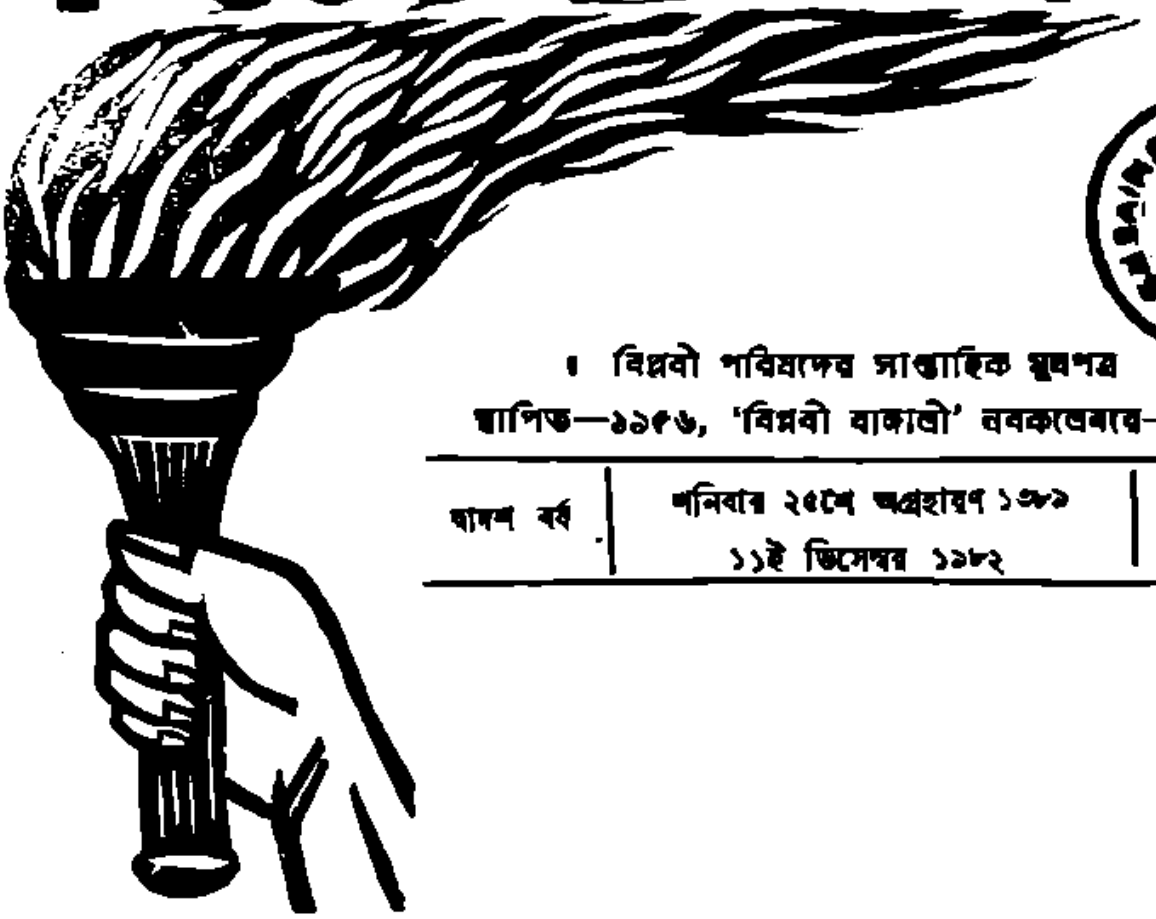

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ২৫শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৯ ১১ই ডিসেম্বর ১৯৮২	১১ সংখ্যা

"মনে রাখবেন, আমাদের একবারই জন্ম এবং মৃত্যু হবে, তা রোগ-শয্যায় হোক, বা যুদ্ধক্ষেত্রেই হোক। তাই বলছি যে, মানুষের মত এগিয়ে আসুন। বাঁচতে হয়তো মানুষের মতই বাচুন, আর মরতে হয়তো মানুষের মতই মরুন, যাতে আগামী দিনের ভারত আপনাদের জন্য গর্ববোধ করতে পারে।"

—রাসবিহারী বসু

সম্পাদকীয়

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ চাই

সারা ভারতবর্ষ ব্যাপী এমন একটা অশান্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে, যার পরিণাম গভীর উদ্বেগ এবং আশঙ্কাজনক হয়ে দাঁড়াচ্ছে। ভিন্ন ভিন্ন দল ও গোষ্ঠী এই সর্বনাশা পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য এগিয়ে আসছেনা, বরং একে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে। বলা বাহুল্য যে এদের দেশ প্রেমের কোন পরিচয় মিলছেনা। যেটা একান্ত নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে উঠছে, সেটা হল কয়েকটি হতাশাপূর্ণ মানুষের এই ঘোলাজলে মৎস্য শিকারের নীতি অনুসরণ করে চলেছে। তাদের নেই কোন উচ্চাদর্শ, নেই দেশের সামগ্রিক কল্যাণসাধনের কোন মানসিকতা, নেই অন্যায় অসঙ্গত, এমনকি দেশ দ্রোহিতার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার কোন প্রচেষ্টা। আছে যেন তেন প্রকারে একটা স্থিতিশীল সরকারের বিরুদ্ধতা করে ক্ষমতালাভের একটা উদগ্র বাসনা। তারা বুঝতে চাইছেনা যে দেশ না বাঁচলে, দেশের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হলে, শেষ পর্যন্ত তাদেরও বাঁচার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে এদেশের বিরুদ্ধ দলগুলির নীতিই এটা। কিন্তু প্রশ্ন হল, বর্তমান সরকার এই পরি-স্থিতির মোকাবিলা করতে পারছেন না কেন? কিসের জন্য দ্বিধা, কেন দেশের স্বার্থে কঠোর হস্তে দমন করতে পারছেন না জাতীয় সরকার। একটার পর একটা সমস্যা সৃষ্টি করেছে যারা, তাদের কেন বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে না যে এই দেশদ্রোহী কাজকর্ম চলতে দেওয়া যায় না, চলতে দেওয়া হবে না কোন মতেই। এই দৃঢ়তার অভাব তাদের স্পর্দ্ধাকে আকাশচুম্বী করে তুলছে। এই সমস্যার গভীরতা সম্বন্ধে শুধু অবহিত হবার সময়ই আসেনি, এই কাজ করতে অসমর্থ হলে, শাসকদলের কৈফিয়ৎ দেবার সময়ও এসেছে। সমস্যার সময়মত সমাধান না করে দিনের পর দিন ঝুলিয়ে রাখলে, এই দুষ্ট ক্ষত ভারতরাষ্ট্রের সর্ব অঙ্গে গ্যাংগ্রিণের মত ছড়িয়ে পড়বেই।

বর্তমানে তিনটি অঙ্গরাজ্যে যে সব কাজকর্ম চলেছে, সেগুলিকে অঙ্কুরে বিনাশ না করতে পারলে, দেশকে বাঁচাবার কোন পথই শেষ পর্যন্ত খোলা থাকবেনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে তিনটি অঙ্গরাজ্যের নাম, যথা কাশ্মীর, পাঞ্জাব ও আসাম। খবরে প্রকাশ কাশ্মীরের বিচ্ছিন্নতাকামী কয়েকটি দল যেমন জমায়েত-ই-ইসলামী, জমায়েত-এ তুইহা, মুসলিম লিগ ও লিবারেশন ফ্রন্ট। এরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে যে তারা ইরাণের ধাঁচে বিপ্লব ঘটাতে চায়, কাশ্মীরকে তারা ভারতের অধিকার থেকে মুক্ত করতে চায়। আসামে একদল অর্বাচীন যুবক দল, স্বার্থান্বেষী দেশী বিদেশী শক্তির সাহায্যে অপকলন চালাচ্ছে. তাদের দাবী মানতেই হবে জাতীয় সরকারকে। সংবিধানকে কোন মর্যাদা তারা দিতে না। আন্তর্জাতিক চুক্তি পালনের দায়িত্বকে কাণাকড়ি মূল্যও দিচ্ছে না। সর্বোপরি মানবতা বিরোধী কাজ করে তাদের তথাকথিত দাবীর নিকট সরকারকে নতজানু হতে হবে। আগামী ৬ই ডিসেম্বর তাদের সঙ্গে আলোচনার দিন ধার্য্য থাকলেও, ২রা ডিসেম্বর তারা আসাম বন্ধের ডাক দিয়েছে এবং তাদের নিকট নতিস্বীকার না করলে, বোমা, ও অন্যান্য ধ্বংসকারী ব্যবহার করতে ও তারা দ্বিধা করছে না। এই অব-স্থায় তাদের সঙ্গে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না। তাদের সোজা সরল ভাষায় কেন বলে দেওয়া হবে না যে তারা কৃত কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করলে, আলাপ আলোচনার পর্ব শেষ। সুরুতেই তাদের অত্যন্ত আস্কারা দেওয়া হয়েছে কঠোর ভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে। এই

উচ্ছৃঙ্খল যুবকের যে অপ্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, সেটা কেন দেওয়া হল, সেটা রীতিমত দুর্বোধ্য। তারা আলাপ আলোচনা করছে এই ভাবে যে তারা যেন কোন স্বাধীন দেশের প্রতিনিধি এবং ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছে দ্বিপাক্ষিক কোন সমস্যার সমাধানের জন্য। আজ ভারত সরকারকে একটি সাংবিধানিক সঙ্কটের সম্মুখে দাঁড়াতে হয়েছে। সংবিধান রদবদল না করতে পারলে, আসামের নির্বাচনপর্ব ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ বা মার্চমাসের প্রথম দিকে শেষ করতেই হবে। এ সত্যটা ত ভারত রাষ্ট্রের কর্ণধারদের অজানা ছিল না। কিন্তু কেন তারা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কালক্ষেপ করলেন? ওদের ভয়ে না নিজেদের অপদার্থতার জন্য? নির্বাচন করতে আজ তারা যদি বাধ্য হন, তবে ছয় মাস আগেই এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে সচেষ্ট হন নি কেন? আলাপ-আলোচনার নীতি ভাল, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে আলাপ আলোচনার পথ গ্রহণ করা হয়, সেটাত দেশের মঙ্গল সাধনের জন্যই করা হয়।

যে আলাপ আলোচনা দীর্ঘায়িত হলে দেশের ক্ষতি সাধিত হতে পারে সে আলাপ-আলোচনা করা শুধু অবিবেচনা-প্রসূতই নয়, সে আলোচনা অন্যায় এবং গর্হিত কাজ বলে গণ্য হতে বাধ্য। সে কাজ করা হলে দেশের মানুষের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য বর্তমান প্রশাসক দল।

আসুন আকালী সমস্যার ব্যাপারে। সেই এক সুর। তারাও আসাম আন্দোলনকে নজীর হিসাবেও খাড়া করেছে। দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশিয়াডের সময় দেশের সম্মান যে ভাবে ধূলিসাৎ করতে চেয়েছিল হৈ হল্লা করে। ভারত সরকার বন্ধ করতে পেরেছেন বলে অবশ্য কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন এবং সে জন্য তারা ধন্যবাদার্হ। কিন্তু লাঙ্গোয়াল কৌশল পরিবর্তনের কথা বলছেন এখন। সংক্ষেপে বলা যায়, তারা তাদের দাবীর অযৌক্তিকতা স্বীকার করেনি। তাদের জিদ্ চরিতার্থ করতে তারা এখনও বদ্ধপরিকর। সুতরাং প্রথম রাউণ্ডে হেরে যাবার পর, এই আকালিরা যুক্তির পথে চলবে বলে যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করেন, তবে সেটা হবে একটা পর্বত প্রমাণ ভুল। সংঘর্ষের বারুদ তারা শুকনোই রেখেছে এবং রাখতে চায়। সুতরাং আত্মসন্তুষ্টির কোন স্থান থাকা উচিৎ হবেনা।

আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে সরকার পক্ষের মনে একটা দুর্বলতা বাসা বেঁধেছে। দোষী যারা তারা সাজা পাবে না, এই মানসিকতা আজ দেশের মধ্যে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ছে। এর মানসিকতার ফলেই প্রশাসকদলের সংগঠনের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা বিস্তৃতি লাভ করছে। একমাত্র স্বার্থসিদ্ধি করাই এইসব লোকের উদ্দেশ্য। তাই যে কোন অজুহাতে দলত্যাগ করছে। নিজেদের দলীয় সরকারকে ব্যতিব্যস্ত এবং অতিষ্ট করে তুলছে। এখনও সাবধান না হলে, দলীয় শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে, সমূহ সর্বনাশ কেউ রোধ করতে পারবে না। কোন দল বা ব্যক্তির অবলুপ্তি ঘটতেই পারে, তার বা তাদের কৃতকর্মের জন্য। পৃথিবীর ইতিহাসে ঘটেও থাকে। সেটা যতটা উদ্বেগের কারণ হোকনা কেন, সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্বেগ হচ্ছে যে এতে গোটা দেশের সর্বনাশ ঘটবে। দেশের মানুষ দেখতে চায় যে শ্রীমতী গান্ধী ও তাঁর দল, এই দুঃসময়ে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে বাঁচাবেন। দেশের মধ্যে একটা সুস্থিতি এনে এবং দেশের সার্বিক উন্নতি সাধন করে। 'গয়ংগচ্ছ' ভাব ত্যাগ করে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করুন কেন্দ্রীয় সরকার, এটাই দেশপ্রেমিক প্রত্যেকটি মানুষ চায়।

— - —

অপশাসনে পিষ্ট জনগণ

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সংগঠনকে শক্তিশালী ও বর্দ্ধিত করার জন্য সি, পি, এম দল বর্ত্তমানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে, তা যেমন জঘন্য ও ঘৃণ্য তেমনই জনচিত্তে ভীতিপ্রদ। ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ কোরে ঐ দল শরিক দল গুলিকেও দুর্ব্বল কোরে দিতে নানা অপকৌশল ও মিথ্যা অজুহাত সৃষ্টি করে তাদের উপরও শারীরিক নির্য্যাতন চালাচ্ছে বিভিন্ন এলাকায়। আর, এস, পি, ফরওয়ার্ড ব্লক প্রভৃতি পুরাতন শরীকরা ও নূতন শরিক সি, পি, আই এবং ঐ সব শরিক দলের কর্মি ও নেতারা প্রায়ই সি, পি, এম দলের হাতে মুর্শিদাবাদের ও মেদিনীপুরের নানা এলাকায়, পশ্চিম দিনাজপুর ও কুচবিহারের বিভিন্ন স্থানে লাঞ্ছিত, আহত ও সাংগঠনিক ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতি গ্রস্থ হচ্ছে, বলে সংবাদে প্রকাশ। বামফ্রন্ট বৈঠক এ বিষয়ে মাঝে মাঝে আলোচনাও হচ্ছে, আবার শরিক দলের লোকেরা সর্ব্বত্রই সি, পি, এম দলের ক্যাডারদের হাতে প্রহারে প্রহারে জর্জ্জরিত হচ্ছে। কি বিচিত্র বামফ্রন্ট ও তার শরিকগণই বামফ্রন্ট নামে হলেও, আসলে সি, পি, এম দলের হুকুমেই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়, ফলে অন্যান্য শরিক দলগুলি সি, পি, এম এর মর্জ্জির ওপর চলতে বাধ্য হয়, তাদের নিজস্ব কোন সত্তা নেই বোধ হয়। তা যদি থাকতো, তবে নিশ্চয় এভাবে শরীক দলের গ্রামের কর্ম্মীরা দিনের পর দিন পড়ে পড়ে মার খেত না। শহরে একই অবস্থা চলছে, তবে গ্রামের তুলনায় কিছু কম মনে হয়। শরিক দলের নেতাদের মন্ত্রীত্বের বিনিময়ে কর্ম্মীরা নিগৃহিত হচ্ছে, ফলে শরিকদলের সমর্থকরা অবস্থার চাপে পড়ে সি, সি, এম দলের সমর্থকের ভূমিকা নিতে আগ্রহী দেখা যাচ্ছে। শরিক দলগুলি ক্রমশই দুর্ব্বল হতে শুরু করেছে বহু এলাকায় সি, পি, এম দলের শরীক হয়ে অন্যান্য তথাকথিত বামপন্থীরা এখন পস্তাচ্ছে শরিক দলের যখন ঐ হাল তখন সি, পি, এম বিরোধীরা যে আজ কত কঠিন বিপদের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে বাধ্য হচ্ছে তা সহজেই অনুমেয়। কংগ্রেস (ই) দল প্রধান বিরোধী. ফলে ঐ দলের নেতা ও কর্ম্মীরা যে কত অত্যাচার সহ্য করছে, এমন কি মাঝে মাঝে আহত ও নিহত হচ্ছে তা সবাই জানে। কংগ্রেস (ই) দলকে পর্য্যুদস্ত করার জন্য ও স্বাধীনচেতা বুদ্ধিজীবিদের সর্ব্ব ব্যাপারে হীন প্রতিপন্ন করার জন্য সি, পি, এম দলের নেতারা ও মন্ত্রীরা মিথ্যা প্রচারকে সম্বল কোরে জন সাধারণকে বিভ্রান্ত করার চক্রান্তে মেতে উঠেছে, শাসন ক্ষমতা দখলের অব্যবহিত পরেই। আজো তারা সেই অপকৌশল চালিয়ে যাচ্ছে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে। পুলিস প্রশাসনকে নিষ্ক্রিয় কোরে রেখে এ রাজ্যে চরম অরাজকতা চালু করেছে মন্ত্রীরা ও তাদের নেতারা। ফলে এ রাজ্যে মানুষ আইনের শাসন থেকে বঞ্চিত-ও সি, পি, এম দলের জুলুমবাজীর হাতে সর্ব্ব সময়ে ও সকল ব্যাপারে চরম আঘাত প্রাপ্ত। কংগ্রেস (ই) দল এই সব অনাচার ও অত্যাচার এবং হত্যার রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে দারুণ বিপদের মুখে পড়ছে বারে বারে। আইন শৃঙ্খলা হীন রাজ্যে বিরোধীরা তাদের ন্যায় সঙ্গত ভূমিকা পালনের সুযোগ থেকেও বঞ্চিত, এমনই অবস্থা এ রাজ্যে চলছে বিগত প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর কাল ধরে। সংবিধান শিকেয় তুলে রেখে বামফ্রন্ট স্বেচ্ছাচারের পরাকাষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছে যা অসহ্য। জনগণ অত্যাচারিত নানাভাবে,

অথচ কথা বলার চেষ্টা করলেই তাদের চক্রান্তকারী আখ্যা দিয়ে দলের লোকের মারফৎ শাসন হয়। কোথাও বা পুলিশকে বাধ্য করা হয় বিরোধীদের শায়েস্তা করার জন্য ও তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করতে ও অন্যায় ভাবে গ্রেপ্তার কোরে হাজতে পুরে মারধোর করতে। ভারতে ইতিপূর্ব্বে কোন ক্ষমতাসীন দল তাদের প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য উক্ত সংবিধান বিরোধী পন্থায় পুলিশকে নিষ্ক্রিয় কোরে রেখে অথবা পুলিসকে দলীয় কর্ম্মীদের পর্যায়ে কোরে রেখে এভাবে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেনি। এর উদ্দেশ্য জনগণকে শাসক দলের অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে না দেওয়া ও দলীয় কর্ম্মীদের আখের গুছিয়ে নিতে সাহায্য করা। ফলে সর্বত্র সাধারণ মানুষের মনে শুধু ক্ষোভই নয় ক্রোধও পুঞ্জিভূত হচ্ছে, যার আশু পরিণাম এক ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি।

দলের লোকেরা ছাড়া সকলেই সি, পি, এম এর অত্যাচারে, অবিচারে ও জঘন্য আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট শাসনের হাত থেকে মুক্ত হবার জন্য ঘরে ঘরে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি চলছে, যার বহিঃপ্রকাশ মাঝে মাঝে পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন জেলায়।

ভয় দেখিয়ে মানুষকে কিছুকাল স্তব্ধ কোরে রাখা সম্ভব. কিন্তু চিরকাল তা সম্ভব নয়—এটা ওরা বোঝেন না কেন?

হিংসা কেবল হিংসারই জন্ম দেয় এবং তা প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ইন্ধন যোগায়, তা কি ঐ দলের সর্ব্ব শ্রেণীর নেতারাও অনুমান পর্য্যন্ত কোরতে পারেন না? পশ্চিম বাংলার যে কি মারাত্মক সর্ব্বনাশ সাধনে উদ্যোগী হয়েছে বামফ্রন্ট তথা সি, পি, এম দল তা ভাবলেও মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়।

ভারতের কোন অন্য রাজ্যে এই প্রকার সঙ্গীন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি ১৯৭৭ সালের আগে বা পরে। ত্রিপুরা ও পশ্চিম বঙ্গে বামফ্রন্ট শাসন কালেই উক্ত আতঙ্কের চরম বিশৃঙ্খলা ও আইনের সুশাসনের অবসান কালেই উক্ত উভয় রাজ্যের অধিবাসীরা জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বর্ত্তমানে সর্ব্ব ব্যাপারে উত্যক্ত ও পদে পদে বিপদগ্রস্ত হতে বাধ্য হচ্ছে। যে রাজ্যে শাসক পক্ষপাতদুষ্ট ও দলীয় কল্যাণে ছাড়া অন্য কোনও কল্যাণের কাজে বাতস্পৃহ সে রাজ্যের জনগণের দুর্গতির সীমা পরিসীমা থাকে না।

এরাজ্যের পুলিশী শাসন ব্যবস্থায়, শিক্ষা সংক্রান্ত সকল ক্ষেত্রে. সাধারণ প্রশাসনে, গ্রাম্য পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার, পাঠ্য বিষয় স্থিরকরণে, বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রেও দলবাজি চলছে অত্যন্ত ঘৃণ্য কায়দায়। ফলে ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবি, চারু-শিল্পীজীবি, ব্যবসায়ী, ছোট দোকানদার, হকার এক কথায় সকল শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মানুষ বামফ্রন্ট শাসনের দুশ্রীতায় হতাশ ও বিভ্রান্ত। এই অপ-শাসনের, এই অব্যবস্থার. এই দলীয় চক্রান্তের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য এ রাজ্যের জনগণের বৃহত্তম অংশ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং তারা এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ কামনা করছে প্রতিনিয়ত। সব চেয়ে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে ছাত্রদের কারণ তাদের ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার মধ্যে নিহত দেখা যায়। রাজ্যের শিল্প বাণিজ্য অধোগতির মুখে নিক্ষিপ্ত সিটুর অত্যাচারে। গ্রাম-বাংলায় হাহাকার উঠেছে বৈষম্য মূলক ব্যবস্থার ফলে এবং বৈষম্য সৃষ্টিতে এই সরকারই উৎসাহ যোগাচ্ছে দলীয় প্রধান্য বিস্তারের প্রয়োজনে। কংগ্রেস (ই) দল

প্রমোদ দাসগুপ্ত

কালিপদ সরকার

গত ২৯শে নভেম্বর (১৯৮২) চীনের রাজধানী বেজিংয়ে (পিকিং) সি, পি, এম নেতা প্রমোদ দাসগুপ্ত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বেতারে সংবাদটা শুনতেই বন্ধুপত্নী বলে উঠলেন 'দাদার কাশী প্রাপ্তি' হল। কিন্তু আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিসেস বুঝলেন, পরিহাসটি ভাল হয় নি। এক মাসের কিছু বেশি আগে চীন সরকারের আমন্ত্রণে প্রমোদ বাবু চিকিৎসার্থে চীনে গিয়েছিলেন কিন্তু দেশে আর ফিরে এলেন না। প্রবাসে দৈবের বশে জীবতারা দেহ আকাশ থেকে খসে গেল।

অপরাহ্নের ক্লান্ত রোদে বসে অনেক কথাই মনে ভেসে আসছিল। স্মৃতির পথ বেয়ে অনেক দূরে এসে দীপ্ত তরুণ মুখখানি জেগে উঠল মানসপটে, সে মুখে ছিল না সেদিন মোটা চুরুট, কঠোর ব্যক্তিত্বের ছাপ। চোখে ছিল প্রতিভরা গভীর দৃষ্টি, অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা। সরকারী ডাক্তারের মেধাবী পুত্র প্রমোদ বাবুর হওয়ার কথা ছিল একজন সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, তা না হয়ে এলেন তিনি বন্দী শিবিরে। তারপর যথাকালে হলেন তিনি পলিটিকাল পার্টির দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার। পিতা মতিলালের ইচ্ছাই প্রকারান্তরে পূর্ণ হল। বলতে পারেন দৈবের লিখন।

কমিউনিষ্ট পার্টিতে সম্পাদক হচ্ছেন জননেতা, সর্বাধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। দলের সংগঠন থাকে তাঁর হাতের মুঠায়। ১৯৫৯ থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রমোদ বাবু ছিলেন পার্টির প: ব: রাজ্য শাখার সম্পাদক। প্রথমে সি. পি, আই-এর, পরে সি. পি, এম-এর। পশ্চিমবঙ্গে মূল দলকে কোণঠাসা করে সি. পি, এম-এর প্রভাব বৃদ্ধির ইহাই প্রধান হেতু। তাই তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সি, পি, এম এর পিতৃতুল্য সংগঠক ও লালন-পালন অধিকর্তা বলতে কোন দ্বিধা নেই।

তরুণ বয়সে প্রমোদ দাসগুপ্ত দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। সেই যে তিনি ঘর ছেড়েছিলেন আর ঘরে ফিরে যান নি। দেউলি বন্দী শিবিরে আটক থাকা কালে, সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের অনেকের মত প্রমোদ বাবুও কমিউনিষ্ট মতবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বন্দী শিবির থেকে মুক্তি লাভের পর সি, পি, আই-এর সর্বক্ষণ কর্মীরূপে নেতা মুজাফ্ফর আহমদের নির্দেশে তিনি শুরু শ্রমিক সংগঠনে ব্রতী হন। পার্টির সদস্যপদ পান ১৯৩৮ সালে।

এক বছর পরে তিনি কলিকাতা জেলা কমিটির সদস্য মনোনীত হন। প্রথম পর্বের আদর্শনিষ্ঠ, ত্যাগব্রতী ও নিঃস্বার্থ কমিউনিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রমোদবাবু অন্যতম। তাঁদের সংখ্যা বিরলপ্রায়। সি, পি, আই-এর এক কালীন মুখপত্র 'জনযুদ্ধ' ও 'দৈনিক স্বাধীনতার তিনি ছিলেন সুদক্ষ ম্যানেজার। 'গণশক্তি'র প্রতিষ্ঠা লাভের পিছনেও তাঁর অবদান প্রচুর। বিশ বছরের একনিষ্ঠ পার্টি-সেবা ১৯৫৯ সালে প্রমোদবাবুকে প শ্চি ম ব ঙ্গ রাজ্যশাখার সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত করে। তিনি হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ভুই ফোঁড় কমিউনিষ্ট নেতা ছিলেন না। অনাড়ম্বর, নিরলস ও দল-অন্তপ্রাণ প্রমোদ দাসগুপ্ত সব রাজনৈতিক দলের সামনেই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

একটানা ২৩ বছর রাজ্য কমিটির সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন কালে তাঁকে কয়েক বার বেশ বড় রকমের সংকটের মুখে পড়তে হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধ কালে পার্টির একাংশের দেশদ্রোহী মনোভাবজনিত জনরোষ, ১৯৬৯-৭০ সালে পার্টির উগ্রপন্থীরা দল ছেড়ে গিয়ে নকশাল পন্থা

গ্রহণ করার তাত্ত্বিক বিরোধ এবং ১৯৭২-৭৬ সালের কঠিন দুঃসময়ের মোকাবিলা করতে হয় প্রমোদ বাবুকে। তাঁর দূরদৃষ্টি ও সংগঠন প্রতিভা সব কটি সংকট থেকে পার্টিকে রক্ষা করে।

১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট গড়ে সি, পি, এম শাসন ক্ষমতা হাতে পেয়ে, যে কাজটির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় তা হল কংগ্রেসকে এড়িয়ে, রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী মার্কসবাদী দলগুলি, যথা সি, পি, আই, আর, এস, পি, ফ:. ব্লঃ, এস ইউ-সি প্রভৃতির স্বাধীন সত্তা খর্ব করে, বাম ঐক্য গড়ার শক্ত পটভূমি তৈরি। তৎকালীন শরিকী সংঘর্ষ ও খুনোখুনির ইতিহাসের উপর চোখ রাখলেই উপরোক্ত কথার সত্যতা ধরা যাবে। এক এস-ইউ-সি বাদে সকলেই সি, পি, এম-এর লাইনে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছে। প্রমোদ বাবুর স্ট্রাটেজি সফল।

১৯৭৭ সালে জনতাদলের আনুকূল্যে সি, পি, এম-এর নির্বাসন দুঃখের অপনোদন ঘটে এবং প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নির্বুদ্ধিতা ও অ-কমিউনিষ্ট ভোট কংগ্রেস ও জনতাদলের মধ্যে ভাগাভাগির ফলে, একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে সি, পি, এম একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়ে পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য বিধান সভায় ফিরে আসে এবং শাসন ক্ষমতায় বসে। সুযোগের সদ্ব্যবহার হল সাফল্যের সিংহদ্বার। প্রমোদ বাবুর পরিস্থিতি-মূল্যায়ণ সঠিক এবং দল পরিচালনা প্রায় বস্তু হওয়ায়, সুযোগের এক বিন্দুও হেলায় অপচয় হয় না। ১৯৮২ সালের নির্বাচনেও সি,পি, এম এই রাজ্যে জয়ী হয়েছে এবং শাসন ক্ষমতায় আছে। তবে এ নির্বাচনের জয়ের পিছনে প্রকৃত জনসমর্থন, না সুপরিকল্পিত কারচুপি যন্ত্রের ভূমিকা বড় ছিল তা নিয়ে বিতর্ক আছে, আদালতে মোকদ্দমা আছে। তবু স্বীকার করতেই হবে জয় তো হয়েছে।

কমিউনিষ্টরা সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। ব্যালট বাক্সের ভেল্‌কি এবং ক্ষেপণাস্ত্র অদৃশ্য মারের মধ্যে তারা পার্থক্য দেখে না। দলনেতা প্রমোদ বাবুই বা তা দেখতে যাবেন কেন? যেমন করুন, সন্ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা বিপক্ষ বিনাশ ও দলের শক্তিবৃদ্ধির নীতি, যা বিগত পাঁচ বছর ধরে পশ্চিম বাংলাকে আবৃত করে রেখেছে। সি, পি, এম ক্যাডার ও সমর্থকদের হাতে এই সময়ে নিহত নর-নারীর সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশী। তাতেও প্রমোদ বাবুর দুঃখ বোধ অথবা বিব্রত বোধের কোন কারণ ছিল না। কারণ, কমিউনিস্ট দল বড় হয় পেশীর জোরে মার্কসতত্ত্বের ব্যাখ্যায় নয়। পশ্চিম বঙ্গে দল বৃদ্ধির সেই আদি ও অকৃত্রিম বস্তুর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নগদ প্রাপ্তির সুযোগ ও বিচিত্র নানা সম্ভাবনা।

এ ব্যাপারে রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাসগুপ্ত কি মত পোষণ করতেন জানবার কথা নয়। তিনি তো কমিউনিস্ট নীতি মালার বইয়ের মানুষ ছিলেন না। বরং বিপরীত কিছু বললে, যেমন বিবেক মানবতা ইত্যাদি, তাকে কপট বলতে হত।

অনেকে অতুল্য ঘোষ ও প্রমোদ দাশগুপ্তের নাম একসঙ্গে বলতে ভালবাসেন। একজন কংগ্রেসের, অন্যজন সি, পি, এম- এর দলনেতা। সংগঠন কৃতিত্বের জন্য উভয়কে তুলামূল্য তারিফ দিয়ে তারা বাহবা কুড়াতে চান। তারা ভুলে যান যে, অতুল্যবাবু দলের সর্বনাশ করে, পরাজয়- গ্লানি মুখে মেখে, রাজনৈতিক মঞ্চ ছেড়েছেন, আর প্রমোদবাবু দলকে বড় করে শক্তিতে বসিয়ে, জয়মালা কণ্ঠে নিয়ে, বিশ্বমঞ্চ ছেড়ে গেলেন। আর একটি বিষয়েও উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান ছিল। অতুল্যবাবু ছিলেন দীপ্তিময় গ্রহ ডাঃ বিধানের উপগ্রহ বিশেষ, গ্রহের আলোকে উপগ্রহ ছিল আলোকিত। গ্রহের

অবলুপ্তির সঙ্গে উপগ্রহের পতন হতে বিলম্ব হয় নি। অনেকের মতে তিনি ডা: রায়ের এক অপরিহার্য কুগ্রহ ছিলেন। অতদূর বলা হয়ত ঠিক নয়।

পক্ষান্তরে প্রমোদবাবু নিজেই ছিলেন গ্রহ বিশেষ তাঁর আলো এবং তাঁর অন্ধকার তার নিজেরই আহ্নিক গতির।

১৯৭৭ সালে পাকাপাকি ভাবে ক্ষমতায় বসার আগে এ রাজ্যে সি পি এম-এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৩৮হাজার। বর্তমানে দলের সদস্য সংখ্যা ৯৫ হাজার। সদস্য ছাড়াও নানা স্তরের বেতনভুক কর্মী ও ক্যাডার এবং সক্রিয় সমর্থকের সংখ্যা হয়ত লক্ষ হবে। আলিমুদ্দিন ষ্ট্রীটের প্রাসাদোপম পার্টি অফিস, জেলাগুলির পার্টি অফিস এবং ভাল পার্টি তহবিল গঠনের মূলেও প্রমোদবাবুর কৃতিত্ব অপরিসীম। বিরাট সংখ্যক বেতনভুক কর্মীর ব্যয়ভার, রাজ্যব্যাপী বাড়ি গাড়ির জন্য আবশ্যক অর্থ, সংগঠন খরচা ইত্যাদি, রাজ্য সম্পাদক কোথায় পেতেন, কিভাবে সংগ্রহ করতেন ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

তবে সর্বহারাদের পার্টিতে সম্পদের প্লাবন এবং সদস্য তালিকা ক্ষেত্রে বনভূমির বিস্তার, পার্টির গুণগতউৎকর্ষ বাড়িয়েছে কি না গবেষণার বিষয়। পার্টির এবংবিধ আকস্মিক বৃদ্ধি ডাক্তারি শাস্ত্র কথিত malignant growth কিনা বলাও শক্ত। সম্প্রতি পার্টির সাধারণ সম্পাদক নামবুদিরিপাদ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য কমিটির উদ্যোগে কম্বল ঝাড়াই-এর জন্য যে সতর্ক বাণী দিয়েছেন, তা থেকে দলের অবস্থা কিছুটা বোঝা যায়। 'প্রভু কহে এহো বাহ্য আগে কহ আর।' থাক সে কথা আজ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের কাছে প্রমোদ দাশগুপ্ত একদিন মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিয়ে নির্যাতন বরণ করেছিলেন সেটিই বড় কথা। সেদিনের সেই স্মৃতি তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে আমৃত্যু মনে রাখবে। আজকের কথা—

"সব তর্ক হোক শেষ সব রাগ সব দ্বেষ
সকল বালাই।
বল শান্তি বল শান্তি দেহ সাথে সব ক্লান্তি
পুড়ে হোক ছাই"

—

(৪ পৃ: পর)

এর বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে জনগণের সাহায্যে আসার চেষ্টা করলেও তারা সফল হতে পারছে না এখনো, নিজেদের মধ্যে মত বিরোধের ফলে যা সত্যই দুঃখ জনক। এ রাজ্যের মানুষ কংগ্রেস (ই) দলের ওপর অনেক ভরসা রাখে, অথচ তারা বামফ্রন্টের অত্যাচার থেকে জনগণকে রক্ষা করতে পারছে না যে কেন, তা রহস্যাবৃত। এস, ইউ, সি তার যতটুকু শক্তি ততটুকু নিয়েই কোন কোন এলাকায় জনস্বার্থ রক্ষার জন্য সি, পি, এম দলের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করছে। তাদের তৎপরতাকে কার্য্যকারী দেখা যায়। অন্যান্য বিরোধীরা আরও দৃঢ় ও সক্রিয় ভূমিকা নিলে জন সমর্থন নিশ্চয়ই পাবে। সর্ব্বাগ্রে কংগ্রেস (ই) কে এগিয়ে আসতে হবে।

●

সংবাদ বিচিত্রা

সত্যদাস বৈরাগী

"Peace is to be produced by action, not by negotiation."

—Cicero

সি. পি. এম নীতিগতভাবে আনন্দপুর প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। দলের পলিট ব্যুরোর মতে এই প্রস্তাবে মূলতঃ রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতাদান এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের কথাই তুলে ধরা হয়েছে। (আঃ বাঃ ২৫। ১১। ৮২) আকালিদের আনন্দপুর সাহেব প্রস্তাবে কি আছে? তাতে বলা হয়েছে ১)শিখরা একটি স্বতন্ত্র জাতি ২)শিখদের জন্য চাই একটি সার্বভৌম স্বতন্ত্র বাসভূমি এবং ৩) একটি পৃথক সংবিধান। খালিস্থান দাবি এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত। বৃহত্তর পানজাবী সুবা আন্দোলন খালিস্থান আন্দোলনের প্রথম কিস্তি।

১৯৪০ সালে গৃহীত মুসলিম লিগের লাহোর প্রস্তাবে পাকিস্থান দাবির সহিত আনন্দপুর প্রস্তাব মিলিয়ে দেখুন, দেখবেন বয়ান সুর ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উভয় প্রস্তাব অভিন্ন। আপনার বুঝতে ভুল হবে না, প্রস্তাব দুটির মুসাবেদা একটি হাতের। এর নাম কি রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দান? ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মুসলিম লিগের পাকিস্থান দাবি সমর্থন করেছিল এবং চাঁদ আঁকা সবুজ পতাকার পাশে কাস্তে ও হাতুড়ি মার্কা লাল ঝাণ্ডা তুলে, লিগের হাতে হাত রেখে, পথে পথে 'পাকিস্থান জিন্দাবাদ' হুঙ্কা মেরে মিছিলে ঘুরেছিল। সি, পি এম সেই কমিউনিস্ট পার্টির ভ্যানগার্ড, সুতরাং সি, পি, এম আকালি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে সমর্থন করবে এতে আশ্চর্যের কি বা আছে। গর্ভবাস কালে বৈপিত্র সংযোগে জাতীয় সংহতি নাশের যে ইঞ্জেক্সন তাদের কানে দেওয়া হয়েছে, সে মন্ত্র প্রভাব থেকে তারা মুক্ত হবে কি ভাবে? এ সম্পর্কে ২৬/১১/৮২ তারিখে আনন্দবাজারের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে প্রশ্ন করা হয়েছে 'সি. পি. এম কী চাহে?' উত্তরটা সত্যদাস দিতে পারে।

সি. পি, এম-এর চোখে একটি স্বপ্ন, মনে একটি আশা—ভারতের রাজ্যগুলি পরস্পর কলহের আগুনে জ্বলুক, মস্তানরা সমাজ শৃঙ্খলা ভেঙ্গে দিক, কেন্দ্র বেসামাল হোক এবং সেই সুযোগে পার্টি দিকে দিকে বিপ্লবের লাল ঝাণ্ডা তুলুক। তারপর, পাশের ভ্রাতৃপ্রতিম কোন শক্তিকে আহ্বান। ব্যস, 'তখন খুসি হবে সে, খুসি হব আমি সব লেঠা যাবে চুকিয়া' কমিউনিস্ট সম্প্রসারণবাদের এই তত্ত্ব সকলেই জানেন। তাতে ক্ষোভ, দুঃখ বিস্ময় কিছুই নেই। দুঃখ শুধু এই ভেবে যে, বহু কষ্টে বহুজনের আত্মবলিদানের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় স্বাধীনতা ও সংস্কৃতি রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব আজ যাঁদের উপর অর্পিত তাঁরা যেন কমিউনিস্ট বিপদ সম্পর্কে যথেষ্ট

সচেতন নন। এবং দেশের বেশ কিছু সুধীজন অন্ধ মোহে, অথবা খ্যাতি ও ক্ষমতার লোভে সি. পি, এম-এর খাতায় নাম লেখান।

।। পরমাণু অস্ত্র সংবরণ/দুর্বলের বৃথা নিবেদন ।।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে ২৩-১১-৮২ তারিখে আণবিক অস্ত্র ব্যবহার নিষিদ্ধ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাব উত্থাপন করে ভারত, সমর্থন করে ১০৫টি দেশ, প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দেয় ১৬টি দেশ। প্রস্তাবের বিরোধীদের মধ্যে ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, পঃজার্মানী, অষ্ট্রেলিয়া, স্পেন, কানাডা প্রভৃতি। ভোটদানে বিরত ছিল জাপান, ইজরাইল, গ্রীস, ফিনল্যাণ্ড, অষ্ট্রিয়া প্রমুখ আটটি দেশ। 'ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাম' —মনুসংহিতা।

● ●

।। 'নবম': এশিয়াডে বাংলার মানহানি/যেমন কর্তা তেমনি কর্ম, বুদ্ধির ভাঁড়ে মা ভবানী ।।

দিল্লিতে নবম এশিয়াডের বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রদর্শিত 'নবম' বাংলার সাংস্কৃতিক মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে দিয়েছে। অযোগ্যতা সৃষ্ট অপ-সংস্কৃতির বহর প্রত্যেক বাঙ্গালী দর্শককে হতমান করেছে। অপরিমিত অর্থব্যয়ে এই ব্যর্থতা সংগ্রহের জন্য যারা দায়ী তাদের বিচার করা হোক। তা না করলে বাংলার লোক সংস্কৃতিকে কিছু বামফ্রন্ট আশ্রিত বিকৃতরুচি শিল্পীদের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না। শ্রদ্ধা থেকে পৌঁছবে শ্রাদ্ধে।

● ●

।। বোমাতৈরি কুটীর শিল্প, পিস্তল পাইপগান বানায় মিনি কারখানা। লাইসেন্সের বন্দুক লুঠের মাল, রাইফেল কেড়ে নেয় সিপাহী নড়ে না ।।

বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র খুঁজে বের করতে এবং ঐ সব অস্ত্র তৈরি ঠেকাতে কেন্দ্র রাজ্যগুলিকে বিশেষ অভিযান চালাবার নির্দেশ দিয়েছেন। ভয়ানক ধরণের অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্যই কেন্দ্রের এই ব্যবস্থা। যাতে আগ্নেয়াস্ত্র সমাজবিরোধীদের হাতে না যেতে পারে তার ব্যবস্থা করার বিষয় সরকার পর্যালোচনা করে দেখছেন। তার জন্য অস্ত্র আইন সংশোধনের কথাও বিবেচনা করা হচ্ছে। (পি, টি, আই ২৪-১১-৮২)

এতদিন পরে যাহোক কেন্দ্র অশান্তি উপদ্রবের মূলে হাত দিয়েছেন। একদল লোক আছেন যারা সমাজ বিরোধীর দুষ্কার্যকে অর্থনৈতিক কারণের পরিণতি বলে লঘু করতে চান, অপর একদল লোক রাজনৈতিক কারণের অজুহাত দেখিয়ে সমাজ বিরোধীদের খুন-জখমের অপরাধ থেকে মুক্তি দিয়ে, গলায় জয়মালা পরান। খুন খুনই, ডাকাতি ডাকাতিই। ভারতের ফৌজদারী আইনে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক খুনের মধ্যে অপরাধের তারতম্য নেই। কেন্দ্র যদি নরহত্যার জঘন্য অপরাধকে প্রশাসনিক ক্ষমতার বলে নাকচ করার অধিকারটি তুলে দেন এবং খুনের আসামীদের গ্রেপ্তার ও দণ্ডদানের জন্য কঠোরতর ব্যবস্থা গ্রহণের বিধি প্রবর্তন করেন, তাহলেই শুধু সমাজ বিরোধীদের দমন করা সম্ভব হবে।

অসাম্য ও দারিদ্র্য সব দেশেই আছে। প্রকৃতির নিয়মই অসমতা। প্রকৃতি কোন দুটি পদার্থই এক রকম করে সৃষ্টি করে না। অসাম্য আছে বলে খুনোখুনিকে প্রশ্রয় দিতে হবে এ কেমন কথা। জঙ্গলের আইন সভ্যসমাজে চলে না। চলতে

দেওয়া যায় না। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার সম্পর্কে একটা বড় সমস্যা হল, বহু ভি,আই, পি এবং রাজনৈতিক দলের দাদা হলেন বে-আইনি অস্ত্রের জিম্মাদার। তারাই দরকার মত অস্ত্রগুলি তুলে দেন তাদের আশ্রিত পোষা সমাজ বিরোধীদের হাতে। ওরা হল দলের আকসান স্কোয়াড। সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ পুলিশ ভুল করে ঐ ধরনের দাদাদের বাড়ি থেকে বে-আইনি অস্ত্রপাতি উদ্ধার করছে বলে সংবাদ বের হয় কিন্তু ঐ পর্যন্ত। তারপর গোপন আড়তদারের কি হল জানা যায় না। কেন্দ্র বিষয়টি পর্যালোচনার সূচীভুক্ত করলে ভাল হয়।

॥ বামফ্রন্টের নেতাদের সম্পর্কে সরকারি কর্মীদের শ্রদ্ধাভক্তি ক্রমেই কমছে কেন ? —বরুণ সেনগুপ্তর প্রবন্ধ (আ: বা: ২৫-১১-৮২) ॥

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত রাইটার্সের অলিন্দ নাটকের পরে কি বরুণবাবু এসত্য আবিষ্কার করলেন ? প্রবন্ধে বামফ্রন্টের উদ্দেশে তিনি কিছু নীতি উপদেশও দিয়েছেন। খুবই ভাল। 'নির্বাচন হবে না' ভবিষ্যত বক্তার কথা অমৃত সমান, কোনদিন কেউ যায় পায় না সন্ধান। শ্রদ্ধাভক্তির কথা কেউ আজকাল ভাবে না। না নেতা, না কর্মী, না সংবাদ পত্রের প্রতিবেদক। সকলেই তাড়া খাটেন। মোদ্দা কথা—যেল কড়ি মাখ তেল। যেমন তেল তেমন যেল। বরুণবাবু আবার ভোট বাকেসের ভেল্কির কথা তুলে বামপন্থীদের খোঁচা দিয়েছেন। বর্তমানে রাজনীতিই তো ভেলকিতে চলছে। কেউ করেন পর্দার আড়ালে, কেউ করেন প্রকাশ্যে মিস্ট ভাবণে। ভোট বাক্সের ভেলকিও তো একটা নির্বাচনী কৌশল ক্ষমতা দখলই আসল কথা। ক্ষমতাকে সবাই মানে ও শ্রদ্ধা করে। কারণ,

'Morality is always the product of terror' —Aldous Huxley.

———

সাবাস নবম এসিয়াড

(ক্রীড়া সাংবাদিক)

দিল্লীতে নভেম্বর মাসে এশিয়ার তেত্রিশটি দেশের মধ্যে যে ক্রীড়া প্রতিযোগীতা হয়েছে তা নিয়ে কিছু ওয়াই মেকার বা পণ্ডিত মূর্খদের বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কিছু রাজনীতিবিদ এর মধ্যে ছিলেন, যারা অন্ধ-আক্রোশে এবং ক্ষমতা দখলের ব্যর্থতায় দেশের প্রশাসক দলের বিরুদ্ধে নিরন্তর অর্থ হীন, যুক্তিহীন, বিদ্বেষে প্রসূত সমালোচনা অহরহই করে থাকেন। খালিস্তান-পন্থীরা, যারা আকালি-শিখদের অবিসম্বাদিত প্রতিনিধির করার মিথ্যা দাবী করে আসছেন, তারা ত গোটা অনুষ্ঠানটিকেই ব্যর্থ করে জাতির মুখে কলঙ্ক লেপন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। জাতীয় সরকারের দৃঢ়তায় তাদের দুষ্ট অভিসন্ধি পূরণ করতে তারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং এজন্য জাতীয় সরকার অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী করতে পারেন নিসংশয়ে।

এশিয়াড অনুষ্ঠান হঠাৎ কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পালন করা হয়নি। ভারতেই এ অনুষ্ঠানের পথিকৃৎ। প্রয়াত প্রধান মন্ত্রী জওহর লাল নেহরুই এই আন্দোলনের স্রষ্টা ছিলেন বললেও অত্যুক্তি করা হবেন। এই অনুষ্ঠানের মৌল উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র ও এগিয়ে চলার নীতিকেরূপায়িত করা। সেই থেকে প্রতি চার বছর অন্তর অনুষ্ঠান প্রতিপালিত হয়ে আসছে এশিয়া ভূখণ্ডের একটি দেশে। খেলাধূলার মধ্যে রাজনীতির প্রভাব খুব কমই থাকে। খেলোয়াড়দের বলা হয় প্রত্যেক দেশের বেসরকারী রাষ্ট্রদূত। তারা রাজ নীতির কলুষ-মুক্ত থেকে বিভিন্ন দেশের ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পান এবং পরস্পরকে ভালকরে জানবার সুযোগ পান, নিমন্ত্রণ কারী ও সংগঠক দেশটির সম্বন্ধে ব্যক্তিগত জ্ঞানঅর্জনও করতে পারেন। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে একটা বন্ধুত্বের সেতুবন্ধ গড়ে তোলেন এবং দেশে ফিরে গিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত ও দলগত অভিজ্ঞতার কথা নিজ নিজ দেশের মধ্যে প্রচার করেন। এর যে সুফলটা পাওয়া যায়, সেটা অমূল্য। এই ক্রীড়া বিদরা যেখানে বন্ধুত্ব আছে, একদিকে তার পরিধি বিস্তৃত করার এবং যেখানে ভুল বোঝাবুঝি আছে, সেটা দূর করে বন্ধুত্বের পরিবেশ গড়ে তোলার, সম্ভাবনাকে উজ্জলতর করে তোলেন। আজকের দুনিয়ায় যখন বিদ্বেষ, অকল্যাণকর প্রতিযোগীতা ও অসঙ্গত ভাবে প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করার অপপ্রয়াসের মাধ্যমে, বিশ্বশান্তি বিঘ্নিত হবার ও মানব জাতির ধ্বংস যজ্ঞের সম্ভাবনায়, মানব জাতি শঙ্কিত, উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত, সেই সঙ্কট কালে এই ধরণের অনুষ্ঠান শুধু অভিপ্রেতই নয়, বরং অভিনন্দনযোগ্য। এই ভারতের রাষ্ট্র প্রধানেরা এই কাজ করে অন্যায় কিছু করেন নি, অধিকন্তু বিশ্ব-শান্তি প্রচেষ্টায় প্রশংসনীয় অবদান রেখেছেন। তাই তাদের অকুণ্ঠ অভিনন্দন অবশ্যই প্রাপ্য।

এই অনুষ্ঠানের সফলতার উপর নিজ সংগঠন কারী দেশের গৌরব বৃদ্ধি করে, যে জন্য দেশবাসীর গর্ব বোধ করা উচিৎ। দিল্লীর নিখুঁত এশিয়াড, আমাদের দেশের গৌরবের মুকুটে আরো একটি উজ্জল পালক পরিয়ে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশের দল নায়কদের উক্তিগুলি উদ্ধৃত করাটা আদৌ অপ্রা-সঙ্গিক হবে না, বরং নিন্দুকদের ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটাবার পক্ষে সহায়ক হওয়া উচিৎ। অবশ্য কাণা গরুর পথ ভিন্ন বলে একটা কথা প্রচলিত

আছে। তাদের চৈতন্যোদয় না হলে অবশ্য সে জন্য এই প্রকার অনুষ্ঠানকে বর্জন করা যায় না কোন মতেই।

এই অনুষ্ঠানে যোগদান কারী কয়েকটি দেশের প্রধানদের মতব্য উদ্ধৃত করে দেওয়া আমরা কর্তব্য বলে মনে করি এবং আমাদের দেশের কয়েকটি মতলববাজ দল ও গোষ্ঠীর বাইরে দেশবাসী এতে আনন্দ লাভ করবেন, তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। "ভারত যে নিখুঁত এশিয়ান গেমসের আয়োজন করল, সে জন্য তাদের একটা সোনা পাওয়া উচিৎ' বলেছেন কুয়েলালামপুরের কাগজ 'ষ্টার'। মালেশিয়ার এবং সিঙ্গাপুরের সংবাদ পত্র, রেডিও ও টি, ভিতে দিল্লীর নবম এসিয়াডের খবর প্রচারিত হয়েছে ফলাও করে। ভারতের সাংগঠনিক কৃতিত্বের কথা ফিরছে এখানকার লোকের মুখে মুখে। এশিয়ার দেশগুলি থেকে বহু সাংবাদিক দিল্লীতে এসে ছিলেন এশিয়াডের খবর পাঠাতে। এতদিন পশ্চিমী সংবাদ পত্রগুলির মাধ্যমে এই সব দেশের জনগণের মনে ধারণা হয়েছিল, যে নানা হাঙ্গামা আর উত্তেজনার মধ্যে "গরিব দেশ ভারত" "মহারাজদের" চাপে এশিয়াডের আয়োজন করেছে। এখন নিজেদের কাগজ গুলিতে এশিয়ান গেমসের খবর পড়ে ভারত সম্পর্কে তাদের ভুল ধারণা ভেঙ্গেছে।

তারা এখন ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। নবম এশিয়াডে অংশগ্রহণ করেছে যে ৩৩টি দেশ, সেগুলির "সেফ-দা-মিশন"রা প্রায় সকলেই দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রাণখোলা প্রশংসা করেছেন। এশিয়ান গেমস্ ভিলেজ, এশিয়াড সেন্টার, ইন্দ্রপ্রস্থ ইনডোরষ্টেডিয়াম, শুটিং রেঞ্জ, যমুনা ভেলোড্রোম—এ সবই তৈরী করেছেন দিল্লী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ।

"সেফ দা মিশন"রা দিল্লীতে এসেছিলেন এশিয়াডে অংশ গ্রহণকারী বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে। এশিয়ান ভিলেজের ঘর গুলিতে এবং আই, টি, ভি, সির আতিথেয়তার প্রশংসা করতে গিয়ে তারা "চমৎকার অনুসনীয় দারুণ সুন্দর" প্রভৃতি বাছা বাছা বিশেষণে বিশেষিত করেছেন সব কিছুকে।

ইন্টারন্যাশানাল এমেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি বলেছেন, "এশিয়াড ও এশিয়াড ভিলেজের আয়োজনের সব ব্যবস্থাই নিখুঁত।" পাকিস্তানের "সেফ দা মিশন" কামার আলি মির্জা এশিয়াড ভিলেজ পরিচালন ব্যবস্থা এবং আতিথেয়তার প্রশংসা করেছেন প্রাণ খুলে। হংকংয়ের "সেফ দা মিশন" মিঃ সালেজ পুরো গেমসের সংগঠনকে অতুলনীয় বলে অভিহিত করেন। (আনন্দ বাজার পত্রিকার প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করেই এই সব মতামতকে উদ্ধৃত করা হল।)

সব চেয়ে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন সেই ইঞ্জিনিয়াররা, প্রযুক্তি বিদরা এবং যারা নানা স্তরে অক্লান্ত পরিশ্রম, আন্তরিকতা ও দেশ প্রেম উদ্বুদ্ধ করে অসাধ্য সাধন করেছেন মাত্র আঠার মাস সময়ের মধ্যে, যা অন্যদেশ করে চার বছর দীর্ঘ সময়ের মধ্যে। অবশ্য প্রশংসার দাবী করতে পারেন ভারতের নেতৃবৃন্দ যারা হীন সমালোচক ও বিঘ্ন সৃষ্টি কারীদের অপপ্রয়াস অগ্রাহ্য করে এই মহান অনুষ্ঠান সমাধা করেছেন। ধন্যবাদ প্রাপ্য ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্রিয়াবিদ্, কর্মকর্তা, যারা বন্ধুত্বের ও সৌভ্রাত্রের পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ও অকুণ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগীতা দিয়ে। এশিয়াডের মর্মবাণী —বন্ধুত্ব, সৌভ্রাত্র ও অগ্রগতি—এশিয়াতে, তথা সারা বিশ্বে প্রসারিত হোক, ব্যর্থ করে দিক সংঘর্ষ, বিদ্বেষ, ক্ষমতা মত্ততা পাশব শক্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে। আমরা জয়গান করি এশিয়াডের। সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাশা করব দেশের খেলাধূলার ক্ষেত্রে সুসংহত হবে এবং আমাদের ছেলেরা আগামী এশিয়াডেও সাফল্য অর্জন করে দেশের গৌরব বৃদ্ধি করবে।

Regd No. R. N. 24511/71
DAVP—Regd
বার্ষিক :—সডাক ১৮.০০ টাকা

Biplabi Bangla
Phone : 34-1795
ষান্মাষিক :—১০.০০ টাকা

P. Regd. WB/NC 77
মূল্য—০৫ পয়সা

।। সম্পাদক ।।
শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীকামাখ্যা রায়
শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ

বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা
পড়ুন
ও
পড়ান

৩০

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রমোহন রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ মজুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৫০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামে মা ও মেয়ে—.৫০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। [illegible]ভাষচন্দ্র—.৫০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদি[illegible] ১৩। দেশ বাঘের ডোরেমি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের ডোরেমি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হার্ডিঞ্জ হত্যা প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৫০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫৩

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
সৈকত শ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

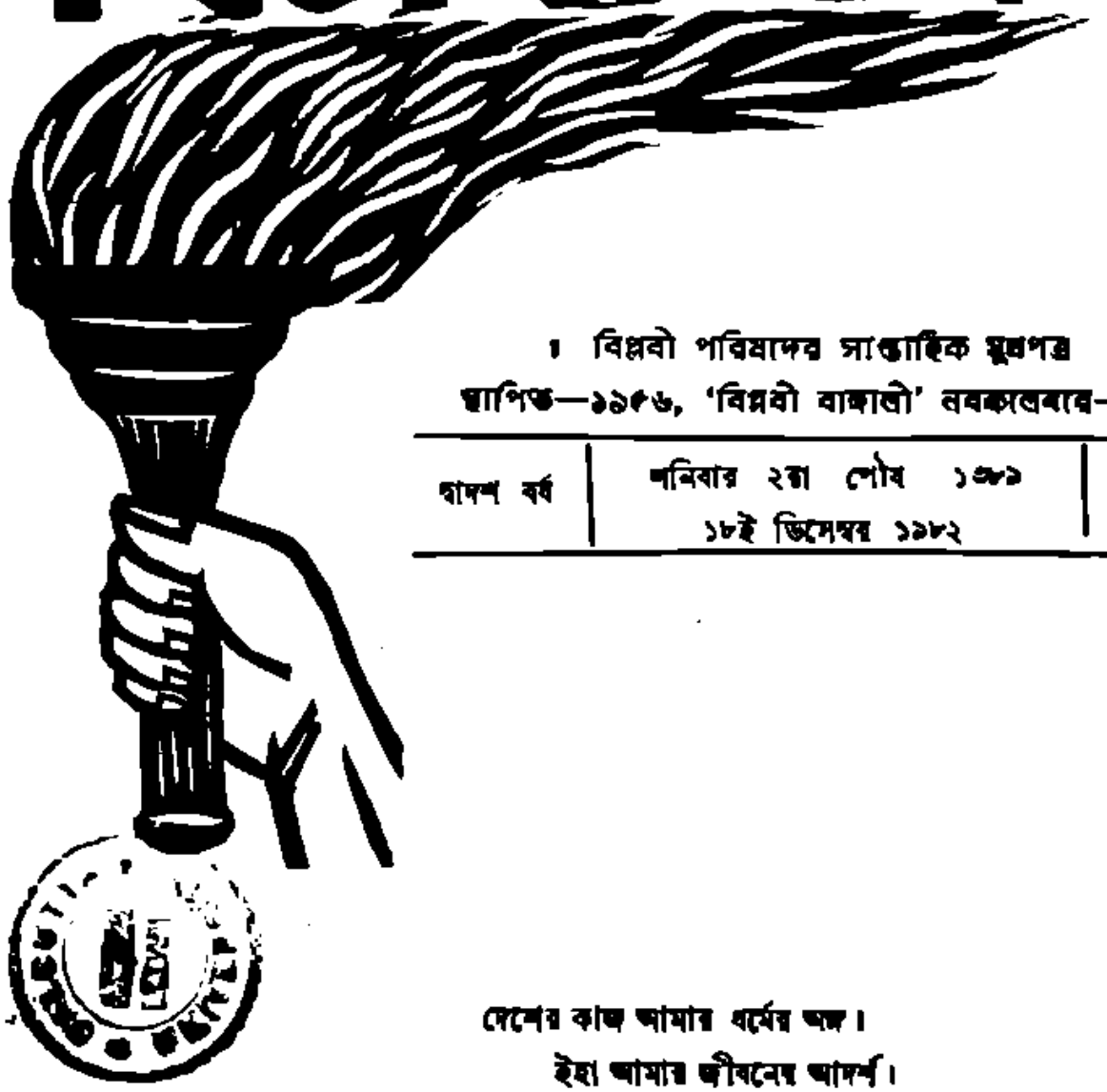

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ২রা পৌষ ১৩৮৯ ১৮ই ডিসেম্বর ১৯৮২	১২ সংখ্যা

দেশের কাজ আমার ধর্মের অঙ্গ।
ইহা আমার জীবনের আদর্শ।
আমার দেশের কল্পনায় আমি
ভগবানের মূর্ত্তি দেখতে পাই।

—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন।

সম্পাদকীয়

'জল ঢেলে ফুটাপাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার'

সম্প্রতি কয়েকটি ক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিশ্চিতভাবে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার দ্বারা সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠবে। মূল্যবৃদ্ধি তারা করবেনই এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। অপেক্ষা শুধু জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া কতটা হতে পারে। এর ফলে প্রশাসক দলগুলির ভবিষ্যৎ কতটা বিপন্ন হতে পারে, তার আঁচ করার পর্বটা সমাধা করা পর্যন্ত। বামফ্রন্ট কমিটি গঠন করে বিচার বিশ্লেষণ করার ভার তাদের উপর দিয়েছেন বলে যেটা প্রকাশ করেছেন, সেটা নিছক ধোঁকা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তারা কমিটির বিচার্য্য বিষয়ের মধ্যে এ নির্দেশ দেননি যে কেন এত লোকসান হচ্ছে পরিবহন সংস্থায়, দুগ্ধ প্রকল্প প্রতিষ্ঠানে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে, চুরি কর্তব্য-কর্মে অবহেলা, কর্মীদের উচ্ছৃঙ্খলতা এর জন্য কতটা দায়ী, তা নির্দ্ধারণ করতেও বলেননি। সেই শোচনীয় পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণীয়, তা নির্দেশ করতেও বলেননি। এই অবশ্যকরণীয় কাজ সমাধা করা গেলে, লোকসানের বহরটা কতটা কমতে পারে, সেটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর, কত অল্প পরিমাণে ভাড়া বাড়ালে চলতে পারে. সে সম্বন্ধে সরকারের আন্তরিক মানসিকতার কোন খাঁকর নেই। এরা ভরসা করে আছেন যে বর্তমান বিধান সভায় গাণিতিক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাদের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পারবেন। সেজন্য সাধারণ মানুষের উপর অবাধে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালিয়ে যাবার জন্য কোন আশঙ্কা, কোন বিবেচনা, কোন দরদ, কোন চক্ষুলজ্জা, কোন বিবেকের দংশন অনুভব করছেনা বামফ্রন্ট সরকার। এদের এই শোষণ-নীতিটা কত অসার, সেটা প্রমাণিত হবে পরিস্থিতিটার একটু সমীক্ষা করলে।

প্রথমেই ধরুন, দুগ্ধ প্রকল্পের ব্যাপারটি। খবরে প্রকাশ. দুগ্ধ প্রকল্প প্রায় ভেঙ্গে পড়ার মুখে। এখন বিভাগীয় মন্ত্রী সাফাই গাইছেন যে একসঙ্গে প্রায় দুইশত কর্মী (অন্য প্রদেশের) কোন ছুটি না নিয়েই, কোন অনুমতি না নিয়েই একসঙ্গে হঠাৎ কর্মস্থল ত্যাগ করে, "দেসাওয়ালাদের সঙ্গে মিলতে চলে গিয়েছেন।" অবশ্য এটা গর্হিত কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু এইসব কর্মী এই সময়ে অনুপস্থিত

থাকে এটা কি বিভাগীয় কর্মকর্তারা জানতেন না? হটাৎ আকাশ থেকে পড়ার অভিনয় করছেন কেন? এবারের সংখ্যাটা হয়ত পরিমাণে একটু বেশী হয়েছে। কিন্তু কেন? এদের ভরসা হল, মন্ত্রী মহাশয় নিজেই বলেছেন, যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে এদের চাকুরী খোয়াতে হবেনা। এটাকে তিনি সরকারের পক্ষে গৌরব ভেবেছেন কিনা কিম্বা সরকারকে তাচ্ছিল্য করার ভাবনা প্রসূত কিনা সেকথা বলেননি। হয়ত লজ্জা এসে বাধা দিয়েছে। কিন্তু এখনকার রাজনীতিবিদদের লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, তিন থাকিতে নয়, এটাই মানসিকতা। কিন্তু "এহ বাহ্য"। কাজে গাফিলতি, বোতলভাঙ্গা, দুধ পাচার করে দেওয়া, ইত্যাদি প্রকারের কুৎসিত ব্যাধিত এই প্রতিষ্ঠানে বহুদিন ধরেই চলছে বিনা বাধায়, শাস্তি বিধানের কোন ব্যবস্থা না থাকায়। সারারাজ্য জুড়েই সমাজবিরোধীদেরই শুধু নয়, অফিস আদালত, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, সর্বত্রই এই রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন রাজনৈতিক দলের প্রশ্রয়ে। এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা মৌল মানসিক বিকৃতির একটি অঙ্গমাত্র।

যা ইচ্ছা তাই করব, এমন কি নরহত্যা, নারীধর্ষণ করব কিছুই হবেনা, 'দাদারা' যতদিন পেছনে আছে। অথচ তাজ্জব ব্যাপার এটাই যে এদের পদোন্নতিও হয়, ভলবও বাড়ে, বোনাস পেতেও কোন বাধা হয়না।

তারপর পরিবহন বিভাগের প্রশ্নে এসেও এই একই পরিস্থিতি বিদ্যমান বলে দেখা যায়। একটি বাসের পেছনে নাকি ২৪জন কর্মী নিযুক্ত আছেন। দলবাজির খাতিরে যে যখন ক্ষমতায় আসেন, তখন চোখ কাণ বুজে, অর্থ নৈতিক বিষয়টির উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে, নিজেদের দলীয় লোকদের নিয়োগ করে ও প্রশ্রয় দেয়। ফলে কাজের চেয়ে অকাজই হয় বেশী। এদিকে নজর না দিয়ে এই অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলা না করে, দশ বিশ পয়সা ভাড়া বাড়ালেই সব সমস্যার সমাধান হবে বলে যে বিশ্বাস করে, সে একটি হস্তীমূর্খ বাতীত অন্য কিছু নয়।

পরিশেষে ইলেকট্রিক চার্জের কথায় আসা যাক্। উৎপাদন হবে না, লোককে চির অন্ধকারে রাখা হবে, কলকারখানা বন্ধ হবে, সেচের পাম্প অচল থাকবে, খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হবেনা যথাযথ, কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হবে, বিদ্যুতের অভাবে, তার দাম বাড়িয়ে দিতে চায় এরা কোন মুখে? কোন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক বলেছেন যে এটা যতটা না যান্ত্রিক গোলযোগসৃষ্ট, তার চেয়ে অনেক বেশী মনুষ্যসৃষ্ট। দলবাজীর জন্য কতটা উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, তার তদন্ত করা হয়েছে কি? হলে অপরাধী যারা, তাদের কোন শাস্তি দেওয়া হয়েছে কি? কর্তব্যপরায়ণতা, শৃঙ্খলাবোধ, সৎ প্রচেষ্টা

বজায় রাখতে পারলে, কতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সেটা সমীক্ষা করা হয়েছেকি? উৎপাদন-শক্তির অন্ততঃ পঞ্চাশ শতাংশ উৎপাদন করতে পারলে, পশ্চিমবঙ্গের চেহারা ফিরে যেত, এসত্য বর্তমান সরকার এবং বদ্ধ উন্মাদ ব্যাতীত সকলেই স্বীকার করবেন। প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি করতে পারলে, আন্তরিক প্রচেষ্টা থাকলে কি করা যায়, তার জলন্ত প্রমাণ রেখেছে ডি, ভি, সি এবং হলে ডি, পি, এল।

দুধের মত অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যের জন্য, সাধারণ মানুষের সস্তায় পরিবহন ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য, সরকারী ভর্তুকী দেওয়াটা কোন অন্যায় কাজ নয়, বিশেষ করে কল্যাণমূলক একটি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে। কিন্তু তার একটা সীমা থাকা উচিৎ। আর অন্যায়কারীদের প্রশ্রয় দেওয়ার জন্য একাজ করা হলেতো সেটা নিশ্চয়ই একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হওয়া উচিৎ। সব ফাঁক ফোঁকর বন্ধ করার পরই কোন সভ্য সরকারের অধিকার থাকতে পারে কিছুটা পরিমাণে ঘাটতি পূরণ করার ব্যাপারে। অন্যথায় এটা হবে despotism বা স্বৈরতন্ত্র এবং সেটাই করতে প্রয়াসী হয়েছেন বাক্‌সর্বস্ব জনদরদী বলে দাবীদার সরকার। তাদের অপদার্থতা, অযোগ্যতা ব্যর্থতার জন্য, জনসাধারণ-নামক গৌরী সেনরা যত টাকা লাগে, দেবে কেন এই প্রশ্নের উত্তর দাবী করে পশ্চিমবঙ্গের অগণিত সাধারণ মানুষ।

বিভাগীয় গলদ, ভ্রান্তনীতির পরিবর্তন সাধন না করে, যত মূল্যই বাড়ানো হোকনা কেন সেটা হবে 'জল ঢেলে ফুটা পাত্রে, বৃথা চেষ্টা তৃষ্ণা মেটাবার' মত হাসাকর প্রচেষ্টা। রাজনীতিবিদদের হৃদ-য়ঙ্গম করা ভাল যে রাজনীতিক্ষেত্রে ফুলের মালা ও জুতার মালার ব্যবধান অতি সামান্যই। ইতিহাস এই সাক্ষ্যই দিয়েছে বারবার। এক্ষেত্রেও তার কোন ব্যত্যয় হবে না আমরা মনে করি।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী নেহরু

ডাঃ জ্যোতির্ময় দত্ত

পৃথিবীতে বিভিন্ন ধ্যান ধারণার সমন্বয়ের অপূর্ব ক্ষেত্র যদি কোথাও থেকে থাকে তা বোধহয় আমাদের ভারতবর্ষ। অতীতে প্রাচ্যের বা পাশ্চাত্যের প্রতি দেশই কোন না কোন সময়ে বিদেশী শক্তির দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং কিছু সময়ের জন্য অধিকৃতও হয়েছে। কিন্তু কোথাও আক্রান্ত ও আক্রমন কারীদের চিন্তাধারা দর্শন ও ধর্মের এমন সমন্বয় ঘটেনি যেমন ঘটেছে ভারতে। ভারতে আর্যরা এসেছে, রাজত্ব করেছে কিন্তু ভারতের মাটিতে বাস করে ভারতীয় হয়ে গেছে। আদর্শগত সংগ্রাম কিছুকাল চালিয়ে গিয়ে দেশের চলতি ধ্যানধারণার সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে নতুন ধ্যানধারণার সৃষ্টি হয়েছে, যেক্ষেত্রে সমন্বয় সম্ভব হয়নি সেখানে হয়েছে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। ভারতের এই ধারা থেকে বহিরাগত বা এই মাটিতেই উদ্ভূত কোন ধ্যান ধারণাই রেহাই পায়নি। বৈদিক যুগে নিরাকারবাদিরা পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে কম লড়াই করেনি। সে লড়াইএর নিষ্পত্তি হয়েছে সমন্বয়ে। বৌদ্ধধর্ম তন্ত্রের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। মোগল সম্রাট আকবর ভারতের এই ধারা বুঝেছিলেন বলেই তিনি ধর্মে সমন্বয়ের পথে এগিয়েছিলেন, এর জন্য তিনি জনপ্রিয়ও হয়েছিলেন। তাই ভারতবাসীকে সনাতন রক্ষণশীল বললে ভুল হবে। একথা ঠিক যে ভারতীয়রা সহজে তাদের নিজেদের ধ্যানধারণা পরিহার করেনা। কিন্তু কোন নবাগত ধ্যানধারণাকেও নস্যাৎ করেনা। কিছু সময়ের জন্য আদর্শগত সংগ্রাম হয়তো হয় কিন্তু তা স্বল্প সময়ের জন্য।

এই সমন্বয়ের পরেই দেখা যায় সহ অবস্থান অথবা সমন্বয়। ভিন্নমতবাদ বা এমনকি পরস্পর বিরোধী মতবাদের সহাবস্থান ভাল কি মন্দ এ আমাদের আলোচ্য বিষয় নয় – আমি শুধু-ভারতের এই বিশেষ অবস্থার কথা উল্লেখ করছি। ভারতের এই বিশেষ অবস্থার প্রকৃত প্রতিনিধি হিসাবে যদি চিহ্নিত করতে হয় তবে চিহ্নিত করতে হবে ভারতের জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নেহরুকে। ভারতের কোন নেতাই বোধ হয় তার মতো পরস্পর বিরোধী মতবাদের ধারক ছিলেন না। এই কারণেই বামপন্থীরা তাঁকে সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি তেমনি সনাতনী রক্ষণশীলরাও বুঝতে পারেননি।

পাশ্চাত্যের ইতিহাস নেহরুর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। তিনি নিজেও স্বীকার করেছেন যে তিনি ভারতকে দেখতে শুরু করেছিলেন পশ্চিমের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে। পশ্চিমে তখন সর্ববৃহৎ ঘটনা রাশিয়ার বিপ্লব। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ তখন সমস্ত প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। নেহরুর চিন্তাধারায় স্বাভাবিকভাবেই তৎকালিন যুগচিন্তার প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি নিজে লিখছেন—মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। মার্কস ও লেনিন অনুধাবন আমার ইতিহাসের ধারা বুঝতে ও বর্তমান ঘটনাপ্রবাহ বুঝতে সাহায্য করেছে।

১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে নেহরু ঘোষণা করলেন—"আমার দৃঢ় প্রত্যয় যে বর্তমান দুনিয়ার ও ভারতের সমস্ত সমস্যার সমাধান নিহিত

রয়েছে সমাজতন্ত্রে। 'সমাজতন্ত্র' কথাটা ব্যবহার করছি ধোঁয়াটে মানবিক অর্থে নয়, আমি বলতে চাইছি বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক অর্থে....।"

সদ্যমুক্ত দেশগুলিতে পুঁজিবাদ যে অচল সে সম্বন্ধে নেহরুর ধারণা ছিল অত্যন্ত পরিষ্কার। তিনি বলেছেন, "আমরা কি বৃটেন, ফরাসী বা আমেরিকার রাস্তায় অগ্রসর হতে পারি? আমরা কি ১০০/১৫০ বছর দেশের ক্রমোন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারি?....আমরা তাহলে শেষ হয়ে যাবো।'

স্বাধীনোত্তর ভারত কিন্তু নেহরুর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক রাস্তা নেয়নি। বলাবাহুল্য ভারত অনুসরণ করেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। নেহরু অবশ্য বলতেন "Welfare state—" সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের রাষ্ট্র" যে সব কথা পূর্বকালে তিনি নিজেই নাকচ করেছেন। "সকলের সমান সুযোগ" দিয়ে যে দেশ গঠন হয়না এ তার থেকে বেশী কেজানত!

অর্থাৎ অতীতের নেহরু যিনি প্রকৃত বিপ্লবী গণতন্ত্রী—স্বাধীনতার পর তিনিই হয়ে গেলেন বুর্জোয়া নেতা।

অবশ্য একথা সত্য যে রাশিয়ার বিপ্লবোত্তর দুনিয়ার মূল প্রবাহ থেকে তিনি কোনদিনই সরে দাঁড়াননি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধীতা ছিল তাঁর রক্তের প্রতিটি কোষে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রবল তাড়নাই তাঁকে অবশ্যম্ভাবীভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশের অতি নিকটে নিয়ে এসেছিল। একথা সত্য নয় যে আমেরিকা ও বৃটেনের কাছ থেকে বেশী আদায় করবার জন্য তিনি রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বতার খেলা খেলেছিলেন। একথা আজ প্রমাণিত।

ভারতে যদি শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন প্রবল হতো এবং কমিউনিস্ট পার্টি যদি সঠিক পথে চলত তবে এই নেহেরুকেই আমরা কোন্ রূপে দেখতাম তা বলা শক্ত। তবে একথা অনুমান করা অন্যায় হবে না যে দেশে শ্রমিক আন্দোলন প্রবল থাকলে এবং কমিউনিস্ট পার্টি কংগ্রেসের ভিতরের গণতন্ত্রী দের একত্রিত করতে পারলে নেহরুকে বিপ্লবী গণতন্ত্রীরূপেই হয়তো পাওয়া যেত। শ্রমিক আন্দোলন জোরদার ছিলনা বলেই নেহরুর পক্ষে দেশের রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো সম্ভব হয়নি।

প্রবন্ধের গোড়াতেই বলেছি যে ভারত নূতনকে যেমন গ্রহণ করতে পিছপাও নয়, তেমনি পুরাতন সনাতনী ধ্যানধারণাও সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে রাজি নয়। নেহরুর মনেও যে এই ভারতীয় ধারা ছিলনা তা নয়। তিনি হয়তো সত্যই চেয়ে ছিলেন সনাতনী ধারণার সঙ্গে বৈপ্লবীক ধারণার সমন্বয় ঘটাতে। নেহরুকে বুঝতে হলে ভারতীয়দের এই বিশেষ বিশেষত্ব ভুললে চলবেনা।

যাই হোক, নেহরু যে পথেই দেশ চালাবার চেষ্টা করেছিলেন না কেন, বা তাঁর ধারণার সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা যতই অবাস্তব হোক্ না কেন এ কথা সত্য যে তিনি কখনোই দুনিয়ার মূলপ্রবাহ —সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন না। (ক্রমশ)

ইংরেজ তৈরী কংগ্রেস, কি করে ইংরেজ হটাও প্রতিষ্ঠান হল

ব্রজেন্দ্র চন্দ্র দাস

১৮৮৫ সালে সারা ভারত হতে ৭২ জন প্রতিনিধি বোম্বাই সহরে মিলিত হলেন, গঠিত হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সভাপতি হলেন উমেশ চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় (W. C. Banerjee), নেতৃত্ব দিলেন আই, সি, এস আলান অক্টেভিয়ান হিউম। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জয়ধ্বনি দিয়ে অধিবেশন সমাপ্ত হল। ব্যবস্থাপক সভায় কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধি নেওয়ার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানায়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইংরেজ কেন কংগ্রেস গঠন করল এবং এই কংগ্রেস কি ভাবে কোটি কোটি দেশ ভক্তের বিপ্লবী হাতিয়ার হয়েছিল সেই সমস্ত তথ্য কিছু কিছু তুলে ধরাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

অ্যালেন অক্টেভিয়ান হিউম ছিলেন জবরদস্ত আই, সি. এস। হিউমের জীবনী লেখক স্যার উইলিয়ম ওয়েডবরর্ণ লিখেছেন যে প্রায় ত্রিশ হাজার গোয়েন্দা রিপোর্ট পড়ে হিউমের আশংকা হয়েছিল যে একটা দারুণ বিপ্লব আসন্ন এবং শিক্ষিতের মধ্যে কেউ কেউ এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব করতে প্রস্তুত। বড়লাট ডাফরিণের সঙ্গে এই ব্যাপারে হিউমের পরামর্শ হয়। জাতীয়তার শক্তি বেড়ে উঠেছে, ভারতীয়রা নিজেদের চেষ্টায় সর্ব ভারতীয় সংস্থা গড়ছে দেশে জাতীয় আন্দোলনের মোড় ফিরিয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বড়লাট ডাফরিণের অনুমোদনে হিউম কংগ্রেসের পত্তন করেছিলেন।

তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় দেশের লোক নিয়বে ইংরেজ শাসনের অত্যাচার সহ্য করেনি। ১৮৫৯-৬০ সালে বাংলা দেশের চাষীরা বিদেশী নীলকরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। হাজার হাজার সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ১৮৫৯ সালের প্রজাস্বত্ব আইনের বিরুদ্ধে পাবনা অঞ্চলের চাষীরা ১৮৭২-৭৩ সালে দক্ষিণাঞ্চলের নানা স্থানে চাষীদের অভ্যুত্থান ঘটে, তার ফলে নতুন আইন প্রণয়ন করতে হয়। এই সময় হতেই সারা ভারতের মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠেন। বাংলা ও ইংরাজী সংবাদপত্রে বহু প্রতিবন্ধক সত্বেও ইংরেজের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রচারে নামলেন। ১৮৪৩ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি গঠিত হল। ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন নামে এর পুনর্গঠন হল। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণ দাস পাল প্রভৃতি এর নেতা ছিলেন। ১৮৭৬ সালে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন স্থাপিত হয়। পশ্চিম ভারতে দাদাভাই নৌরজী প্রমুখের চেষ্টায় বোম্বাই এসোসিয়েশন (পরবর্ত্তী নাম ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন) স্থাপিত হয়। মাদ্রাজেও মহাজন সভা স্থাপিত হয় ১৮৮১ সালে। ভারত সভার উদ্যোগে কলিকাতায় ১৮৮৩ সালে প্রথম নিখিল ভারত জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৭৭ সালে আই, সি, এস পরীক্ষা সম্বন্ধে ভারতবাসীর দাবী নিয়ে সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় সমগ্র ভারত পরিক্রমা করেন, বাগ্মিতায় সর্বত্র সর্ব ভারতীয় ঐক্যের বীজ রোপণ করা হয়। সুরেন্দ্র নাথকেই ভারতের জাতীয় জাগরণের অগ্রদূত বলা যায়। ইলবার্ট বিল নিয়ে ইংরেজের চরম ঔদ্ধত্য ভারতবাসীকে সংগঠিত আন্দোলনের শক্তি দিয়ে ছিল।

এই পরিস্থিতিতে ডাফরিণ হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেও আন্দোলনের মোড় ফিরাতে না পেরে

ডাফ্‌রিন ১৮৮৬ সালে ওদেরই প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসকে ভারতের বিরাট জনসংখ্যার মধ্যে আনুবীক্ষণিক কয়েক জনের চক্রান্ত বলে বিদ্রোহ করলেন। প্রথম তিন বছর রাজপুরুষেরা কংগ্রেসের মঞ্চে উপবেশন করেছেন, বড়লাট, ছোটলাট কংগ্রেসের নেতাদের আপ্যায়ন করতেন। ১৮৯০ সালে বাংলা সরকার সমস্ত কর্মচারিকে জানিয়ে দেন যে দর্শক হিসাবেও কেউ কংগ্রেসে যোগ দিতে পারবে না। তখনও কংগ্রেসের মনোভাব অত্যন্ত নরম। রাজভক্তিমূলক প্রস্তাব প্রথমে গৃহীত হত। চাক্ষুষ্যকর বক্তৃতার বিষয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা কিংবা বিচার ও শাসন স্বতন্ত্রী করণ দাবী। তবুও কংগ্রেস সংগঠনের ব্যাপকতা দেখে ইংরেজ সরকার সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। ১৮৯৬ সালের বাংলায় স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হল। বিলাতেও কংগ্রেসের অনুরাগী সংখ্যা বাড়ছে দেখে আমলাতন্ত্র শঙ্কিত হল। কংগ্রেস আবেদন ও নিবেদনের রাজনীতি পরিহার করে আত্মনির্ভর জাতীয়তা বোধের পথ ধরল। এতে ইংরেজ আরও শঙ্কিত হয়ে জনতার মধ্যে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টির প্রয়াস চালাল, বেছে নিলেন বিখ্যাত মুসলমান নেতা স্যার সৈয়দ আহমদকে। স্যার সৈয়দ ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় বলেছিলেন হিন্দু মুসলমান সুন্দরী ভারতবর্ষের দুই চক্ষুর মত, একটিকে আঘাত করলে অন্যটি স্বভাবত আহত হবে। তাঁকে দিয়েই গড়ে তুললেন এডুকেশন কংগ্রেস পারে ইউনাইটেড প্যাট্রিয়েটিক এসোসিয়েশন এবং মহামেডন অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এসোসিয়েশন অব আপার ইণ্ডিয়া এবং আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করে বেক্ প্রভৃতি ইংরেজ অধ্যাপকদের প্ররোচনায় মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে প্রথর স্বাতন্ত্র্য ও সাম্প্রদায়িকতা বোধ বিস্তারে তিনি অগ্রণী হলেন।

তখনও দেশের নেতারা ইংরেজ শাসনকে শত্রু বলে মনে করেন নি। জনসাধারণ তখনও কংগ্রেসের মধ্যে আসেনি। ইংরেজী ভাষায়ই কংগ্রেস বক্তৃতা হত।

১৮৮৬ সালে কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরজী বলেছিলেন যে ইংরেজ শিক্ষিত ভারতবাসীকে স্বপক্ষে টেনে রাখতে পারবেন। ১৮৯১ সালে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুরাগ রেখেই ক্রমশ ব্রিটিশ নাগরিকের অধিকার আয়ত্ত করতে হবে। ১৮৯১ সালে শাসন বিধি সম্বন্ধে রমেশ চন্দ্র দত্ত বলেন যে যে প্রদেশে ৩০টি জেলা ও লোক সংখ্যা তিন কোটি সেখানে অন্তত ত্রিশজন নির্বাচিত কাউন্সিল থাকা উচিত। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে লাল মোহন ঘোষ বলেন যারা বহুদিন আগে এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে, যারা সেদিনও উদার শাসকের নামে আমাদের দেশের তৈরী কাপড়ের উপর কর বসিয়েছে, যারা প্রতি বছর এখান থেকে অন্তত দুই কোটি পাউণ্ড দেশে নিয়ে যায়, যারা চাষীর পিঠে ভারী বোঝা চাপিয়ে বার বার এমন দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে যার তুলনা আমাদের পূর্ব ইতিহাসে নেই, তাদের শাসন করুণাকর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান বলে বিশ্বাস কি আমাদের করতে হবে।

১৯০৬ সালে বন্দেমাতরম সম্পাদক বিপিন চন্দ্র পাল লেখেন —our ideal is freedom which means absence of foreign rule.

১৯০৬ সালে ২৩ ডিসেম্বর তিলক লাজপত রায় কলিকাতায় আসেন, বিডন উদ্যানে সভা হয়।

লাজপৎ রায় সভাপতি ছিলেন, মিন্টো মার্কা স্বদেশীর তারা নিন্দা করেন বড়লাট লর্ড মিন্টো বলেন রাজনীতি ছাড়া স্বদেশীতে তাঁর সমর্থন আছে।

কলিকাতা কংগ্রেসের সময়ই ১৯০৬ সালে ঢাকায় ঢাকার নবাব সালিমুল্লার প্রাসাদে মোসলিম লিগের জন্ম হয়।

১৮৭৪ সাল থেকেই শাসন কার্যের সুবিধার অজুহাতে বাংলা দেশকে বিভক্ত করার কথাবার্তা চলছিল। শ্রীহট্ট ও কাছাড়কে তখন আসামে জুড়ে দেওয়া হয়। চট্টগ্রাম ডিভিসন এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহকে আসামে ঢুকিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব ১৮৮২ ও ১৮৯৬ সালেই ছিল। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারী ঘোষণা হয় সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম ডিভিসন এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত হবে। এর বিরুদ্ধে দুই বৎসর ধরে আন্দোলন হয়, দুই হাজারের বেশী জনসভা হতে প্রতিবাদ জানান হয়। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা তখন বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে ছিলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে প্রায় ৭০,০০০ হাজার স্বাক্ষর যুক্ত আবেদন বিলাতে ভারত সচিবের কাছে পাঠান হয়। কিন্তু সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে শাসকেরা জানায় যে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন এক প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে, উত্তর বাংলার গোটা কয়েক জেলাও তাতে জুড়ে দেওয়া হবে। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার অন্তর্নিহিত শক্তি আত্মপ্রকাশ করল। ৭ই আগষ্ট বিরাট জনসভায় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থা প্রবর্তনের দিন সারা বাংলায় অরন্ধন ও হরতাল হয়েছিল এবং গঙ্গায় স্নান করে গান গাইতে গাইতে পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দেওয়া হল। এই অনুষ্ঠানে প্রধান ভূমিকা নিয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

এই ঘটনা জাতীয় জীবনে নব প্রবাহ এনে দিল। শুধু বঙ্গ ভঙ্গের বিরুদ্ধে নয় জাতিকে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উন্মাদনায় জাতি এগিয়ে চলল। বিদেশী দ্রব্য বিশেষ করে বিলাতি দ্রব্য বয়কটের আন্দোলন দেশময় দৃপ্ত রব তুলেছিল। বয়কট আন্দোলনে বিপ্লবের তাৎপর্য্য ছিল বলে ১৯০৫ সালের কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে স্বদেশী সমর্থিত হলেও বয়কট সম্পূর্ণ সমর্থন পায়নি। ১৯০৬ সালে কলিকাতা কংগ্রেসে দারুণ উত্তেজনা হবে লক্ষ্য করে লণ্ডন থেকে সর্বজনমান্য বর্ষীয়ান নেতা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি পদে বরণ করে আনা হয়।

তাঁর ভাষণে প্রথম স্বরাজ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল। বিদেশী পণ্য বর্জন, স্বদেশী বাণিজ্য বর্ধন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন এই হল স্বরাজ লাভের জন্য কার্যক্রম। সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুণে ভেদনীতি প্রয়োগ উদ্দেশ্যে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক বলা জানো হল। সরকারী আনুকূল্যে ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের পত্তন হল।

কংগ্রেসের ভিতরেও নরমপন্থী ও গরমপন্থী দুই দল হল। এক দিকে লাল-বাল-পাল-লোনা লাজপৎ রায়, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল। অপর দিকে গোখলে ফিরোজ শাহ মেটা, সুরেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে দুই পক্ষের তুমুল বিবাদ হল। নরম পন্থীরা কোন ক্রমে কংগ্রেসে প্রাধান্য বজায় রাখল, গরম পন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করল। ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ সাল পর্য্যন্ত নরম পন্থীদের প্রভাবই কংগ্রেসে বেশী ছিল। (ক্রমশ:)

বিচ্ছিন্নতাবাদের দাপটে সংহতি বিপন্ন।

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

দেশের সংহতি ও শক্তিকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারলে দেশ ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধে অক্ষম হয়। ফলে বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতা বিপন্ন হয় ও দেশবাসী দারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য হয় পুনরায়। যে কোন দেশ তার আভ্যন্তরীণ সংহতি ও মৈত্রীর জোরেই বিশ্বের দরবারে নিজের সঠিক আসন লাভ করে, অন্যথায় দুর্বল প্রতিপন্ন হয়। সংহতিই দেশের শক্তির মূল উৎস। সেই সংহতিকে বিনষ্ট করে বিচ্ছিন্নতাকামীরা, আঞ্চলিকতাবাদীরা, সাম্প্রদায়িকতার পৃষ্ঠপোষকরা, জাতপাতের ধ্বজাধারীরা, হরিজন নিধনকারীরা, ধর্মধ্বজীরা ও স্বার্থান্ধ ক্ষুদ্র মনের অধিকারীরা। ফলে দেশের অখণ্ডতা, পারস্পরিক সমঝোতা, একতা ও সামগ্রিক চিন্তাধারা বাহত হয় এবং দেশ সর্ববিষয়ে দুর্বল ও অনগ্রসর হয়ে পড়ে, যা বিপদজনক। সকল মানুষের সমবেত চেষ্টায় ও ঐকান্তিক আগ্রহে দেশের বুনিয়াদ দৃঢ় ও সবল হয়, তবুও কেন এদেশের কিছু লোক বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকারে পরিণত হয়?—সেটাই দুঃখের ব্যাপার। ভারতের মানুষ এত শীঘ্র কি করে যে, তাদের অতীত পরাধীনতার জ্বালা ভুলে আত্মকলহে লিপ্ত হয়, তা বোঝা যায় না। বিদেশের বা স্বদেশের কিছু স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের আঙ্গুলি হেলনে কি ভাবে যে এদেশের সৎ-নাগরিক অথবা অতীতের দেশপ্রেমিক পরিবারের সন্তানেরা অখণ্ডতা ও সংহতিকে নষ্ট কোরে হঠাৎ খালিস্তানের স্বপ্ন দেখে এবং খালসা সম্প্রদায়ের জন্য ভারতের অভ্যন্তরে আলাদা ভূমি বা রাজ্য আদায়ের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে, তা বোধগম্য নয়। এই খালিস্তানের আন্দোলনের পশ্চাতে যে গভীর ষড়যন্ত্র কার্যকরী রূপে বিরাজমান, তাতে সন্দিহান হবার কোন অবকাশ নেই। ভারতীয় হয়েও যারা ভারতের সমূহ ক্ষতির কারণ হয়, তারা নিশ্চয়ই দেশপ্রেমিক নয়। তারা স্বার্থান্ধ, মূঢ়।

খালিস্তানের অবিবেচনাপ্রসূত আন্দোলনকে স্তব্ধ করা দেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলের জন্য একান্ত প্রয়োজন। দেশের ঐক্য ও সংহতি বিনাশকারী উক্ত অশুভ প্রচেষ্টাকে রোধ করার জন্য প্রতিটি ভারত সন্তানকে দৃপ্ত ভঙ্গিতে রুখে দাঁড়াতে হবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষের জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ, কাজেই সকলের সমবেত চেষ্টা ছাড়া এই অশুভের নিবৃত্তি নেই জেনেই সকল রাজ্যের সব অধিবাসীকেই উক্ত খালিস্তানের স্বপ্নকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে হবে, একতার অমোঘ শক্তির জোরে। একজাতি, একপ্রাণ, একতাই হবে প্রধান হাতিয়ার।

কাশ্মীর রাজ্যের বিধান সভায় অধিকাংশের ভোটের জোরে যে কালা কানুন চালু করার প্রচেষ্টা চলছে তাকেও বানচাল করে দিতে হবে, ভারতের ভাবমূর্তিকে অম্লান রাখার জন্য। কাশ্মীরের অভ্যন্তরে ভারতের যে অংশের অধিবাসীরা স্থায়ী ভাবে তথায় বসতি করতে পারবে না কেন? নিশ্চয়ই ভারতবাসী মাত্রেরই ভারতের যে কোন রাজ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করার অধিকার আছে। কাশ্মীর রাজ্য তার ব্যতিক্রম হবে কেন? সংবিধানের রক্ষা কবচের জোরেই তা করার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিটি ভারতীয়ের আছে।

কাশ্মীরে মুসলমান ভাইদের সংখ্যাধিক্য আছে জানা কথা, কিন্তু সেখানে অন্য কোন ভারতীয় রাজ্যের মানুষের স্থায়ীভাবে স্থান হবে না কেন? কাশ্মীর কি ভারত রাষ্ট্রের অধীনস্ত রাজ্য নয়? কাশ্মীরীদের উক্ত মনোভাব কোন মতেই সমর্থন যোগ্য নয় সাংবিধানিক কারণেই। কাশ্মীরের উক্ত কালা কানুন আইনে পরিণত হয় নি রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর অভাবে। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের নির্দেশের অপেক্ষায় তা বর্তমানে বিচারাধীন থাকায় এখনই আর কোন মন্তব্য নয়। তবে কাশ্মীরের উক্ত আইন প্রণয়ণের চেষ্টাও যে বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রশ্রয়দাতা সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই, কারণ আজাদ কাশ্মীরের মুসলমান অধিবাসীরা ঐ কানুনের সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে সর্ব্বাগ্রে, যা প্রতিটি ভারতবাসীর নিকট অনভিপ্রেত।

প্রাক্ স্বাধীনতা কালে কাশ্মীর একটি দেশীয় রাজ্য ছিল কিন্তু কাশ্মীর স্বেচ্ছায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবার বাসনা জ্ঞাপন করলে, তাকে ভারত রাষ্ট্রের অধীন করা হয়। কতকগুলি বিশেষ সুযোগ সুবিধা পায় কাশ্মীর রাজ্য তখনই; কিন্তু তাই বলে কাশ্মীর কখনই ভারতের অন্যান্য অঙ্গ রাজ্যের মানুষকে কাশ্মীরে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করতে পারে না। ভারত কাশ্মীরের সুরক্ষার জন্য ও তার আর্থিক বুনিয়াদ সুদৃঢ় রাখার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করে চলেছে আজো এবং সে অর্থ ভারতের প্রতিটি নাগরিকের কাছ থেকে আদায় করে ভারত সরকার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাধ্যমে। কাশ্মীর ভারতের অংশ এবং সে কারণেই প্রতিটি ভারতীয় নাগরিকের কাশ্মীর রাজ্যে প্রয়োজন বোধে স্থায়ী ভাবে বসবাসের অধিকার আছে। এর ব্যতিক্রম বাঞ্ছনীয় নয়।

পাঞ্জাবে আকালিরা যে ভাবে বিচ্ছিন্নতাবাদকে জীইয়ে রাখতে ও শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করতে তৎপর তা বাস্তবক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার উদ্ভবে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে, বিগত বেশ কিছুকাল থেকেই। আকালিদের প্রধান উদ্দেশ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল এবং সেই আসল উদ্দেশ্যকে গোপন রেখে তারা নানা অজুহাত তৈরী করে পাঞ্জাবে অকারণ অশান্তি বাড়িয়ে তুলতে সদাচেষ্টিত দেখা যায়। সম্প্রতি 'এশিয়াডে' তারা অনর্থ সৃষ্টি করে এশিয়ার অন্যান্য রাষ্ট্রের কাছে ভারতের উন্নত মস্তককে অবনত করতে বদ্ধ পরিকর। সে কারণে দিল্লীতে আকালী জাঠা নিয়ে তারা আন্দোলনে নামার জন্য মাঝে মাঝে হুংকার ছাড়ছে। প্রধান মন্ত্রী বেশ জোরের সঙ্গেই বলেছেন যে, আকালীদের উদ্ভট তলোয়ারের ভয়ে তিনি তাদের অন্যায় প্রস্তাব মেনে নিতে প্রস্তুত নন। তবে যদি আকালীরা ঠাণ্ডা মাথায় বসে আলোচনার মাধ্যমে সুমীমাংসা চায় তবে 'এশিয়াড' শেষ হবার পর সে ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আকালীরা যে ভাবে সরকারকে ভয় দেখিয়ে অন্যায় জিদ্ বজায় করতে চায়, তা মোটেই শুভবুদ্ধির পরিচায়ক নয়, বরং নিন্দার ব্যাপার নিশ্চয়ই।

আসামের সৃষ্টিছাড়া অদ্ভুত ধরণের আন্দোলন সারা ভারতে এক বিপর্য্যয়কারী অবস্থার সৃষ্টি করে চলেছে বিগত কয়েক বছর ধরেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কিছুতেই একটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাধানে তারা উপনীত হতে চাইছে না। আসামে বসবাসকারী বাঙ্গালী হিন্দুরা কঠিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়ে

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় অশেষ নির্যাতনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে বাস করছে। বাঙ্গালী হিন্দুরাও মূলতঃ ভারত বাসী। ভারত বিভক্ত হওয়ার পরে তারা পূর্ব্ববঙ্গ হতে ভারতে চলে আসে। এবং আসাম ভারতেরই অংশ বিধায় তারা অনেকেই আসাম রাজ্যে বসবাস করতে থাকে বহু কাল ধরেই। হঠাৎ অসমীয়া ভাই-বোনেরা যে কেন হিন্দু বাঙ্গালীদের সহ্য করতে পারছেনা তা বোঝা দুষ্কর। বিদেশীদের চক্রান্তে পড়ে আসামবাসীরা তথাকার বাঙ্গালীদের উপর যত্রতত্র দেখা যায়। বর্তমান আন্দোলন মাঝে মাঝে এত তীব্র আকার ধারণ করে যে বহু নিরীহ বাঙ্গালী তথায় অকারণে নিহত বা আহত হয়। বাঙ্গালী মা-বোনেরাও রেহাই পায়না আঞ্চলিকতাবাদী অসমীয়াদের ক্রোধের শিকার হয়ে। ফলে আসামে বসবাসকারী ভারতীয় বাঙ্গালীরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকের পর্য্যায়ে পড়ে বৎসরোনাস্তি কষ্টভোগে বাধ্য হয়। এর কোন প্রতিকার আজো হল না। একই ভারত-রাষ্ট্রের মানুষ হয়ে বাঙ্গালীরা কেন আসামে নির্য্যাতন ভোগে বাধ্য হয়? এর সদুত্তর কেন্দ্র বা রাজ্য কেউ-ই দেয় না কেন? এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালীদের ত্যাগ, তিতিক্ষা, কারাবরণ, মৃত্যু, আঘাত প্রভৃতি কারোর চেয়ে কম ছিলনা নিশ্চয়। তবু আজ স্বাধীন ভারতে এই সীমাহীন দুর্দ্দশার ভোগে কেন আসামের বাঙ্গালীরা? কে দেবে উত্তর? কার দ্বারে আমরা এর প্রতিকার পাব? কে আমাদের চোখের জল মোছাবে? কে দেবে সান্ত্বনা? উদ্বাস্তু বাঙ্গালী ভাই-বোন ভারতের প্রতিটি দুয়ারে কি কেবল অশ্রুপাতই করবে? না তাদের উপর কিছু সুবিচার হবে?

দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যে দ্রাবিড় মুনেত্রা কাজাগাম নামধেয় রাজনৈতিক দলের জন্ম সম্ভব হয় বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারার ফলেই। ঐ এলাকার মানুষ নিজেদের উত্তর ভারতের মানুষের সঙ্গে সমপর্য্যায়ের মানুষ বলে চিন্তা করে না। তারা আঞ্চলিক দল গঠন করে নিজেদের মধ্যে প্রভুত্ব বিস্তারে ব্যস্ত। সর্ব ভারতীয় চিন্তা বা কোন রাজনৈতিকদলের সামিল হতে তারা অনিচ্ছুক কেন? ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দির উপর বিরূপ তারা ও হিন্দিকে তারা কোন মতেই সহ্য করতে পারে না কেন? ঐ মানসিকতার মধ্যে সর্ব্বভারতীয় বোধের ও চিন্তার অভাব প্রকট। ফলে সারাদেশে সংহতির পক্ষে তা দারুণ ক্ষতিকারক এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎসাহ দাতা দ্রাবিড়িয়ান, যা কোনক্রমেই শুভ নয়। দ্রাবিড়িদের উক্ত মানসিকতার সত্বর পরিবর্তন না হলে ভবিষ্যতে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন হলেও হতে পারে এবং অখণ্ড ও সংহতি তাতে বিপন্ন হতে পারে, বলে আশংকা করার যুক্তি সঙ্গত কারণ নিশ্চয়ই আছে। দক্ষিনীদের একটু তলিয়ে এ ব্যাপারটা দেখা জাতীয় স্বার্থে একান্ত দরকার। আঞ্চলিকতাবাদের পরিণাম দেশের পক্ষে বিপদজনক নয় কি? দক্ষিণের নেতৃস্থানীয়দের হিন্দি বিরূপতা বন্ধ করার প্রচেষ্টা চালান এখনই উচিৎ, নচেৎ পরিণামে ক্ষতি হবেই।

বিহার ও মধ্য প্রদেশের বহু এলাকায় জাত-পাতের লড়াইয়ে বহু নিরীহ নর-নারী নির্য্যাতিত হচ্ছে, বিশেষ করে অনগ্রসর ও তপশিলীরা। বহু হরিজন হত্যা ও হরিজনদের গৃহদাহ কার্য্যে বর্ণ হিন্দুরা অংশ নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি কোরে দেশকে দুর্বল করে দিচ্ছে যা হীনতা ও

১৩পৃঃ দেখুন

বিচ্ছিন্নতাবাদ

শিশির কর

'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে' —পরাধীন ভারতের এক কবি এই আশা করে ছিলেন। স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও দেশ জুড়ে বেকারি, অভাব অনটন সে স্বপ্নকে দুঃস্বপ্ন করছে। সম্প্রতি এক নতুন ব্যাধি আমাদের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিয়েছে, পঙ্গু করে দিচ্ছে আমাদের অর্থ-নীতিকে। সে ব্যাধির নাম বিচ্ছিন্নতাবাদ। স্বাধীনতার পর বিদেশী প্রভাব অধ্যুষিত কিছু অঞ্চলে এই বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা দেখা দেয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা প্রান্তে বিচ্ছিন্নতার মনোভাব মাথা চাড়া দেয় নেহরুর আমলেই। সংক্রামক ব্যাধির মত এই ব্যাধি ছড়িয়ে পড়তে থাকে মিজো ভূমিতেও। দেখতে দেখতে ভারতীয় সংস্কৃতি প্রভাবিত মণিপুরও এর কবলে পড়ে। এখন ব্রহ্মপুত্রের ওপারের সমগ্র ভূ-খণ্ডই এই ব্যাধির শিকার হয়েছে। আসামে এ আন্দোলন এত তীব্র ও ব্যাপক রূপ নেয়, যে সারা দেশের অগ্রগতিই এতে ধাক্কা খায়। 'বিদেশী হঠাও' নামে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের এই বিরাট অঞ্চল জুড়ে যে তাণ্ডব চলে ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ঘৃণা আকলিকতার নগ্ন রূপ থেকে ভারতের যে কোন শুভ বুদ্ধির মানুষ শিহরিয়া উঠে। 'আসাম কেবল অসমীয়াদের' ধ্বনি তুলে বিচ্ছিন্নতাকামীরা আসামে তেল তোলাও বন্ধ করে দিল। কোটি কোটি টাকা জলে গেল বিশ্ব জুড়ে এই তীব্র তৈল সংকটের যুগে। শুধু আসামেরই নয়, সারা দেশের উন্নয়নের গতি মন্থর হল। সংবিধানের সবকিছু নীতি-আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে 'বিদেশী হঠাও' নামে সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দাদের উপরও চললো জুলুম। যারা তিন চার পুরুষ আসামে বসবাস করছেন, তারাও এই পাশব জিঘাংসার লেলিহান শিখা থেকে রেহাই পান নি। 'বিদেশী হঠাও' আন্দোলনের স্বরূপ প্রকাশ পেল। 'বাঙ্গালী খেদাও' ঐ ডাকেরই মার্জিত নাম। রাজ্যের অন্যভাষী লোকদের বিতাড়নের আন্দোলনে সব ভারতীয় সহানুভূতি ও মদত লাভের জন্যই এই প্রলেপটুকু! বিদেশী শব্দের ব্যবহার বাঙ্গালার প্রতিভঙ্গ হিসাবেই। এ সম্পর্কে একটি কাহিনী আছে। গৌহাটীর পথে রাত্রে একজন শ্বেতাঙ্গ বিদেশী মোটরে যাচ্ছিলেন, আন্দোলনকারীরা তাদের গাড়ী থামায়। টর্চ ফেলে দেখে গাড়ী চলে যেতে দেয়। আন্দোলন কারীদের একজন বলে, 'আপনারা যেতে পারেন। বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা করবেন। আমরা তো ভেবেছিলাম এই গাড়িতে বিদেশীরা আছে। তাই থামিয়ে ছিলাম।'

শ্বেতাঙ্গদের একজন সবিস্ময়ে বলেন, 'আমরা তো বিদেশীই।'

জবাবে সেই যুবকটি বলে, 'না, আপনারা বিদেশী নন। বিদেশী তো বাঙ্গালীরা।'

হতবুদ্ধি শ্বেতাঙ্গরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে চলে গেল।

এই কাহিনী সত্য কি না জানি না। তবে আসামের আন্দোলনকারীদের একমাত্র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাঙ্গালীদের হটানোই।

আসামে আর একটি মারাত্মক প্রবণতা হচ্ছে, আসাম শুধু অসমীয়াদের জন্য শ্লোগান। অথচ আসাম রাজ্য সৃষ্টির বহু আগে থেকেই এখানে বাঙ্গালীরা বসবাস করছে।

সবচেয়ে বেদনার কথা, আজ সমগ্রভাবে ভারতের কথা কেউ ভাবে না। sons of the soil ধ্বনি শুধু উগ্র জাতীয়তাবাদেরই রূপ নিচ্ছে না এতে উগ্র আঞ্চলিকতাবাদ, সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, এমন কি বিচ্ছিন্নতাবাদের গন্ধও আছে। এ প্রবণতা শুধু উত্তর-পূর্ব ভারতে নয়, দেশের অন্যত্রও দেখা দিচ্ছে। পশ্চিমভারতে. ওড়িশা, বিহারেও এর ঢেউ লেগেছে। ভারতের সংবিধানের আদর্শ যাতে সকলে মেনে চলে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবেই। তা না হলে দেশ খান খান হয়ে যাবে। জাতীয় সংহতিকে আরও জোরদার করতে হবে। আজকাল সারা ভারতের কথা কেউই বলে না। কেউ বলে হরিজনদের উন্নতি চাই। কেউ বলে আসামের অগ্রগতি চাই। আবার কেউ বলে মেহনতী মানুষের কল্যাণ চাই। কেউ বলে ব্যাংক কর্মীদের উন্নতি দরকার, কেউ বলে শিক্ষক সমাজের উন্নতি দরকার। কেউ বলে নারীদের অগ্রগতি চাই। সেদিনকার সেই বীর সন্ন্যাসীর মত কেউ তো গোটা ভারতের কথা ভেবে বলে না। বার বার মনে পড়ে সেই অতুলনীয় উদাত্ত আহ্বান; 'হে ভারত ভুলিও না, দরিদ্র অজ্ঞ মূর্খ মুচি মেথর তোমার ভাই।'

আজকের ভারতের যেন একটা সংগ্রহ দৃষ্টি লোপ পেয়েছে। সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা সংকীর্ণতায় দেশ জর্জরিত। সারা ভারতের কথা কদাচিৎ শোনা যায়—সংবিধানের মধ্যেই তা রুদ্ধ। জাতীয় সংহতি দিন দিন শিথিল হচ্ছে। অথচ এই তো সেদিন উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম এক দেহে লীন হল। দ্বিতীয় যুদ্ধের আগের চীন কত ভাগে ভাগ ছিল, আর আজ? নানা ভাষা, নানা সংস্কৃতির কেন্দ্র রাশিয়াতেও জাতীয় সংহতি কত দৃঢ়। অন্যরা যখন মিলনের পরশে সমৃদ্ধ, আমরা কি তখন বিচ্ছিন্নতার পথে পা দিয়ে বিনাশের দিকে যাব?

(১১ পৃঃ পর)

নীচতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বিহারে উত্তর প্রদেশে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাঁধছে, ফলে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হচ্ছে ঐ সব এলাকায় এবং তার ফলে এদেশের মানুষের সহনশীলতার নিতান্ত অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যেখানে উত্তরোত্তর বাড়া একান্ত দরকার সেখানে উক্ত দুর্ঘটনা ঘটা নিতান্ত অবিবেচকের কার্য্য ছাড়া আর কি? স্বাধীন ভারতে প্রতিটি ভারতীয়ের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃভাব আজো কেন গড়ে উঠলো না? স্বাধীনতা ভোগের যোগ্যতা কি আমরা হারিয়ে ফেলেছি এরই মধ্যে? বিচ্ছিন্নতাবাদ ও আঞ্চলিকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িক অসাম্যের মূল মূহ প্রকাশ ও তার বিস্তার দেশের স্বাধীনতাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। কাজেই ঐরূপ চিন্তা ও কার্য্য দেশের সংহতিকে বার বার আঘাত হানছে নির্মম ভাবে। ফলে জাতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

একান্ত সাক্ষাৎকার

কালিপদ সরকার

তপোবনের নিকটবর্তী হলেন সুমন। ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে গেলেন মুক্ত প্রবেশ-দ্বার প্রান্তে। স্তব্ধ নিশীথিনী, ম্লান জোৎস্নায় বসুন্ধরা যেন তন্দ্রাবিজড়িত। মৃদু ঝিল্লীরবে অরণ্যভূমি সচকিত। প্রবেশপথে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সুমন, জনহীন বিস্তৃত তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, এই সেই নৈমিষারণ্য। তিনি পুরাণে পড়েছেন, এই অরণ্যে সৃষ্টির আদি পর্বে বিষ্ণু নিমেষ মধ্যে দানবশক্তি ধ্বংস করেছিলেন। তাই এর নাম নৈমিষারণ্য। নৈমিষারণ্য পরম তীর্থ। এই তীর্থে রামচন্দ্র অশ্বমেধ এবং কুলপতি শৌনক দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞ করেন। পুরাণবিদ সৌতি এখানেই ঋষিমণ্ডলে প্রথম মহাভারত কথা বর্ণনা করেন। যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিগণ নৈমিষারণ্যকে তাঁদের তপস্যা ও জ্ঞানালোকে পবিত্রিত করেছেন। মনে মনে অলক্ষ্যিতে প্রণাম জানালেন তিনি মহাতীর্থের উদ্দেশ্যে।

সহসা সুমন শুনতে পেলেন কে যেন তপোবন কুটীর থেকে গম্ভীর কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন 'ওম্'। কণ্ঠস্বর বনভূমি প্রতিধ্বনিত করে দূর থেকে দূরে প্রবাহিত হল। তপোবনের পশ্চাতে হিমগিরি স্থির দণ্ডায়মান। গিরিচূড়ায় উষার প্রথম আলোর আভাস পড়েছে। সুমন বিস্ময়স্পন্দিত, নীরব দৃষ্টিতে সেদিকে চেয়ে রইলেন। প্রশান্ত এক অপূর্ব অনুভূতিতে তার অন্তর পূর্ণ হয়ে উঠল। তিনি তারপর শান্ত মনে তপোবনে প্রবেশ করলেন। তখন প্রভাত হয়েছে।

কুটীরের নিকটে পৌঁছে সুমন দেখলেন গুরুজী ধ্যানমগ্ন। নিকটে কর্মরত একজন আশ্রমিক ইঙ্গিতে সুমনকে বেত্রাসনে বসতে বললেন। সুমন নিঃশব্দে আসন গ্রহণ করে ধ্যানস্তব্ধ গুরুজীর দিকে চেয়ে রইলেন। সেই মুখ, সেই ঋজু দীর্ঘদেহ, সেই গৌরকান্তি, বিরলকেশ মস্তক, অপরিবর্তিত অম্লান। সুমন অপলক দৃষ্টিতে ধ্যান নিমীলিত আঁখি গুরুজীকে দেখতে লাগলেন।

আশ্রমিক যুবক গাভী দোহনান্তে দুগ্ধ নিয়ে ভিতরে চলে গেলেন। দুটি সুদৃশ্য হরিণ ঘর থেকে ছাড়া পেয়ে আনন্দে শিঙ নাড়াতে নাড়াতে বনভূমির দিকে ছুটে গেল। সুমন হরিণ দুটির দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকলেন, তারপর আবার হৃদয়ের ভাবনা-সাগরে ডুবে গেলেন।

বেশ কিছুকাল এইভাবে আত্মস্থ হয়ে থাকার পর তিনি পুনরায় ওম্ শব্দ শুনে সচকিত দৃষ্টিতে গুরুজীর দিকে দৃষ্টি ফেরান। গুরুজী চক্ষু উন্মীলন করে সুমনের দিকে তাকালেন, তাঁর মুখে সেই বিশ্বজয়ী প্রসন্ন হাসিরেখা। সুমন আসন থেকে উঠে সসম্ভ্রমে গুরুজীর পদপ্রান্তে নত হয়ে প্রণাম করলেন।

গুরুজী গাত্রোত্থান করে সুমনের মস্তকে হাত রেখে তাকে অস্ফুটস্বরে আশীর্বাদ করলেন এবং তাঁর সামনের আসনটিতে তাকে বসতে বললেন। সুমন গুরুজীর সামনে আসন গ্রহণ করলেন। আশ্রমিক দুটি বড় শ্বেত পাথরের পানপাত্রে গরম দুধ এনে উভয়ের সামনে রেখে নিঃশব্দে চলে গেলেন।

দুধ পানান্তে গুরুজী সুমনের দিকে দৃষ্টি রেখে বললেন, "কতদিন পরে দেখা হল বল তো ?"

সুমন। এক যুগ হবে। কি তারও কিছু বেশি।

গুরু। আমি এখানে আছি জানলে কি করে ?

সুমন। সে কথা বলা যে বারণ, দেব।

গুরু। তাইতো বটে। আমার বিধান আমিই বা ভাঙতে বলি কি করে। (ঈষৎ হাস্য)। কদিন থাকবে এখানে ?

সুমন। ঠিক করিনি। এখানে এলে কলিকাতায় ফিরে যেতে মন চায় না।

গুরু। কেন ? পশ্চিম বাংলায় এখন তোমাদের অনেক কাজ। রাজ্যের শাসন ক্ষমতা তোমরা হাতে পেয়েছ। দেশ গড়ার বিরাট সুযোগ এসেছে। ত্রিশ বছর ধরে এই ক্ষমতা অধিকারের জন্য তোমরা কি করো নি ? একটার পর একটা আন্দোলন করেছো, কত বনধ্ ডেকেছো, শ্রমিক কর্মচারী ছাত্র যুবকদের তোমাদের আন্দোলনের সামিল করেছো, তাদের মধ্যে কয়েকজন তোমাদের কথায় প্রাণও দিয়েছে। কত ট্রাম বাস পুড়িয়েছো, একবার ভেবে দেখ। অভীপ্সিত অধিকার করায়ত্ত। রাজ্যবাসীকে এতদিন তোমরা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছ তা পূর্ণ করার এই তো সময়।

সুমন। (নতমস্তক, নীরব)

গুরু। কি হল ? চুপ করে রইলে কেন বৎস ?

সুমন। আর্য, আপনি সবই জানেন। আমাদেরও চেনেন। ময়দানে জনসমাবেশ করে বিপ্লব করতে আমরা জানি। ভাঙ্গাচোরা করতেও পারি। খুন যারাপিতেও হাত আছে। কিন্তু কাজ করতে পারিনে। কাজ করার কথাটা কেউ কখনো আমাদের বলে নি। নিবিষ্ট চিত্তে কাজে বসলে বিপ্লব করব কি করে ?

গুরু। (চিন্তাচ্ছন্ন মনে) কি বললে ? বিপ্লব ?

সুমন। হাঁ দেব। বিপ্লবই আমাদের ধ্যান জ্ঞান। তাপ নিয়ন্ত্রিত সুরম্য কক্ষে মখমলের সুকোমল কিংখাপমোড়া বিলাস আসনে বসেও আমরা বিপ্লবের কথাই ভাবি।

গুরু। (নৈরাশ্য ম্লান কণ্ঠে) বুঝেছি। এতকাল লোককে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তার কি হবে ? জবাবদিহি করতে হবে না ?

সুমন। (মৃদু চটুল ভঙ্গিতে) কি জানেন আর্য, জবাবদিহি আমরা গোড়াতেই করে রেখেছি। মাঝে মাঝে জনগণকে মনে করিয়েও দি।

গুরু। কেমন ? কেমন ?

সুমন। (স্মিত হাসি মুখে) আমাদের সীমিত সম্পদ, সীমিত সামর্থ্য, কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ, এই সব।

গুরু। জনগণ তা মেনে নেবে কেন? আর পাঁচটা রাজ্যের সরকার যা পাবে তোমরা তা না পাবলে কি বলবে?

সুমন। কাকে কৈফিয়ত দেব? জনগণ? তাদের আমরা তৈরি করে ফেলেছি। we are their philosopher. friend and guide. কিছু বে-আদব এখনো অবশ্য আছে। তাদের জন্য শ্যামচাঁদ বরাদ্দ। ভয়ে মুখ খুলতে পারবে কেউ।

গুরু। তা বটে। ঐ রকম কথাই শুনেছি। (চিন্তামগ্ন, বেদনার ছায়াবৃত)

সুমন। (বেশ কিছুক্ষণ পরে) আর্য, আপনি দুঃখ পেলেন?

গুরু। (নীরব দৃষ্টি দিকে সুমনের নিবদ্ধ, তাঁর মন যেন বিস্মৃতপ্রায় অতীতের গহনে কি যেন সন্ধান করে)

সুমন। কি ভাবছেন দেব।

গুরু। না কিছু না। দেশের দিকে তাকালেই মনটা কেমন যেন চিন্তা ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যাক সে কথা। সুমন, তোমরা কি এখনো তোমাদের মার্কসবাদী বলো?

সুমন। (একটু জোরের সঙ্গে) নিশ্চয়ই বলি।

গুরু। (ঈষৎ হাস্য) ভাগ্যিস, কার্ল মার্কস বেঁচে নেই। সেই মহান দার্শনিক মানবতাবাদীর নামে তোমরা যা সব করছ, তিনি তা দেখলে কি যে করতেন!

সুমন। আর্য, আমাদের কেন দোষ দিচ্ছেন। সকল কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রগুলির দিকে তাকান, দেখবেন আমরা ঠিক লাইনে আছি। কেতাবী মার্কস তত্ত্ব নিয়ে পড়ে থাকলে, আমাদের কি এত অগ্রগতি হত?

গুরু। তা ঠিক। কিসের অগ্রগতি সুমন?

সুমন। (ভাবান্তর) কেন, দেশের অবহেলিত জনগণের।

গুরু। (উচ্চ হাস্য) জনগণ মানে তোমাদের দলের উপর তলার কিছু লোক এবং তাদের আশ্রিত আপনজনের অগ্রগতি?

(চলবে)

Regd. No R.N. 611/71 Biplabi Bangla P. Regd. WB/NC 77
Phone : 34-1795
বার্ষিক—[illegible] টাকা বাণ্মাষিক :—১০.০০ টাকা মূল্য—৩৫ পয়সা

।। সম্পাদক ।।
শ্রীশান্তিপ্রিয় রায়চৌধুরী
সম্পাদক মণ্ডলী
শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)
শ্রীকালীপদ সরকার
শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী
শ্রীকামাখ্যা রায়
শ্রীমলয় ঘোষ
প্রকাশক ও মুদ্রক
শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত
দিল্লীর বিশেষ প্রতিনিধি—
শ্রীবারীন ঘোষ
বেহালা—
শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা
পড়ুন
ও
পড়ান

30

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ "জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" পুনর্মুদ্রিত হল।

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্রকুমার রায়—১০.০০
বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সুবোধ জুমদার
অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—ব্রজেন্দ্র দাস

28C1 030 L 2

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১.৫০, ২। বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮.০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির—২.০০, ৪। গৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১.০০, ৫। কাকোরী শহীদবৃন্দ—১.২৫, ৬। কলকাতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—.৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—.৬০ ৮। স্বাধীনতাসংগ্রামীদের মা ও বোন—.৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—.৬০ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—.৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—.৪০ ১২। ভারতের নবজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—.৭৫, ১৩। দেশ বাঘের জোদেমি (১)—১.০০, ১৪। দেশ বাঘের জোদেমি (২)—২.০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—.৫০, ১৬। ১৯ই এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১.০০, ১৭। হাতিয়ার সংগ্রাম প্রচেষ্টা—.৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি—৪.০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—.৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১.৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭
সৈকত শ্রী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

মূল কার্যালয়—৪ নং বল্লভ দাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭ শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

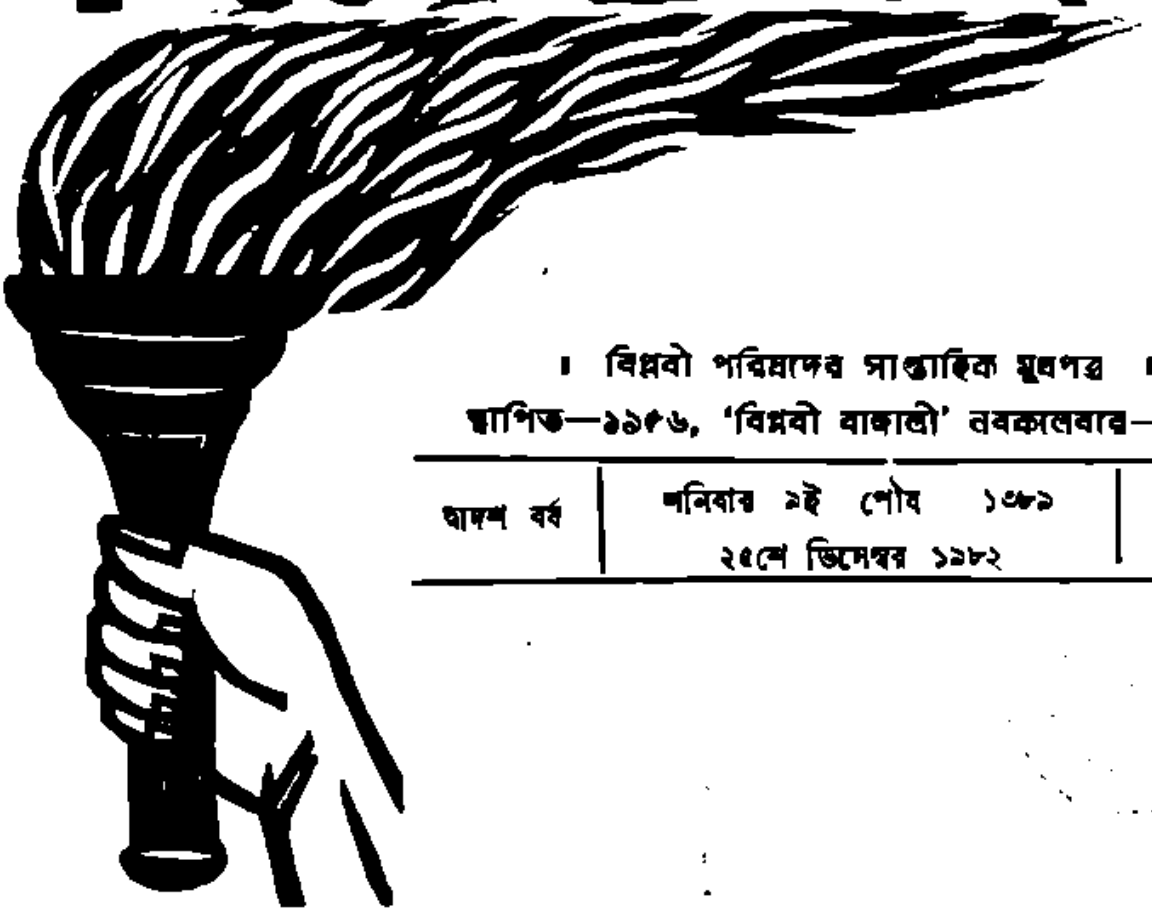

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবর—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ৯ই পৌষ ১৩৮৯ ২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮২	১৩ সংখ্যা

"হাসিতে খেলিতে আসিনি এ জগতে
করিতে হবে মোদের মায়েরই সাধনা
দেখাতে হবে আজি, জগৎবাসী সবে
এখনো ভারতের যায় নি রে চেতনা"।

—কবি-মুকুন্দ দাস

সম্পাদকীয়

কমপিউটার

অতি সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একটি সভায় কমপিউটার বা যন্ত্রগণকের অপরিহার্যতা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে তাঁর এ সম্বন্ধে পূর্ব মনোভাবের পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। অভিজ্ঞতার ফলে তিনি উপলব্ধি করেছেন বলেই মনে হয় যে আজকের দুনিয়ায় উৎপাদন ও উৎপাদিত সামগ্রীর উৎকর্ষতা বজায় রাখতে হলে কমপিউটারের অবদান অনস্বীকার্য। দেশের সার্বিক উন্নয়ন করতে হলে এবং বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে, কমপিউটারের সাহায্য নেওয়া ব্যতীত গত্যন্তর নেই। যথেষ্ট বিলম্বে হলেও এ বিষয়ে তাঁর সম্যক চেতনা বন্দ্যবাদার্হ।

কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর মন্তব্য নিয়ে একটা সোরগোল উঠেছে। কোন চিন্তাশীল মহল থেকে এটা ওঠেনি। উঠেছে বর্তমান সরকারের শরিক দলগুলির পক্ষ থেকে। একদা কেতাব থেকে যে বুলি তারা মুখস্থ করেছিলেন, তার পর গঙ্গানদী দিয়ে যে বহু জল প্রবাহিত হয়ে গিয়েছে এবং বিশ্বের পরিস্থিতির যে বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে, তার সঙ্গে তাদের মুখস্থ ফরমূলার পার্থক্য ফুটে উঠেছে বলেই তারা তাদের অঙ্ক মেলাতে পারছেন না বলেই মনে হয়। এটা স্বাভাবিক, পূর্বধারণা সহজে বদলাতে চায় না। অবশ্য এ সত্যও অনস্বীকার্য যে এই বিকৃত ও অন্ধ মানসিকতা সৃষ্টির জন্য জ্যোতিবাবু ও তাঁর দলের ভূমিকা ও অবদান কারো চেয়ে কম নয়। কিন্তু ভদ্র শিক্ষিত, মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে, ততদিনই তার শিক্ষাক্ষেত্রটা প্রসারিত থাকে। পুরানো জ্ঞানের বেড়াজালে মনের দরজাটাকে যদি চিরদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে তাকে কূপমণ্ডুকের জীবনই যাপন করতে হয়। তখন মানুষ আর মানুষ থাকেনা, একটি জড়বৎ জীবে পরিণত হয়। 'দিবে আর নিবে' মিলিবে মেলাবে' এই ত সুস্থ মানুষের আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়েছে বিশ্ব সমাজে। তবে কমিউনিস্টরা অবশ্য মনে করেন যে মার্কস দেড়শত বছর আগে যা বলে গিয়েছেন, তারপরই বিশ্বের মানুষের ভাবনা চিন্তার পক্ষে আদি ও শেষ। ভবিষ্যতে যদি কোন মহামানব তার সাধনা ও মনীষা বলে নতুন কিছু বলেন তবে সেটা মিথ্যা এবং পরিত্যাজ্য। মানুষের চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ মার্কসের সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে, এটা "সুবোধ সঙ্গত" নয়।

যাই হোক্, কমপিউটার সম্বন্ধে কমরেডদের আপত্তিটা কোথায়, সেটা আলোচনা করা যেতে পারে। তাদের প্রধান অভিযোগ যে যেদেশে বেকারীত্বের পরিমাণ ভয়াবহ সেখানে কমপিউটারের সাহায্য নিলে বেকারীত্ব আরো বাড়বে। এখনকার মত কিছুদিনের জন্য, এটা একেবারে অযৌক্তিক বলা হয়ত যায়না। কিন্তু যদি দেখা যায় যে এই সাময়িক অসুবিধা দূর করে, ভবিষ্যতের জন্য সুবিধা সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এই কমপিউটারের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, তবে কি কোন আপত্তি থাকতে পারে? শ্রমিকদের সঙ্গত অসঙ্গত দাবী নিয়ে যারা রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ গড়ে তুলেছেন এবং তুলতে চান তাদের নিকট কোন যুক্তিসম্মত বক্তব্য আশা করাটা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।

বিশ্বের অন্যান্য দেশ এই কমপিউটারের সাহায্যে তাদের দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করেছে, সেটা কি আপত্তিকারীরা ভেবে দেখেছেন? তারা কি সকলেই নিজ নিজ দেশের মানুষের সর্বনাশ সাধন করার জন্য এ কাজ করেছেন? বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত একথা কেউ বলবেনা। সেই সব দেশ উৎপাদনের পরিমাণও উৎকর্ষতার মান বাড়িয়েছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অভাবনীয় সফলতালাভও দেশের মঙ্গলসাধন করেছেন। এতে তাদের অর্থ-নৈতিক অগ্রগতির হার অনুকরণীয়। তাঁরা বিশ্বের বাজারে ব্যবসায় বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করছেন এবং সেই মূলধন নতুন নতুন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করে, মানুষের রুটি রোজগার বাড়াচ্ছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান প্রভৃতির মত অত্যাবশ্যক ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন। তার সুফলতো দেশের মানুষেই ভোগ করছে। সাময়িক একটু অসুবিধা ভোগ করতে হলেও উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় একাজ করাই ত অবশ্য করণীয়। এ কাজ যে না করবে, সেতো মহামূর্খ। অবশ্য জনগণের সুখ স্বাচ্ছন্দে বাড়লে, রাজনৈতিক ব্যবসায়ীদের অঙ্গুলি হেলনে তারা চলতে চাইবেনা, এটা সুনিশ্চিত। নিজেদের দেশের সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে তাদের সম্বন্ধটা সহজ, সরল ও স্বাভাবিক হবে, এতে কারো কারো বা কোন দলের অসুবিধা হবে। তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যেই গণ্য করা উচিৎ হবে না।

আমরা অনুরোধ করব আপত্তিকারীদের প্রকৃত অবস্থাটা বিশ্বপরিস্থিতিতে বিচার করার জন্য। এ কাজ শুধু আমেরিকা, বৃটেন ও জাপান প্রভৃতির মত দেশও করেনি। এদের ধেয়, অনুকরণীয়, স্থানীয় রাশিয়া চীনও একাজ করেছে। রাশিয়া বা চীনে বৃষ্টি হলে, প্রখর রৌদ্রের মধ্যে কলিকাতায় ছাতা খুলে বেড়াবার মানসিকতা আর কতদিন চলবে? যে শ্রমিক শ্রেণীর জন্য মায়াকান্না কাঁদছেন এরা, তারাতো উচ্ছৃঙ্খল, কর্তব্যবিমুখ, অন্যের স্বার্থের প্রতি উদাসীন হয়ে, এদের বিপদের মুখেই ঠেলে দিচ্ছেন। একথা কেউ বলবেনা যে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য পাওনা অস্বীকৃত হোক, কিন্তু সংখ্যানুপাতিক হারে বৃহত্তর গোষ্ঠীর স্বার্থ নষ্ট করে যে শ্রমিকরাও বাঁচতে পারবেন না, এটাও তাদের শেখান দরকার। সর্বোপরি, সমগ্র দেশের স্বার্থ বিঘ্নিত হলে, শ্রমিক শ্রেণীই কি এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে? নিশ্চয়ই না।

কমপিউটার প্রগতির প্রতীক বলে আজ সর্বজনস্বীকৃত। ভারতবর্ষের পক্ষে কমপিউটারের ব্যবহার ও সাহায্য তার অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য্য এ সম্বন্ধে কোন দ্বিমত থাকা উচিৎ নয়। যে পথে কিছু রাজনৈতিক দল, শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার নামে অদ্ভুত ধরণের ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন পরিচালনা করে এসেছেন এবং এখনও করতে চান, তাতে কারো কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হবে না। কমপিউটারের সাহায্য নেওয়ার বিরুদ্ধে এতদিন যারা প্রচার করে এসেছেন, তাদের সুমতি হবে এবং সম্বিৎ ফিরে আসবে, এটাই দেশের চিন্তাশীল মানুষেরা আশা করেন। তারা আরো আশা করেন যে জ্যোতিবাবু যখন নীতিগতভাবে কমপিউটার বসাবার প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানে কমপিউটার বসানোর পথে প্রতিবন্ধকগুলি ধীরে ধীরে দূর করতে আন্তরিক প্রয়াস চালিয়ে যাবেন। কোন অসঙ্গত দাবী এবং দেশের সার্বিক মঙ্গল সাধনের পরিপন্থী কোন আন্দোলনের নিকট মাথা নত করবেন না।

卐

আনন্দ মঠ

কালীপদ সরকার

।।'যার যাবে জীবন চলে
জগৎ মাঝে তোমার কাজে
বন্দে মাতরম বলে' ।।

দুটি মাত্র শব্দ 'বন্দে মাতরম' এক বিশাল আত্ম-বিস্মৃত পরাধীন জাতিকে ক্ষনিক মধ্যে স্বদেশ চেতনায় যে ভাবে উদ্বুদ্ধ করেছিল তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। ইতিহাসে এমন শক্তিময় জাগৃতি মন্ত্রের সন্ধান মিলে না। 'বন্দে মাতরম' সঙ্গীতটি দুতিন বছরের আগের রচনা হলেও বঙ্কিমচন্দ্র সঙ্গীতটিকে আনন্দমঠ গ্রন্থের যোগ্যতম পরিবেশে সন্নিবিষ্ট করে তার প্রকৃত তাৎপর্য দেশবাসীর সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পট-ভূমির উপর রচিত হলেও, 'আনন্দমঠ' প্রকৃত প্রস্তাবে দেশোদ্ধারে সংকল্প সিদ্ধ মহাবেদ। উপন্যাস ও যবন বিনাশ আলেখ্য ছদ্ম আবরন মাত্র, অতএব অবান্তর। রমেশ দত্ত তাই আনন্দমঠকে গীতার রাজনৈতিক ভাষ্য বলেছেন। আনন্দমঠ প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর।

আনন্দমঠের ধর্মাচরন ও দেশের জন্য আত্মোৎ-সর্গের দৃষ্টান্ত যে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমি ছিল সে সত্য সর্ব্বজনস্বীকৃত। বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডও ছিল আনন্দমঠের বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আদর্শ প্রভা-বিত। সে বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জাতীয় পুর্ণ-জাগরনের মন্ত্রদাতা ঋষি এবং কর্মযোগ গ্রন্থের ঋত্বিক প্রধান। বর্তমান বর্ষে দেশব্যাপী আনন্দমঠের শত-বর্ষপূর্তি পালন করা হচ্ছে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। আসুন, আমরাও তাতে যোগ দি এবং উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারন করি 'বন্দে মাতরম'।

আনন্দমঠ সম্পর্কে কিছু লোকের একটি ধারনা আছে যে গ্রন্থখানিতে সাম্প্রদায়িকতা আছে। ধারনাটি অমূলক। তাই যদি হত তাহলে ব্রিটিশ-সরকার আনন্দমঠ গ্রন্থটিকে নিষিদ্ধ করতেন না। সরকার বরং মনে করতেন, আনন্দমঠ বিপ্লবী স্বাধীনতা সং-গ্রামীদের প্রেরনার উৎস। মারকুইস অব জেটল্যাণ্ড তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন. বাংলার বিপ্লবীদের চরিত্র ভালভাবে বুঝতে হলে আনন্দমঠ পড়া একান্ত-ভাবে আবশ্যক। শ্রীঅরবিন্দও বলেছেন আনন্দমঠ তাঁদের বৈপ্লবিক স্বদেশ চেতনা জাগাতে অমূল্য শক্তি জুগিয়েছিল।

গ্রন্থের উদ্দেশ্য জাতীয় শক্তির উদ্‌বোধন, দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য সর্বস্ব পণের আহ্বান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে নির্ভয়ে আত্মবলিদানের ব্রতগ্রহন। গ্রন্থের রচনাকাল ব্রিটিশ অধিকার যুগে, মুসলমান শাসনকালে নয়। গ্রন্থের পটভূমি যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ তাও ব্রিটিশ আমলের ঘটনা। সুতরাং আনন্দমঠ বনিত দেশপ্রেমিক সন্তানদলের বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে, যে সরকার দেশ শোষন করে কিন্তু প্রজাদের প্রতি কর্তব্য করে না দেশের সম্পদ সাগরপারে পাঠায়।

উপন্যাসের আকার লেখা বলে, গ্রন্থে 'যবন' 'নেড়ে' দুচারটি শব্দ থাকায়, আনন্দমঠের মূল বক্তব্য

নস্যাৎ হতে পারে না, অথবা আনন্দমঠকে সাম্প্রদায়িক ঐক্যের পরিপন্থী বলা চলে না।

ভারতের মুসলমান শাসন যে দেশের স্বশাসন ছিল না তার প্রমাণ উল্লেখের প্রয়োজন নেই। সাত শত বছরের পরাধীনতার ইতিহাস নতুন করে ব্যাখ্যা ও অনাবশ্যক। সুতরাং ইংরাজ অধিকার উচ্ছেদের-সংগ্রামে প্রাক-ইংরাজ পরশাসনের বেদনাময় স্মৃতি মনে উদিত হওয়া স্বাভাবিক। তা উদিত না হলে ভাবের ঘরে চুরি করা হত। সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম-চন্দ্র মিথ্যা ছলনার আশ্রয় নেন নি এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্যের নামে আত্ম-প্রবঞ্চনার মোহে পড়েননি। তিনি সত্য অনুভূতিকে অকপটে ব্যক্ত করেছেন।

যে বিপ্লব যোদ্ধারা স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা পর্বে ত্যাগ মন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে, ঘর ছেড়ে, দুঃখবরন ও আত্মাহুতির পথে নেমে এসেছিলেন, আনন্দমঠের সন্তানদলের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়ে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন এবং বন্দেমাতরম মন্ত্র উচ্চারন করতে করতে হাসিমুখে ফাঁসির রজ্জু গলায় পরেছিলেন, তাঁদের মনে কখনো কি ভুলেও হিন্দু-মুসলমানের প্রশ্ন উঠেছে? তাঁদের আত্মদান ছিল অখণ্ড ভারতভূমির স্বাধীনতার জন্য। যে ভারতের স্বপ্ন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মানসপটে এঁকেছেন এবং বন্দে মাতরম সঙ্গীত ও আনন্দমঠ উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলে-ছেন, তাতে সাম্প্রদায়িক স্বার্থ চিহ্ন নেই, নেই হিন্দু মুসলমান কৃত্রিম বিভেদের ছায়া।

দেশকে সর্বত্রই জননী জন্মভূমি মনে করে ভক্তি জানানো হয়। জননী ও জন্মভূমিকে আমাদের শাস্ত্রে স্বর্গের চেয়ে গরীয়সী বলা হয়েছে। আনন্দমঠে সেই জন্মভূমিকেই চিন্ময়ী দেবীরূপে কল্পনা করা হয়েছে।

আনন্দমঠের শতবর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান তাই আমাদের এক পবিত্র কর্তব্য। হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে হাতে হাত রেখে এই মহান অনুষ্ঠান পালন করুন।

সেই সঙ্গে স্মরন করুন সেই আশুতোষ তরুণ-সন্ন্যাসীদের যারা নিশা না ফুরাতে নব উষার অস্ফুট আলোকে নিঃসঙ্গ নির্ভীক পদসঞ্চারে ব্রিটিশের-লৌহ কারাগারে ফাঁসীর মঞ্চে উঠে মহান আত্ম অবদানের মাঝে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন বন্দে-মাতরম্ বলে। বন্দে মাতরম। আনন্দমঠের জয় হোক।

বামফ্রন্ট কি মার্কসবাদ বিরোধী ?

শান্তিকুমার দাশগুপ্ত

বছর চারেক আগে প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে চারজন রাজনৈতিক নেতা জ্যোতিবাবুর সঙ্গে মহাকরণে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের মধ্যে একজন মুখ্যমন্ত্রীকে কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন।

১। মার্কস—লেনিন—গান্ধীজী জওহরলাল এমন কি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বলেছেন যে, সমবায় প্রথায় কৃষির ব্যবস্থা না হলে কৃষি সমস্যার সমাধান নেই। সমবায় খামার গড়ে তোলা এখনই সম্ভব নয় জানি, কিন্তু তার জন্য প্রচার আরম্ভ করছেন না কেন ?

২। হিমঘরগুলো মধ্যস্বত্ব ভোগীদের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে, অসময়ে আলু, আপেল এবং অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পাওয়া যাতে যায় তাই মনে করেই ওগুলো তৈরি হয়েছিল কিন্তু এখন মধ্যস্বত্বভোগীরা সেখানে খাদ্য আটকে রেখে দাম বাড়িয়ে তুলেছে। তাতে চাষীরাও দাম পাচ্ছে না, ক্রেতা সাধারণকেও বেশিদামে কিনতে হচ্ছে। ওগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত অথবা চাষী সমবায়ের মাধ্যমে গড়ে তুলছেন না কেন ?

৩। ব্যক্তিগত মালিকানা বোধটা কমানোই কমিউনিজমের লক্ষ্য ; আপনারা কেন সরকারে ন্যস্ত জমি ১/২ বিঘে করে ভূমিহীনদের বন্টন করছেন—এটা কি মালিকানার মানসিকতা বাড়িয়ে তুলবে না ? ভূমি আইন কিছু রদ বদল করে সরকারে ন্যস্ত জমিগুলো কি ভূমিহীন কৃষকদের সাহায্যে সমবায় খামারে পরিনত করা যেত না ?

৪। প্রকৃত কমিউনিষ্টের মত খাদ্যশস্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রায়ত্ত করার চেষ্টা কেন আপনি করছেন না ?

৫। একচেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারে দিল্লীর সঙ্গে প্রয়োজন হলে বিরোধ সৃষ্টিতে আপনার বাধা কোথায় ?

জ্যোতিবাবু উত্তর দিয়েছিলেন—১। সমবায় এদেশে চলবে না—ওতে আমারও ভরসা নেই ; ২। হিমঘরগুলো নিয়ন্ত্রণের কথা ভাবা যেতে পারে ; ৩। সরকারে ন্যস্ত জমিগুলো এভাবে বন্টন ছাড়া কিছুই করার নেই—সব রাজ্যেই ওই একই পদ্ধতি চলছে। ৪ ও ৫। রাজ্যের হাতে কোন ক্ষমতা নেই—তাই ও ব্যাপার নিয়ে আমরা ভাবছি না।

লোকসভার জনৈক সি, পি, এম অধ্যাপক সদস্য একদিন বলেছিলেন যে, তাঁরা এখন অনেক চালাক হয়ে গেছেন, অন্য সব কাজ ফেলে তাঁরা শুধু দুর্নীতি দমনের দিকেই নজর দেবেন।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলো থেকে সি, পি, এম অর্থাৎ বামফ্রন্টের মার্কসবাদ সম্পর্কে ধ্যান ধারণার স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সমবায়ে মুখ্য মন্ত্রীর 'ভরসা' নেই এবং ওটা এদেশে চলবে না—তার জন্যে প্রচার শিক্ষার ব্যবস্থা করে কোন লাভ নেই অথচ আমরা মার্কসবাদি। হিমঘরগুলোর সা হা যে মধ্যস্বত্ব

ভোগীরা মোটা মুনাফা লুটছে জেনেও মার্কসবাদী (?) মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার পরের দিন ঘোষণা করেছিলেন যে, হিমঘর গুলোর দিকে নজর দিতে হবে। পরবর্ত্তী কালে তাঁর মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কমল গুহ কয়েকটি সমবায়ী হিমঘরের ব্যবস্থা করেছেন কাগজে দেখলাম। কিন্তু এসব সমবায় কাদের নিয়ে গঠিত হয়েছে? তাঁরা চাষী কি না আত্মীয় স্বজন অথবা দলের লোক? সমবায় ব্যাংকের টাকায় কাদের মুনাফা লোটার ব্যবস্থা করে দেওয়া হল? সমবায়ের নামে আর এক ধরণের মধ্যসত্ব ভোগী তৈরী করা হল সরকারী টাকায়। সরকারের টাকাই যখন গেল তখন রাষ্ট্রায়ত্ব হিমঘর করা হোলনা কেন অর্থাৎ মার্কসবাদও গেল—সরকারী টাকা নয়ছয়ের ব্যবস্থা করে দুর্নীতি দমনও (?) হল।

এ আমলেও প্রচুর বাস মিনি বাসের পারমিট দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তিকে। পারমিট দিয়ে দল বা ব্যক্তি কত সংগ্রহ করেছে জানিনা, ব্যাংক গুলোকে পথে বসাবার ব্যবস্থা হচ্ছে নিশ্চয়ই। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে মোটা টাকা নিয়ে ব্যক্তি গত মালিকানায় বাস মিনি বাস চালানোর ব্যবস্থা না করে সরকার কি নিজেই সে টাকায় নিজের নিয়ন্ত্রণে বাস মিনিবাস চালাতে পারতেন না? টাকার অভাবের অজুহাত তো এক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না। দুটো কারণে বামফ্রন্ট সরকার এটা করতে পারেন—(১) সরকারী সংস্থায় লাভ হয় না—শ্রমিকরা সরকারের জন্য সৎ ভাবে পরিশ্রম করেনা। ব্যক্তির জন্যই তারা বেশী কাজ করে। অর্থাৎ মার্কসের তত্ত্ব ভুল। অথবা, (২) ব্যক্তিকে পারমিট দিলে দলের এমন কি পারমিটদাতারও পকেটে কিছু টাকা আসে। এই দুটোর কোনটাই কি মার্কসবাদের লক্ষণ?

টিটাগড়ে কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই করপোরেশনের একটা ইউনিটের ভিত্তি স্থাপন করে জ্যোতিবাবু ঘোষণা করেছিলেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থা গুলো সঠিকভাবে কাজ করছে না—কলকাতা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশনই সকলের ভরসাস্থল। রাষ্ট্রায়ত্ব সংস্থার দোষ ত্রুটি দূর করে তাকে সার্থক করে তোলার চেষ্টা না করে মার্কসবাদী (?) মুখ্য মন্ত্রী বিলাতী সংস্থার পৃষ্ঠপোষকতা করছেন কেন? কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে রাষ্ট্রায়ত্ব করার বক্তৃতা জ্যোতিবাবু অনেক দিয়েছেন কিন্তু হাতে ক্ষমতা পেয়েও তিনি সেই কোম্পানিকেই ভরতুকি দিয়ে চালাচ্ছেন। বিলাতের প্রতি জ্যোতিবাবুর একটু বেশি ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় কেন তা বোঝা মুস্কিল।

মনে পড়ছে হলদিয়ায় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে জ্যোতিবাবু বহুজাতিক সংস্থাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন পশ্চিম বঙ্গে কারখানা প্রভৃতি স্থাপনের জন্য। রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব হাতে এসেছে বলেই কোন কমিউনিষ্ট তার মূল সূত্র থেকে সরে যেতে পারে না। ভারতবর্ষ বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর অতিক্রম করেনি মনে করলে দেশী পুঁজিপতিদের কর্মপন্থা অব্যাহত রাখা যেতে পারে কিন্তু তাই বলে বহুজাতিক সংস্থাকে আহ্বান করে দেশের সম্পদ বিদেশে চালান দেবার সুযোগ কখনই করে দেওয়া সম্ভব নয়। পশ্চিম বঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকার সে কাজও করতে প্রস্তুত। কমিউনিষ্ট পার্টির নাম নিয়ে সি, পি, আই (এম) তথা

বামফ্রন্ট সরকার মার্কসবাদের মূল তত্ত্বকে আঘাত দিয়েই চলছেন।

কিছুদিন আগে হঠাৎ দেখা গেল যে, বামফ্রন্ট সরকার পাটকলগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করতে অনুরোধ করলেন কেন্দ্রীয় সরকারকে। অথচ ঠিক সেই একই সময়ে বিড়লা, টাটাদের হাতে তুলে দিতে চাইলেন পশ্চিম বঙ্গের দুর্বল, ছোট, মাঝারি শিল্প সংস্থা গুলিকে, সেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা ভাবলেন না তাঁরা—ব্যবস্থা করলেন বড় পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়ার। এর থেকে কি একথা সরকারের তরফ থেকেই বলা হল না যে, রাষ্ট্রায়ত্ত করলে দুর্বলতা যাবে না, অর্থাৎ লোকসান চলবে। তবে পাটকল গুলোর রাষ্ট্রায়ত্তের কথা তুলে সাধারণকে ধাপ্পা দেবার চেষ্টা কেন? কেন মিথ্যা কমিউনিষ্ট সাজার চেষ্টা?

মার্কসবাদকে খতম করার নবতম কৌশল করেছে বামফ্রন্ট সরকার অষ্টম শ্রেণীর ইতিহাসের পাঠ্য সূচীতে ভারতের মুক্তি আন্দোলনের কথা ১১ পাতায় এবং চীনের লঙমার্চের কথা ১৭ পাতায় শেষ করার নির্দেশ দিয়ে। হঠাৎ মনে হতে পারে যে, বামফ্রন্ট সরকার চীনকে প্রাধান্য দিতে চাচ্ছে। কিন্তু মার্কসবাদের বিরোধিতা করাই হল সরকারের মূল লক্ষ্য। মার্কসবাদের একটা বড় শিক্ষা বিপ্লব আমদানী বা রপ্তানি করা যায় না। অর্থাৎ দেশের মানসিকতার ঘাড়ে জোড় করে কোন কিছু চাপিয়ে দেওয়া যায় না, ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধন করতে হয়। চাষীদের ঘাড়ে জোর করে 'কো-অপারেটিভ' এবং 'কালেকটিভ' ফার্ম চাপাতে গিয়ে লেনিনকেও পিছিয়ে আসতে হয়েছিল, ধীরে সুস্থে বুঝিয়ে পরে তাদের ঐ পথে নিয়ে যাওয়া হয়। এই সত্য জেনেও ভারতের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসকে গৌণ করে চীনের লং মার্চকে প্রাধান্য দেওয়ার স্বভাবতই বাঙ্গালীর মনে ঘোরতর প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে, তারা মনে করবে যে মার্কসবাদ জবরদস্তি করতেই চায়। চাকুরীর ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কি ত্রাণ দানের ক্ষেত্রেও সি, পি, এমের নীতিহীন দলবাজী এবং জবরদস্তি দেখে সাধারণ বাঙালী মনে করছেন যে, মার্কসবাদের অন্য নাম জবরদস্তিবাদ। এই মারাত্মক মিথ্যাটি প্রচার হয়ে চলেছে বামফ্রন্টের কার্য কলাপের ফলে।

সরকারে ন্যস্ত জমি ১/২ বিঘা করে বিতরণের উদ্দেশ্যে ভোট পাবার চেষ্টা মাত্র। এটাও সম্পত্তি চেতনা জাগিয়ে মার্কসবাদের বিরোধিতা করাই। প্রকৃত মার্কসবাদী সর্বদাই মূল সমস্যাটীর কথা মনে রাখে; কৌশল হিসাবে সে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারে কিন্তু কিছুতেই উল্টো মুখে হাঁটে না। বামফ্রন্ট সেই উল্টো পথেই চলছে।

সিটু প্রভৃতি বেতন কাঠামোর প্রতিবাদে করলা শিল্পে এক দিনের ধর্মঘট করছে: পরবর্তী কালে ভারতের সমস্ত সরকারী সংস্থায় একদিনের ধর্মঘট ডাকার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ সরকারী সংস্থার ক্ষতিটা এদের খুবই কাম্য। ভাবটা এই যে, বিড়লারা এবং অন্যান্য পুঁজিপতিরা শ্রমিকদের বেশ ভালো বেতনই দিয়ে থাকেন। সরকারী সংস্থা যত বিপদগ্রস্ত হবে ততই সমাজবাদী ধ্যান ধারণায় আঘাত লাগবে। সাধারণ মানুষ মনে করবেন যে সরকারী সংস্থা মানেই লোকসান এবং এ সব জায়গায় বেতন কম, অনাচার বেশী। সুতরাং রাষ্ট্রায়ত্ত

করার বিরুদ্ধেই সাধারণের মনোভাব গড়ে উঠবে। ব্যক্তিগত পুঁজির বাড়বাড়ন্ত করে কোন্ ধরণের সাম্যবাদ আনতে চাইছেন সিটুর অর্থাৎ বামফ্রন্টের বড় শরীকের নেতারা ?

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিছক মঙ্গলকামী রাজ্যও হয়ে ওঠেনি। এরা সরকারী উন্নয়নের টাকা মাইনে বাড়াবার কাজে লাগিয়েছে। সরকারী চাকুরে এবং মাস্টার মশায়দের মাইনে বাড়ালে পোলিং এজেন্টদের সাহায্য পাওয়া যাবে—অর্থাৎ ভোটে জেতার সুবিধা। গ্রামের মানুষের উন্নতির কথা এ সরকার ভাবে না—ব্যাংক এবং সমবায়ের ঋণ পাইয়ে দেওয়া যাবে, লাঠির জোরে ভোটও আসবে। দিল্লী থেকে 'কাজের বদলে খাদ্য' পরিকল্পনায় গম আর টাকা আসবে—তারই সাহায্যে দল বাড়ানো যাবে। গ্রামের উন্নতি বা তার জন্যে মার্কসীয় ধ্যান ধারণার প্রয়োগে এরা নেই।

দিল্লীর হুঁশিয়ারীকে অগ্রাহ্য করে এরা খরার ভয়াবহতা বাড়িয়েছে—ক্ষুদ্র সেচের পরিকল্পনা তখন এরা নেয় নি; গুদামে পড়ে মরচে ধরে গেছে গভীর ও অগভীর নলকূপের যন্ত্রপাতি। কর্তাদের সে কথা মনে পড়ছে এখন। 'খরা খরা' করে বিধান সভায় বক্তৃতা হয়েছে অনেক, বামফ্রন্টেরও বৈঠক বসেছে বার কয়েক। হুমকি দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রকে —খরাত্রাণে গাফিলতি চলবে না, ৬০ কোটি টাকা চাই, পরে টাকার অংক বদলে হল ১০০ কোটি এবং শেষে ঠেকেছে ২৫০ কোটিতে। আবার সেই মোটা টাকার দাবি—বন্যাত্রাণের মত সে টাকারও হিসাব পাওয়া যাবে না, নিশ্চই এর নাম দুর্নীতি নয়। এই টাকার জন্য মন্ত্রীরা দিল্লীতে ধরণা দেবেন এক সময় তাও স্থির হয়েছিল।

খরা দেখতে দিল্লীর সমীক্ষকরা একবার এসে ছিলেন—আবার দ্বিতীয়বার এলেন ৮ই নভেম্বর। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মার্কসবাদী (?) নেতা পুজোয় ছুটিতে ক্লান্তি দূর করতে গেলেন শৈলাবাসে; ছুটি কাটিয়ে একেবারে মহাকরণে—বাড়ি যাবেন কি করে? খরায় যে মানুষ মরছে। ভীষণ চিন্তার প্রমাণ পাওয়া গেল—হেলিকপ্টারে করে দেখতে গেলেন খরা অঞ্চল একেবারে ঝুরোঝুরা কায়দায়। সার্কিট হাউসে বসে উচ্চপদস্থ কর্মচারী, এম, পি, এম. এল. এদের সঙ্গে আলোচনাটা অবশ্য সেরে নিয়েছেন। এবার টাকাটা পেলেই দলের লোকেরা দেশের কাজ আরম্ভ করে দেবে।

নিশ্চয়ই রাজ্যের হাতে সব ক্ষমতা নেই, কিন্তু কোন্ দেশে কমিউনিষ্ট পার্টির হাতে ক্ষমতা ছিল? কেবল নির্বাচনের জন্য টাকা সংগ্রহ এবং তিন কোটি টাকার অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হওয়াই কি কমিউনিস্টদের লক্ষ্য? টাটাদের অনেক প্রকার সুযোগ দিয়ে পাঁচতারা হোটেল বানাবার সুযোগ করে দেওয়া মার্কসের কোন্ সূত্রে আছে? এটা 'ক' কেজ চাপিয়ে দিয়েছে? বামফ্রন্টের কার্যকলাপে মার্কসবাদ ধ্বংস করার চেষ্টা কি লক্ষ্য করা যাচ্ছেনা?

টাকার জন্য বারবার হুমকি না দিয়ে এক চেটিয়া পুঁজি রাষ্ট্রায়ত্ব করার দাবিতে ধরণা দেওয়া বা অন্য প্রকার আন্দোলন গড়ে তোলাই কি প্রকৃত মার্কসবাদীদের কর্তব্য নয়? এ আন্দোলনে সমস্ত পশ্চিমবঙ্গ সামিল হতো—হত বঙ্গের বাইরেরও বহু মানুষ। কিন্তু সি, পি, আই (এম) তথা বামফ্রন্ট এ কাজে কিছুতেই যেতে পারে না। ক্যাডারদের ঘরে রাখার জন্য বিপ্লবী সেজে মাঝে মাঝে পাটকলগুলি রাষ্ট্রায়ত্ব করার কথা বলতেই হয়। ওটা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখার মত। কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় এঁদের কাজ বড় পুঁজিপতিদের পাঁচতারা হোটেল বানাবার ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং 'দুর্বল' ছোট বড় কারখানা গুলিকে একচেটিয়া পুঁজির হাতে দেওয়া। মার্কসবাদ ধ্বংস করতে চাইছে বামফ্রন্ট সরকার এ সত্য প্রকৃত মার্কসবাদীদের বুঝে নেওয়া উচিত।

ইংরেজ তৈরী কংগ্রেস, কি করে ইংরেজ হটাও প্রতিষ্ঠান হল

—ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

বিপ্লবী ও চরমপন্থীদের দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার সচেষ্ট হল। ১৯০৮ সালের ১১ই নভেম্বর ১৮১৮ সালের তিন নম্বর রেগুলেশন অনুযায়ী গ্রেপ্তার করল বাখরগঞ্জের অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সতীশচন্দ্র চাটার্জিকে, অনুশীলন সমিতির নেতা ঢাকার পুলিন বিহারী দাস ও ভূপেশচন্দ্র নাগকে নবশক্তির সম্পাদক মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতাকে, সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রকে, অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি, মিত্র ও সহ সভাপতি শ্রীঅরবিন্দের ঘনিষ্ট বন্ধু সুবোধচন্দ্র মল্লিককে কার্লাইল সার্কুলার বিরোধী অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সংগঠক শচীন্দ্রপ্রসাদ বসুকে এবং সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক শ্যাম-সুন্দর চক্রবর্ত্তীকে। এই নয়জনকে গ্রেপ্তার করে তিন রেগুলেশন অনুযায়ী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হল। ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাসে Indian criminal Law Ammendment Act-XV আইনের ১৬ধারা অনুযায়ী অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সমস্ত শাখা বাখরগঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমাজকে বে-আইনী প্রতিষ্ঠান ঘোষণা করা হল। ১৯০৯ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা শাখাও বে-আইনী হল।

১৯০৭ সালে লালা লাজপৎ রায় ও সর্দার অজিত সিং শহীদ ভগৎ সিং এর খুল্লতাতো পাঞ্জাব থেকে নির্বাসিত হলেন। ১৯০৭ সালে তিন বৎসরের জন্য সভাসমিতি নিষিদ্ধ করে আইন হল। সন্ধ্যা, অনুশীলন সমিতির মুখপত্র যুগান্তর, বন্দেমাতরম প্রভৃতি কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হল। ১৯০৯ সালে মারাঠা কাগজে প্রবন্ধ লেখার জন্য রাজদ্রোহ অভিযোগে লোকমান্য তিলককে ছয় বছর মান্দালয়ে কারারুদ্ধ করা হল। এর প্রতিবাদে বোম্বাইর শ্রমিকরা কলিকাতা এলাকার রেলে ও ছাপাখানায়, চটকলে ধর্মঘট হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলন সারা ভারতে এমনকি লণ্ডনে ছড়িয়ে পড়ল। বড়লাট হতে দারগা পর্যান্ত সকলেই মৃত্যুভয়ে শংকিত ছিল। ১৯০৬—০৯ সালের মধ্যে বাংলাদেশে রাজনৈতিক মামলা হয়েছিল অন্ততঃ ৫৫০টী, এই সব বিপ্লবী আন্দোলনের ফলে নরমপন্থীরা সরকারের ত্রোক বাকোর পথ ছাড়তে বাধ্য হল। ১৯০৯ সালে মিন্টোমর্লি শাসন সংস্কার ঘোষণা করে ইংরেজ সরকার নেতাদের আইন সভায় ঢোকার লোভ দেখাল। বঙ্গভঙ্গ রদ করতে ইংরেজ সরকার বাধ্য হল (১৯১১ সালে) কিন্তু ১৯১২ সালে ভারত সচিব লর্ড ক্রু সদম্ভে বলেন যে ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়ার মত স্বায়ত্ব শাসন ভারতবাসীর পক্ষে দুরাশা তা কোন কালে পূর্ণ হবে না।

ভারত সচিবের এই দম্ভোক্তিত উত্তর হিসাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের নৈতিক বল চূর্ণ করার জন্য ভারতবাসীর ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব প্রকাশ হেতু দিল্লির প্রথম বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর দিল্লিতে রাজকীয় প্রবেশের দিন ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে বোমা নিক্ষেপ করা হয়। ব্রিটিশের অপপ্রচার যে ভারতবাসীরা

অন্তর থেকে ব্রিটিশ শাসন কামনা করে মিথ্যা প্রমাণিত হল।

নরমপন্থীরা তখন কংগ্রেসে আধিপত্য বজায় রাখল। আমরা আলোচনা করেছি যে ১৯০৫ সালে বারাণসীতে কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয় সেখানে গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনকে সমর্থন জানানো হলেও বিদেশী পণ্য বয়কট সম্বন্ধে কংগ্রেস মত প্রকাশ করেনি। ১৯০৬ সালে কংগ্রেসের অধি-বেশন হয় কলিকাতায়। আবহাওয়া অত্যন্ত উত্তেজনাপূর্ণ। তাঁর উপশম ঘটিয়ে নরমপন্থী ও গরমপন্থীদের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের জন্য দাদাভাই নৌরজীকে বিলাত থেকে এনে সভাপতি করা হয়। দাদাভাইয়ের উপস্থিতিতে উভয়পক্ষের সংঘর্ষ নিবারিত হয় বটে কিন্তু মতান্তরের সমাধান ঘটেনি। এই অধিবেশনেই প্রথম কংগ্রেসের লক্ষ্য স্বরাজ লাভ সভাপতির ভাষণে ঘোষিত হয়। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে চরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। কয়েক বছর কংগ্রেস রইল নরমপন্থীদের হাতে সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহের মত রাজানুগৃহীত ব্যক্তি ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪—১৮) আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার ভারতরক্ষা আইন বহাল করে বিপ্লবী ও চরমপন্থী নেতাদের অন্তরিন ও জেলে আটক করে রেখেছিল। দেশের মেজাজ তখন কতদূর ইংরেজ বিরোধী না জেনে ইংরেজ কর্তৃক পুরস্কারের প্রলোভনে দেশের প্রধান প্রধান রাজনীতিকরা যুদ্ধে সরকারকে সাহায্য করার জন্য আহবান দিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা রুখে দাঁড়াল। যুদ্ধের সময় ইংরেজের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সারাভারত ব্যাপি বৈপ্লবিক গণ-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে সারা ভারতের ও বিদেশে অবস্থিত ভারতীয় বিপ্লবীরা সংগঠিত হল। ১৯১৫ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারী বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে সারাভারত ব্যাপী অভ্যুত্থান হবে স্থির হল। কেবলমাত্র পূর্ববাংলা হতে পঞ্জাব পর্যন্ত নয় আরও ব্যাপক আকারে সিঙ্গাপুর ও বার্মার সৈন্যরাও বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করার ব্যবস্থা হল। বিশ্বাসঘাতকতার জন্য এক সঙ্গে অভ্যুত্থান না হলেও বিভিন্নস্থানে সৈন্যশিবির ও ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদের ও বিপ্লবীদের তুমুল সশস্ত্র লড়াই হয়েছিল। ১৯১৮ সালের ১৫ই জুন ঢাকাসহরে কলতাবাজারে শেষ লড়াই হয়, সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ করেন ভারিনী মজুমদার ও নলিনী বাক্‌চি।

যুদ্ধে তুরস্কের সঙ্গে ব্রিটেনের শত্রুতা তীব্র হওয়ায় ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরেজ বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রাক্কালে কংগ্রেস ও লিগের মধ্যে চুক্তি হল, চরমপন্থীরা কংগ্রেসে যোগ দিল। অম্বিকা চরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে এই অধিবেশন হয়। শাসন সংস্কারের এক খসড়া কংগ্রেস ও লিগের পক্ষ থেকে যুক্তভাবে সরকারকে দেওয়া হয়। ১৯১৮ সালে আগষ্টমাসে বোম্বাই কংগ্রেসের বিশেষ অধি-বেশন হয়। কংগ্রেস ইংরেজের প্রস্তাবিত শাসন সংস্কার (মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্ট) প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে, নরমপন্থীরা কংগ্রেস ত্যাগ করে লিবারেল দল গঠন করে। মন্টেগু চেমসফোর্ড আইন একেবারে বরবাদ করতে কংগ্রেসের দুই বছর লেগেছিল। ১৯১৯ সালে রাজদ্রোহ কমিটীর (Sedition commitee) রিপোর্ট বের হয়। রাওলাট রিপোর্ট নামে এর খ্যাতি। কমিটীর সুপারিশ অনুযায়ী আইন হল ১৯১৯ সালে ব্যক্তি

স্বাধীনতাকে কঠোর বিধির বেড়াজালে বাঁধা হল। ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল গান্ধীজীর ডাকে হরতাল হল। হিন্দু-মুসলমানের মিলন দেখে ইংরেজ সরকার ভীত সন্ত্রস্ত হল, গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন। জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ল, জনতা পুলিশের লাঠিপেটা হল, গুলিতে মারা গেল, কিন্তু পিছু হটেনি। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ দিল্লীর জুম্মা মসজিদের বেদী থেকে বক্তৃতা দিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অটুট রইল। অমৃতসরে জালিয়ানওয়ালাবাগে নিরস্ত্র অসহায় জনতার ওপর গুলি চালিয়ে হত্যাহত হল প্রায় দুই হাজার। কার্জনের আঘাত (বঙ্গভঙ্গ) দেশকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, জালিয়ানওয়ালা বাগের ব্রিটিশ নৃশংসতা তেমনই দেশের আত্মসম্মানকে অমোঘ শক্তি নিয়ে উদ্রিক্ত করে তোলে। শাজাবের দুঃখ বেদনা সারা ভারতে রক্তপুষ্পে ফুটে উঠল।

গান্ধীজী স্থির করলেন যে খেলাফৎ ও পাঞ্জাব সম্পর্কে ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের প্রতিকার দাবী করে এবং স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অহিংস অসহযোগ আন্দোলন করতে হবে। ১৯২০ সালের সেপ্‌টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে অসহযোগ প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আইনসভা বয়কট করার বিরুদ্ধে ছিলেন। ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশনে দেশবন্ধু গান্ধীজীকে সমর্থন করলেন। দেশ তখন গান্ধীজীকে নেতৃত্বে বরণ করে নিয়েছে। বিপ্লবীরাও যোগ দিল। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ অসহযোগ আন্দোলনের তত্ত্ব গ্রহণ করতে না পারলেও এই আন্দোলনের মাধ্যমে জন-জাগরণের যে সম্ভাবনা ছিল, জনগণের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার যে সুযোগ দেখা দিয়েছিল তা উপেক্ষণীয় নয়। এই সব ভাবনা চিন্তার পর নাগপুর কংগ্রেস অধিবেশন অন্তে অনুশীলন নেতা ও কর্মিবৃন্দ দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন এবং অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

গান্ধীজীর আহ্বানে সুপ্ত সিংহ যেন সদ্য নিদ্রা ভঙ্গের পর কেশর আন্দোলিত করে গর্জন করে উঠেছিল, হিন্দু-মুসলমানে যে অপূর্ব মিলন দেখা গিয়েছিল পরবর্তী যুগে তা অবিশ্বাস্য মনে হবে। স্বরাজ কয়েক মাসের মধ্যে আসছে গান্ধীজীর আশ্বাস পেয়ে দেশে এক নতুন আবহাওয়া এনেছিল। বিদেশী কাপড় পুড়িয়ে জনতা স্বাধীনতা সংগ্রামে অবিচালিত থাকার প্রতিজ্ঞা নিল। কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যেও উদ্দীপনা দেখা দিল। ব্রিটেন থেকে যুবরাজ এল, দেশব্যাপী বয়কট আন্দোলনে যুবরাজ তলিয়ে গেল, এক বছরের মধ্যে ২০০০ অধিক বন্দী হল, মহাত্মাগান্ধী ছাড়া প্রধান প্রধান নেতারা কারারুদ্ধ বলেন, ইংরেজ সরকার ভীত হয়ে আপোসের চেষ্টা করল গান্ধীজী রাজী হলেন না। এক বৎসর কেটে গেল, স্বরাজ এল না কিন্তু দেশের মনোবল তখনও অক্ষুণ্ণ। আহমদাবাদ কংগ্রেসে গান্ধীজীকে সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা দেওয়া হল খাজনা বন্ধ করার আন্দোলন কবে হবে দেশ তাই ভেবে উন্মুখ হয়ে ছিল।

দেওয়া হল খাজনা বন্ধ করার আন্দোলন কবে হবে

কিন্তু গান্ধীজী কেবলই ধৈর্য্য ধরে থাকার পরামর্শ দিলেন, পূর্ণ স্বাধীনতা লক্ষ্য বলে ঘোষণা করার প্রস্তাবকেও গান্ধীজী প্রত্যাখ্যান করলেন। কিন্তু জনতা নীরবে পুলিশের অত্যাচার সহ্য করল না। গোরখপুর চৌরিচৌরা গ্রামে অত্যাচারী পুলিশের

ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে জনতা থানায় অগ্নিসংযোগ করলে কয়েকজন পুলিশের মৃত্যু হয়। সংবাদ পেয়ে গান্ধীজী অহিংসানীতি থেকে বিচ্যুতিতে অত্যন্ত বিচলিত হন। আত্মশুদ্ধির জন্য উপবাস করলেন এবং অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখলেন। সারা দেশে আশা-ভঙ্গের ছায়া নেই নেমে এল তখনই সুযোগ পেয়ে বড়লাট রেডিং গান্ধীজীর গ্রেপ্তারের আদেশ দিলেন বিচারে গান্ধীজীর ছয় বছরের কারাদণ্ড হল (মার্চ, ১৯২১) আন্দোলন প্রত্যাহার করে গান্ধীজী ভুল করেছেন একথা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, আবুল কালাম আজাদ বলতে সংকুচিত হননি। বিপ্লবীদের চিন্তায় এই বিভ্রান্তির আশংকা থাকলেও গান্ধীজীর বিভ্রান্ত নেতৃত্বকে অগ্রাহ্য করে আত্মশক্তি বলে জনতাকে এগিয়ে নেওয়ার সম্বিৎ ছিল না এটা বিপ্লবীদের চূড়ান্ত বিফলতা।

ডাকরিণ হিউম কংগ্রেস জনতার কংগ্রেসে রূপান্তরিত হল, ইংরেজ সরকার জন আন্দোলনের চাপে ঘুরপাক খাচ্ছিল, জনতা দুর্বার গতিতে ইংরেজ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে এগুতেছিল, কিন্তু নেতাদের দুর্বলতা ও বিভ্রান্তির জন্য জনতা ওদের জীবনের আঞ্জনা ও অত্যাচারের কালিমা ধুয়ে মুছে ফেলতে পারল। ১৯২০-২২ সাল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বর্ণযোগ।

(ক্রমশঃ)

যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী

অষ্টাদশ প্রীতি সম্মেলন, ১৩৮৯ (ইং ১৯৮২)

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২৮শে পৌষ ১৩৮৯ (৯ই জানুয়ারী'৮৩) রবিবার মিত্র ইনষ্টিটিউশন (মেন) প্রাঙ্গণে এবার প্রীতি সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ৮টায় শুরু এবং ৪টায় সমাপ্তি।

সকাল ৯টায় পতাকা উত্তোলন ও শহীদবেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ। অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি ও সক্রিয় সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করি।

শুভেচ্ছান্তে—

সুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়
কানাই গুপ্ত
যুগ্ম সম্পাদক
২৫শে ডিসেম্বর ১৯৮২

অবনী ঘোষ পরেশ সান্যাল
ভূপেন মজুমদার শশাঙ্ক চৌধুরী
হেমন্ত তরফদার মহেন্দ্র ব্যানার্জী

যোগাযোগের ঠিকানা—৩২, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৭০০০০৯

যুগান্তর বিপ্লবী সম্মিলনী

অষ্টাদশ প্রীতি সম্মেলন, ১৩৮৯ (ইং ১৯৮২)

প্রীতি-সম্মেলন অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ—মিত্র ইনষ্টিটিউশন (মেন) ৬০-বি সূর্য সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
(পূরবী সিনেমার সামনে) শিয়ালদহগামী ও অভিমুখের সমস্ত ট্রাম ও বাস।

বিঃ দ্রঃ—দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিজনিত পরিস্থিতিতে অধিক আর্থিক সহায়তা কামনা করি।

Regd. No. R. N. 24511 / 71 / Postal Regd. WB / NC 77 / phone : 34 1795 মূল্য: ৩৫ প:

শিশুর কল্যাণ নারীর সম্মান দেশের উত্থান

চারা গাছ একদিন হয়ে ওঠে উপবন
আজকের শৈশব কালকের যৌবন।
শিশুই দেশের কর্ণধার
এর কাঁধে রয়েছে ভবিষ্যতের ভার।

নতুন বিশ দফা কর্মসূচীতে শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার জন্য সুসংহত শিশু উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

মা শুধু যে শিশুর জননী তাই নয়, তার প্রথম শিক্ষাদাত্রীও বটে। তাঁরাই দেশকে সভ্যতার পথে তোলেন। নারী ও শিশুর কল্যাণের ওপরেই নির্ভর করে দেশের ভবিষ্যৎ সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি।

তাই শিশু কল্যাণ ও নারীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এই কার্যসূচীকে নতুন জীবন দেওয়া হচ্ছে।

বালকের পুষ্টি আহার
যত্নে হয় সীমিত পরিবার।

বিস্তৃতভাবে জানতে হলে নিম্নলিখি[illegible] ব্যবহার করুন।

শ্রী ডি এস ঘোষাল
অ্যাসিস্টেন্ট ডিরেক্টর অফ ইনফরমেশন
রিজিওনাল ডিরেক্টরেট অফ ইনফরমেশন সেন্টার
ডি. এ. ভি. পি.
৩৯, রবীন্দ্র সরণী
কলিকাতা-৭০০০৭৩

আমি নতুন ২০ দফা কর্মসূচী সম্পর্কে বিশদ ভাবে জানতে আগ্রহী। অনুগ্রহ ক'রে এই সম্পর্কে আমায় বাংলা/ইংরাজী পুস্তিকাটি পাঠিয়ে দিন।

নাম.....

ঠিকানা.....

.....পিন.....

নতুন 20 দফা কর্মসূচী

davp 82/418

বিপ্লবী বাংলা

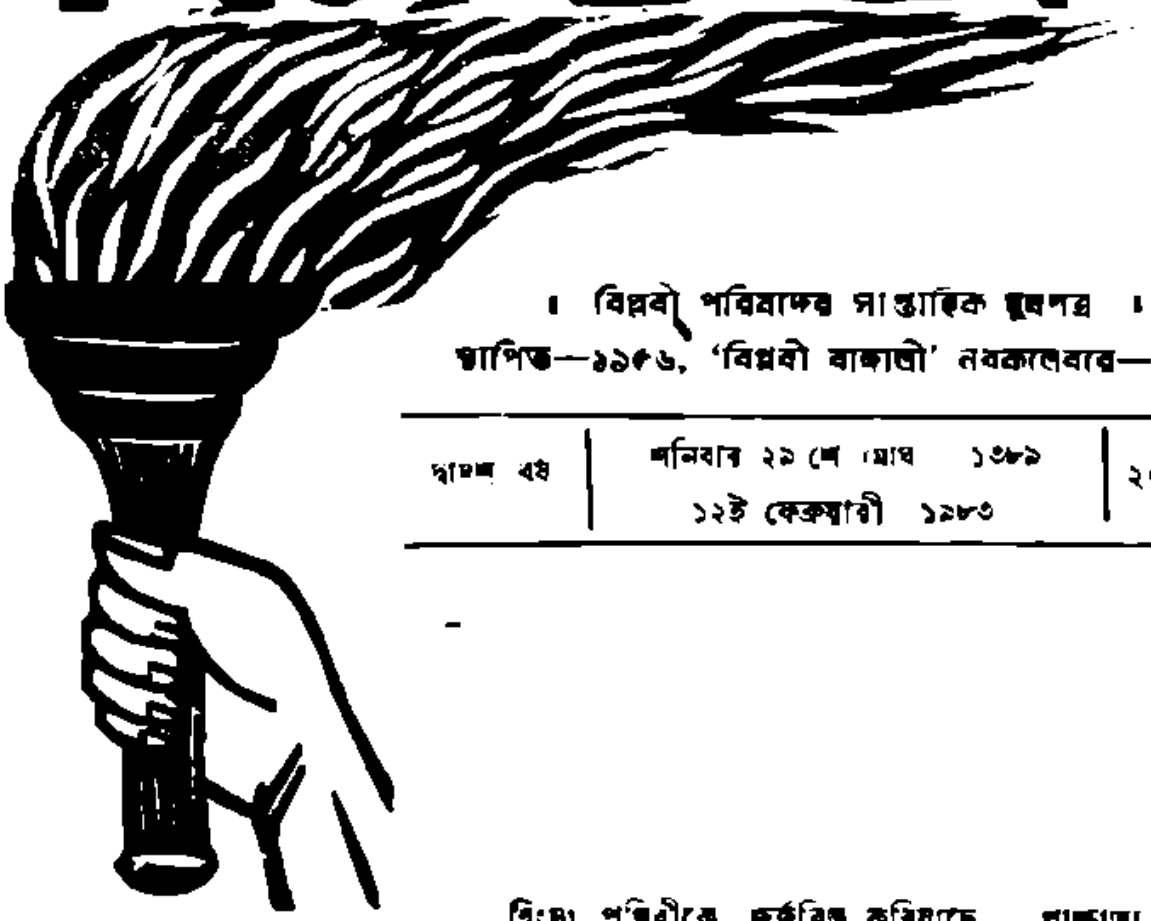

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।
স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙালী' নবকলেবরে—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ২৯ শে মাঘ ১৩৮৯ ১২ই ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩	২০ সংখ্যা

এক জাতি,
একপ্রাণ—একতা।

হিংসা পৃথিবীকে জর্জরিত করিয়াছে পাশ্চাত্য জাতিদের লক্ষ্য করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, তাহারা হিংসাচরণে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে হিংসার চর্চা করিয়া মানুষের লাভ হয় নাই। নূতন পথের সন্ধানে ব্রতী হইয়া ভারতই আজ পৃথিবীকে পথের সন্ধান দেখাইয়া দিক্।

—মহাত্মা গান্ধী

সম্পাদকীয়

ক্ষমা নেই

জলের প্রয়োজনীয়তা মানুষের জীবনে এমন অত্যাবশ্যক যে জলকে জীবন বলে গণ্য করা হয়েছে বহু সহস্র বছর ধরে। জল বিনা যেমন পৃথিবীর গাছপালা বাঁচতে পারে না, শস্যাদি উৎপন্ন হয় না, তেমনি মানুষের পক্ষেও জলবিনা জীবনধারণ করা সম্ভব হয় না। সে জল যদি পানীয় জল হয়, তবেত কথাই নেই। অথচ ভেবে অবাক্ হতে হয় যে কলকাতা মহানগরীতে আজ দীর্ঘদিন ধরে সেই পানীয় জল সরবরাহ করতে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন কলকাতা কর্পোরেশন। প্রথমে তাদের তরফ থেকে বলা হয়েছিল যে ৩১শে মার্চের মধ্যে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হবে। কিন্তু আজ ৭ই ফেব্রুয়ারীও জল পাওয়া যায়নি। খবরের কাগজের রিপোর্ট পড়ে জানা যাচ্ছে যে এই সরবরাহ কবে পর্যন্ত স্বাভাবিক হবে, তাও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না। সমস্তমত মেরামতী কাজ না করার জন্যই এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ যে এই মেরামতী কাজ করার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা ছিল এবং সেটাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। কারা এ জঘন্য কাজের জন্য দায়ী সেটাও নির্দ্ধারিত করা হয়নি। অন্যায় কারীকে সাজা দেওয়া ত দূরের কথা। সিমেন্টের পাইপ জলের এই চাপ সহ্য করতে পারবেনা বলে যে ইঞ্জিনিয়ার হুঁশিয়ারী দিয়েছিলেন, তার কথাও গ্রাহ্য করা হয়নি বলেও সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। এই পাঁচ লক্ষ টাকা কি টালা থেকে যে বিরাট জলবহনকারী পাইপ আছে, তার মধ্য দিয়েই দূর দুরান্তর প্রবাহিত হয়েছে? লোককে যদি মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হয়, তাকে প্রতারণা এবং ধাপ্পা বলে চিহ্নিত করলে কি ভুল হবে? আশ্চর্য্য হতে হয় এই দেখে যে মানুষ বিদ্রোহ করছেনা এখনও। সরকারী দলগুলির এই ব্যর্থতার বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলিও তাদের যথাকর্ত্তব্য পালন করছেনা। রাজনীতি এদেশে এমনই বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে যে সরকারী দলগুলির সমর্থক বা বিরোধী দলগুলির সমর্থকরা এই প্রাণঘাতী ব্যর্থতার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হচ্ছেন না।

কলকাতা কর্পোরেশনের এক ভূতপূর্ব মেয়র এর নাম দিয়েছিলেন "চোরপোরেশন"। এই হাল থেকে প্রতিষ্ঠানটি আজো মুক্ত হতে পারেনি। আগের দিনে এই অবস্থা কেউ কল্পনা করতেও পারত না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র যখন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন, তখন কত অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুল লাইব্রেরী, ও অন্যান্য প্রকারের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিকাশের জন্য! বস্তুতঃ পক্ষে পরদেশী বিদেশী শাসকরা যখন বলত যে ভারতবাসীরা স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত নয়, সেই অপপ্রচারকে চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করে কংগ্রেসের তরফ থেকে কর্পোরেশনের কর্তৃত্ব দখল করে প্রমাণ করে দিয়েছিল তাদের যোগ্যতা। দিনে দিনে আজ এই প্রতিষ্ঠানটির যে পরিণতি হয়েছে, তা দেখে সত্যই দেশের মানুষ লজ্জায় মাথানত করতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ এজন্য মন্ত্রী, কর্মচারী, উপদেষ্টা কমিশনার প্রভৃতির পেছনে অকাতরে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে। যে সমস্ত অপদার্থ দলগুলি কর্পোরেশনের (বর্তমান পরিধির মধ্যে সীমিত)

অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজগুলি করতে পারছে না, তারা এই প্রতিষ্ঠানটির পরিধি বাড়াতে চাচ্ছে নির্লজ্জের মত, শুধুমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে বহু লক্ষ লোকের আগমন ঘটেছে। তা ভিন্ন, লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা সহরতলী থেকে রোজ যাতায়াত করেন, তারাও একটি কপর্দক ট্যাক্স্ না দিয়ে সব রকম সুবিধাভোগ করেন। এতে এই প্রতিষ্ঠানটির জলসরবরাহ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, সাফসাফাই ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ায়, প্রায় অপরিচালনীয় দশায় এসে পৌঁচেছে। মজার কথা এটাই যে এই সব সমস্যার প্রকৃত সমাধানের পথ খুঁজে বের না করে ভূতের মত উল্টোদিকে পদক্ষেপ করছে পরিচালকবর্গ, তথা বামফ্রন্ট সরকার। প্রয়োজন যেখানে বসবাসের সুযোগ সুবিধা সহরতলীতে বিস্তৃত করে, মানুষকে সেখানে বসবাস করতে উৎসাহ দেওয়া। শুধ্ ভোটের লোভে কলিকাতার পৌরবাসীদের জীবন নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেল্ছে, তাদের বুঝিয়ে দেবার সময় এসেছে যে এই মারাত্মক খেলা চল্তে দেওয়া হবে না, চল্তে দেওয়া যায় না। একাজ যদি শহরবাসী না করে, তবে কলকাতা মহানগরী ও তার অধিবাসীরা নিশ্চিত রূপে ধ্বংস হয়ে যাবে। এদের চিনে রাখ্তে হবে। নির্বাচনের সময় এদের অপপ্রচারের শিকার না হয়ে, শিক্ষা দিতে হবে অন্যায় কাজ করলে কি ফললাভ করতে হয়। জনমত জাগ্রত থাকলে, শুধ্ এরাই নয়, ভবিষ্যতে যারা আসবে কর্পোরেশনের পরিচালন ভার নিয়ে, তারাও সংযত হতে বাধ্য হবে। কলকাতাকে যারা ধ্বংসের পথে নিয়ে চলেছে তাদের কোন ক্ষমা থাক্তে পারেনা, একথা দৃপ্তকণ্ঠে, বজ্র নির্ঘোষে বল্তে হবে।

পরলোকে বিপ্লবী সুরপতি চক্রবর্তী

স্বাধীনতা সংগ্রামী বিপ্লবী সুরপতি চক্রবর্ত্তী গত ৩০ জানুয়ারী কলিকাতায় একটি নার্সিং হোমে পরলোক গমন করেন। তাঁর আদি নিবাস ছিল চিত্রকুট, বিক্রমপুর ঢাকা। ছাত্র জীবন কেটেছে ঢাকা সহরে। ছাত্র জীবনেই অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন, সেই সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলের পত্রিকা শতদলে তাঁর লেখা প্রবন্ধ অধ্যাপক ও ছাত্র মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি ব্রিটিশ কারাগারে আটক ছিলেন, সেই সময় তিনি জেলের যাবতীয় অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। জেল হতে মুক্ত হয়ে ফরাসী ভাষায় বি, এ পাশ করেন এবং বিখ্যাত ভাষাবিদ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের অধীনে এবং নির্দেশে কিছু কাল গবেষণা করেন, Statistical Instituit এ যোগ দেন সেখানে বিদেশী গবেষকদের নিকট বিশেষ অদৃত হয়েছিলেন, তিনি বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। এক কালে বিপ্লবী বাংলার লেখক ছিলেন। তিনি অত্যন্ত রসিক ছিলেন, তাঁর লেখায়ও আমরা সেই পরিচয় পেয়েছি। কয়েক বৎসর আগে তাঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। তাঁর শোক সন্তপ্ত ছেলে ও মেয়েদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই এবং তার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

আনন্দমঠের পটভূমি

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিত পর)

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে ওয়ারেন হেষ্টিংসের আর একখানি পত্রের অনুবাদ দিয়ে এ বিষয় শেষ করব। এ পত্রখানিও তিনি লিখেছিলেন স্যার জর্জ কোলব্রুককে। তারিখ ৩রা মার্চ, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দ।

"পূর্বে লিখেছিলাম, সন্ন্যাসী ফকিরের দলগুলি কোম্পানীর এলাকা ছেড়ে চলে গিয়েছে। খবর তখন সেই রকমেরই ছিল। কিন্তু এখন দেখছি, হয় তারা ব্রহ্মপুত্র পার হতে না পেরে, নয় পরিকল্পনা পালটিয়ে, দুহাজার তিন হাজারের দলে রঙপুর এবং দিনাজপুর প্রদেশে ফিরে এসেছে। সন্ন্যাসীদের গতিবিধি সম্পর্কে যথা সময়ে খবর দেবার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের ওপর কড়া নির্দেশ এবং খবর না দিতে পারলে তাদের শাস্তি-দানের শাসানিজারী সত্ত্বেও, গ্রামবাসীরা সন্ন্যাসী-দের খবর দেয় না। সন্ন্যাসীদের প্রতি তাদের অন্ধভক্তি প্রবল। এ কারণে বিদ্রোহীরা যে কোন স্থানে অকস্মাৎ এসে পড়ে, মনে হয় তারা বুঝি আকাশ থেকে পড়ল।

এমনই একটি আকস্মিক সংঘর্ষে একটি নালা পার হতে গিয়ে কাপ্তেন এডওয়ার্ড সসৈন্যে প্রাণ হারিয়েছেন। জয়লাভ বিদ্রোহীদের সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে এবং সকল এলাকা থেকেই বিদ্রোহীদের তৎপরতার খবর আসছে। কাপ্তেন টুয়ার্টকে ১৯তম বাহিনী নিয়ে বিদ্রোহী সন্ন্যাসী-দের বিরুদ্ধে নিযুক্ত করা হয়েছিল, কিন্তু টুয়ার্ট যথাস্থানে পৌঁছবার আগেই বিদ্রোহীরা অন্য দিকে সরে গিয়েছে। ফলে কোন কাজই হয় নি। বহরমপুর থেকে একটি সেনাদল পাঠাবার নির্দেশ দিয়েছি, এই দলটি কাপ্তেন টুয়ার্টের বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করবে। সন্ন্যাসীরা যাতে বিহারের দিকে পালাতে না পারে, তার জন্য টাইরুটের অধীনে দিনাজপুর থেকে আরো একটা বাহিনীকে পুর্ণিয়ার দিকে পাঠিয়েছি। সৈন্যবাহিনীটি সন্ন্যাসী-দের সন্ধান পায় ভাল, না পেলে কোচবিহারে কাপ্তেন জোনসের সাহায্যে অগ্রসর হবে।

ইতিমধ্যে দেখা যায়, সন্ন্যাসীদের অনেকগুলি দল পুর্ণিয়ায় ঢুকে পড়েছে এবং হামলা শুরু করে দিয়েছে। তারা গ্রামে গ্রামে লুট ও অগ্নি সংযোগ করছে। পুর্ণিয়ার কালেক্টার কাপ্তেন ব্রুকের অধীনে একটি নবগঠিত গোলন্দাজবাহিনীকে সন্ন্যাসীদের দমনে পাঠিয়েছে। বাহিনীটি রাজ-মহলের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে। কাপ্তেন ব্রুক দ্রুতগতি গঙ্গা পার হয়ে বিদ্রোহীদের মোকা-বেলা করতে যাচ্ছিলেন, তখন বিদ্রোহীরা কোশা নদী পার হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের বাহিনী কোশাতীরে পৌঁছাবার একটু আগেই বিদ্রোহীরা নদী পার হয়ে ওপারে চলে যায়। এই বিলম্বের জন্য অভিযান সফল হতে পারে নি। আমার মনে হয়, সন্ন্যাসীরা কোম্পানীর এলাকা ছেড়ে চলে যেতে আগ্রহী। অবশ্য আমরা প্রস্তুত আছি এবং আমাদের সৈন্যদলও বিভিন্ন এলাকায় মোতা-

যেন আছে। যখনই সুযোগ আসবে আমাদের সৈন্যদল সন্ন্যাসীদের যুদ্ধে পরাস্ত করে উপযুক্ত শাস্তিবিধান করবে।

এই প্রসঙ্গে বলি, সন্ন্যাসীদের উপদ্রবের কারণে রাজস্ব সংগ্রহ ভাল হয় নি। বোর্ড অব রেভিনিউ অবশ্য কোন অজুহাতে ধার্য খাজনা মকুব করবে না বলে দিয়েছে। তবুও অবস্থার কথা না মেনে উপায় নেই। তাই যতদূর সম্ভব কোম্পানির স্বার্থের ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করছি। স্থানে স্থানে ছোট ছোট সৈন্যদল মোতায়েন রেখে ভবিষ্যতে সন্ন্যাসীদের তৎপরতা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাহুবহুল বড় সৈন্য বাহিনীকে কাজে লাগান হবে না। আমি আশা করি, ভবিষ্যতে রাজস্ব সংগ্রহে এ ধরণের ঘাটতি হবে না। ইতি—

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস এবং হাণ্টার সাহেবের বিবরণ বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের ভ্রাম্যমান বদমাস, উপদ্রবকারী ইত্যাদি আখ্যা দিলেও, বিদ্রোহীরা যে অসংগঠিত এবং লক্ষবিহীন ছিল এমন সিদ্ধান্ত কিন্তু তাঁদের বিবরণ থেকে করা যায় না। যাদের দমনে এত সৈন্য সেনানী নামান হয়েছিল এবং বছর তিনেক ধরে লড়াই চালাতে হয়েছিল তারা নিশ্চয়ই সাধারণ সন্ন্যাসী ফকিরের দল ছিল না। সন্ন্যাসীদের ঘাঁটি অর্থাৎ দুর্গ ছিল, যুদ্ধের জন্য আবশ্যক অস্ত্র ছিল এবং তাদের পিছনে ছিল গ্রামবাসীর সমর্থন। গ্রামবাসীদের মধ্যে যেমন ছিল দরিদ্র কৃষক ও ক্ষেত মজুর তেমনি ছিল জমিদার। কয়েকটি যুদ্ধে সন্ন্যাসীরা জয়লাভও করেছিল। এ থেকে অনুমান করা মোটেই অসঙ্গত নয় যে, সন্ন্যাসীরা কোন একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে সংঘবদ্ধ হয়েছিল। কি সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল? পতনোন্মুখ মুসলমান রাজত্বের অবসান ঘটিয়ে হিন্দুরাজ্য স্থাপন? হতে পারে। ইংরাজ লেখকরা সুকৌশলে সেই তথ্যটুকু এড়িয়ে গিয়েছেন। এই ধারণার ওপর ভিত্তি করেই বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসী সন্তানদলের চিত্র এঁকেছিলেন।

উপন্যাস ইতিহাস নয়। 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। লেখক বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা নিজেই বলেছেন, "পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ পূর্বক 'আনন্দমঠ' বা দেবী চৌধুরানীকে' ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড়ই বাধিত হইব।"[রাজসিংহ উপন্যাসের ভূমিকা] ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে স্বীকৃত ইতিহাসের বাঁধা পথে চলতে হবে, সাহিত্য শিল্প জগৎ সে কথা বলে না। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাহার কোন খাতির নাই "সুতরাং 'আনন্দমঠের' পটভূমি যে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সেই বিদ্রোহ নিয়ে চুলচেরা বিচার অবান্তর।

এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায়। বিদ্রোহ সশস্ত্র সন্ন্যাসীরা কোথায় গেল? চূড়ান্ত সংগ্রাম না করে তারা এমনভাবে মিলিয়ে গেল কেন? প্রশ্নের উত্তর সত্যানন্দের কথায় কিছুটা মেলে, "আমরা রাজ্য চাহি না—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।" বাকি উত্তরটুকু চিকিৎসকবেশী মহাপুরুষের কথায় আছে। চিকিৎসক কহিলেন, "সত্যানন্দ, আজ পূর্ণিমা।

সত্যানন্দ। চলুন—আমি প্রস্তুত। কিন্তু হে মহাত্মন, আমার এক সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আমি যে মুহূর্তে যুদ্ধ জয় করিয়া সনাতন ধর্ম নিষ্কণ্টক করিলাম—সেই সময়েই আমার প্রতি এ প্রত্যাখ্যানের আদেশ কেন হইল?

চিকিৎসক। তোমার কার্য সিদ্ধ হইয়াছে, মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইয়াছে। আর তোমার এখন কোন কার্য নাই! অনর্থক প্রাণিহত্যার প্রয়োজন নাই।

সন্ন্যাসীদের সহিত নবাবের কোন যুদ্ধের ঘটনা সন্ন্যাসী বিদ্রোহের বিবরণে দেখা যায় না। সন্ন্যাসীদের সব কটি যুদ্ধই হয়েছিল ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর সহিত। কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে নবাবের ফৌজ অবশ্য ছিল এই পর্যন্ত। কিন্তু তার দ্বারা মুসলমান রাজ্য ধ্বংসের ব্যাপারে সন্ন্যাসীদের কোন ভূমিকা প্রমাণ হয় কি? প্রত্যক্ষ ভূমিকা না থাকলেও পরোক্ষ ভূমিকা অবশ্য সন্ন্যাসীদের ছিল। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ জনিত অশান্তি এবং সেই অশান্তি দমনে বাংলার বৈধ শাসনকর্তা নবাবের ব্যর্থতা কিংবা অনীহা, বিদেশী বণিক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার শাসনকার্য স্বহস্তে গ্রহণে প্রবুদ্ধ করে। তাকেই 'কার্যসিদ্ধি' বলা হয়েছে।

এই কার্যসিদ্ধিতে সন্তানদলের নেতা দেশপ্রেমিক সত্যানন্দ খুশি হন নি। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেছেন—"হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে"

সত্যানন্দের গুরু চিকিৎসক তার জবাবে মনঃক্ষুণ্ন সত্যানন্দকে উপদেশ ছলে বলেছেন—"ইংরাজ রাজা না হইলে সন্তানধর্মের-পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নেই। * * ইংরেজ ভূমিবিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরাজকে রাজা করিব।** যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজা অক্ষয় থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে-নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে। অতএব হে বুদ্ধিমান—ইংরেজের সহিত যুদ্ধে নিরস্ত হইয়া আমার অনুসরণ কর।"

মহাপুরুষের উপদেশ আঠার শতকের হিন্দু-মানসিকতার প্রতিফলন। তখন জিজিয়াকর, তীর্থকর, মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভাঙ্গা, জোর করে ধর্মান্তরকরণ, সুন্দরী হিন্দুনারীর অসহায় অবস্থা এবং অন্যান্য অত্যাচারের দুঃখস্মৃতি হিন্দুমনে সজাগ। মুসলমানের প্রতি বিদ্বেষের ইহাই ছিল কারণ। ভবানন্দের কথায় তার স্পষ্ট প্রকাশ দেখা যায়—"সকলদেশে রাজার সঙ্গে রক্ষাবেক্ষণের সম্বন্ধ, আমাদের মুসলমান রক্ষা করে কৈ? ধর্ম গেল, জাতি গেল, মান গেল, এখন প্রাণ পর্যন্ত যায়। এ নেশাখোর দেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুদের হিন্দুয়ানী থাকে?"

জীবন যন্ত্রণা

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

কলিকাতা ও তৎসংলগ্ন সহরগুলিতে জ্যাম বা যানজট যে কি ভীষণভাবে জনজীবনকে পঙ্গু করে তুলছে তার বিবরণ ও অভিজ্ঞতার কথা বামফ্রন্ট সরকার, পুলিস বিভাগ ও মন্ত্রীদের সঠিক ভাবে জানা থাকা সত্বেও কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা এ পর্য্যন্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি যে কেন সেটাই সকলকে বিস্মিত ও ক্রোধান্বিত করেছে। যানবাহন ব্যতিরেকে দৈনন্দিন জীবনে মানুষ তার নিত্যকর্ম্ম তা সে চাকুরী বা ব্যবসা বা অন্য যে কোনও পেশা হোক না কেন, তাকে বজায় রাখতে অপারগ হয়। শহর ও শহরতলিতে যে সব কল-কারখানা, অফিস-কাছারি, দোকানদারি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অন্যান্য রুজিরোজগারের ব্যবস্থাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান আছে তথায় হাজিরা দেবার জন্য শ্রমিক, কর্মচারী, দোকানদার, উকিল-মোক্তার, মামলাকারী, খরিদ্দার, করদিক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষকে যাতায়াত করতে হয় নির্দ্দিষ্ট সময়ে যান বাহনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেই, অথচ প্রতিদিনই যান-জটের কারণেই সঠিক সময়ে হাজিরা দেওয়া কারো পক্ষেই বাস্তবে সম্ভব হয় না। যানজট হয়তো পূর্ব্বেও ছিল, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকারের প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও নীতিহীন কর্মাধরার ফলেই যানজট উত্তরোত্তর দীর্ঘস্থায়ী হচ্ছে ও প্রায় সব এলাকায় তা ছড়িয়ে পড়ছে। শহরবাসী বা পল্লীবাসী যারা প্রত্যহ খেটে খাবার তাগিদে যানবাহন ব্যবহারে বাধ্য হয়, তারা সবাই প্রাত্যহিক যানজটের ফলে সামরিক, আর্থিক ও মানসিক ক্ষেত্রে বিশেষ ক্ষতি-গ্রস্ত হতে বাধ্য হয়। ছ বছরের রাজত্ব কালে বামফ্রন্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে, কোন কিছু অব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত কোরে সাধারণ মানুষের কল্যাণ করা এই সরকারের হয় অনিচ্ছা আর না হয় যোগ্যতাহীনতা। লোকে অযোগ্য এই সরকার-কেই মূলতঃ দায়ী কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে যানবাহনের ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নিজেদের পায়ের ভরসা রেখে বিরক্তি ভরা মুখে পথ চলতে বাধ্য হয় উক্ত অবস্থায় ও অব্যবস্থার চাপে পড়ে।

যানজটের সুদীর্ঘ স্থায়ীত্ব প্রায় অধিকাংশ দিনেই দেখা যায় পুলিসী তৎপরতার অভাবে অথবা লরী চালকদের বে-আইনী ওভার টেকিংয়ের দৌলতে বা বিপদজনক।

মিনিবাস ও লরীগুলি নিয়ন্ত্রিত গতিবেগের অধিক গতিতে প্রায় সর্বত্রই চালু দেখা যায়, অথচ যাদের ওপর ঐটি রক্ষা রাখার দায়িত্ব তারা নিশ্চিন্ত মনে উদাসীন থাকে কিঞ্চিৎ রজত মুদ্রার বিনিময়ে। ফলে প্রায়ই পথে পথে পদযাত্রীরা আহত বা নিহত হয় পথ দুর্ঘটনায়। পথ দুর্ঘটনার সংবাদ প্রায় নিত্য নৈমিত্তিক, তবুও সরকার সজাগ ও সতর্ক নয় এ বিষয়ে যে কেন, তা বোধগম্য নয়। লরীগুলির ও মিনিবাসের দ্রুতগতি নগর জীবনে দারুণ আতঙ্ক সৃষ্টি কোরে চলেছে, কিন্তু সরকার নীরব দর্শক। সরকারেরই অধিকার আছে ঐ

বে-পরোয়া গাড়ী-চালকদের আইনের সাহায্যে সংযত করা, যাতে জীবনহানি কম ঘটে।

বাস্তবে দেখা যায় যে এই সরকার দলীয় প্রচার ও অসভ্য ভাষণে যতপটু, আইনানুগ নিয়ন্ত্রিত কর্ম-সম্পাদনে ঠিক ততই অপারগ। ফলে ট্রাম-বাস যাত্রীরা ভাড়া চুকিয়ে দিয়েও গন্তব্য স্থলে যথা সময়ে পৌঁছাতে পারে না এবং মাঝ পথে যানজটের মহিমায় তারা পথে নামতে বাধ্য হয় ও পদব্রজে বাকী পথ অতিক্রমে বাধ্য হয় প্রায় দিনই। বামফ্রন্ট সরকার উক্ত মারাত্মক যানজটের কথা জানা সত্ত্বেও কোন প্রতিকারের চেষ্টায় আগ্রহী নয় বলে জনগণ মনে করে।

এছাড়াও আরো বহু দুর্ভোগ ভুগতে হয় নিত্যকার যাত্রীদের যারা ঐভাবে পথে নামতে বাধ্য হয় সন্ধ্যার পরে, কারণ প্রত্যহই সন্ধ্যার কিছুপরেই রাস্তার বিজলীবাতি নিভে যায় বিনা নোটিশে লোড্-শেডিং এর অনিবার্য্য পরিণতিতে। তখন কি ভয়ঙ্কর অবস্থা ঘটে পথে ঘাটে? হয় রাস্তার খানা খোঁদলে আছাড় আর না হয় ছিনতাইকারীর শিকারে পরিণত হয়ে সর্ব্বস্বান্ত হওয়া। কি নিদারুণ বিপর্য্যয়ের মধ্যে মানুষ নিত্য কষ্ট পেতে বাধ্য হয় সরকারী গাফিলতির ফলে—তা ভুক্তভোগীমাত্রেই ভালরূপ জানেন। কাজেই ঐ সব ভুক্তভোগীর দল যদি বামফ্রন্টের পতন কামনা করে তবে তা কি অস্বাভাবিক কিছু? তা নিশ্চয় নয়। জনজীবনের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকার যেরূপ উদাসীন ও প্রকৃত প্রস্তাবে সম্পূর্ণ ব্যর্থ তাতে এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নিশ্চয় আর নেই। তবুও বড় বড় গালভরা কথায় সরকার প্রতিনিয়ত জনগণকে প্রতারিত করে চলেছে যে কেন, তা মন্ত্রীরাই জানেন। এ সরকার শুধু যানজট নয়, খুন-ডাকাতি রাহাজানি, নারীহরণ ও ধর্ষণ, ব্যাঙ্ক ডাকাতি, লোড্‌শেডিং, পরস্ব অপহরণ প্রভৃতি জঘন্য কাজগুলি নিবারণে অকৃতকার্য্য হয়েছে, তবুও পদীত্যাগের কথা এখনো চিন্তা করেনি কেন—সেটাই পরম বিস্ময়। জনগণ যে দারুণ দুর্বিপাকে পতিত এদের আমলে তাকি মন্ত্রীরা জানেন না—নাকি জেনে শুনে কেবলমাত্র নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতেই তাঁরা সদাব্যস্ত?

শহরের মানুষ ও শহর-মুখীন গ্রাম্য মানুষ যানজটের কৃপায় আতিষ্ঠ, আর গ্রামীণ মানুষ সি, পি, এম ক্যাডারের দৌরাত্মে ঘরছাড়া হবার উপক্রম।

গ্রামে সুখে স্বস্তিতে বসবাস করারই পায় নেই, কারণ তথায় রামা শ্যামা যদু মধুর দল লাল ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে অধিকাংশ সাধারণ মানুষকে প্রায়ই তাড়না করে চলেছে, হয় চাঁদা আদায়ের অছিলায় আর না হয় জমি দখলের পরিকল্পনায়। মাঝে মাঝে ঘর জ্বালানো, মারধোর, বলপ্রয়োগে ফসল কাটা, জমি বে-দখল, গণ-ধোলাই, গণ-আক্রমণ, গণ-আদালতের মাধ্যমে জরিমানা আদায় বা শাস্তি বিধান ইত্যাদি মারাত্মক হীন কাজ বর্তমানে প্রায় অধিকাংশ গ্রামেই সংঘটিত হচ্ছে সি, পি, এম দলের দৌরাত্মে; যার কোন প্রতিবিধান বা প্রতিকার নেই এ সরকারের আমলে, যেহেতু সরকার ঐ সব কাজের পরোক্ষ পৃষ্ঠ পোষক বলে গ্রামীণ দলপতিরা জারী করছে। গ্রামের নিরীহ মানুষ প্রাণ ভয়ে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করতে পারছে না কারণ পুলিশও নীরব দর্শক

এই সরকার যেচ্ছায় জন জীবনে বিপর্যয় সৃষ্টি কোরে চলেছে বিভিন্ন কায়দায়। প্রতিটি এলাকার মানুষ সি, পি, এম দলের কর্মী ও সমর্থকদের অহেতুক অত্যাচারে জর্জ্জরিত। হুঙ্কারদের দাপটে ফুটপাথে চলা দুঃসাধ্য, অথচ রোজ কাগজে সরকারী

বিবৃতির মাধ্যমে জনগণ জানতে পারেন যে এবারে হত্যার মুক্ত করা হবে। ঐ পর্য্যন্তই, এরপর আসল কাজের কিছুই হয় না, কারণ বামফ্রন্টের শরিকদলের কোন না কোন দল হত্যারদের পৃষ্ঠপোষকতায় হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ফলে হত্যার উচ্ছেদ বন্ধ হয়ে যায়। মানুষের পাশে চলার পথও বন্ধ হয়ে যায় সরকারী অবিমৃষ্যকারীতায়। বামফ্রন্ট তার শরিকদের সন্তুষ্ট রাখতে গিয়ে জন সাধারণের ক্ষতি করে, অথচ প্রধান দল সি, পি, এম কি গ্রামে কি শহরে সর্বত্রই শরিকদলগুলির ওপর প্রচণ্ড মারধোর, দাঙ্গা বাধিয়ে চলেছে সেই শুরু থেকেই। সে ব্যাপারে শরিকদের তারা মোটেই সমীহ করে না। সি, পি, এম এরাজ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ নেবার মানসে ক্ষমতা দখল করেছে, তারা জনগণের দরিদ্রতম অংশের কোন কল্যাণ করার কথা ভাবেও না বা করেও না। মুখে তারা সর্বহারাদের দরদে দেখায় মিষ্টি মিষ্টি বুলি আওড়ে, কিন্তু কাজে তারা এরাজ্যের দরিদ্রতম শ্রেণীর মানুষকে আরো দরিদ্র কোরে দিয়ে দল বাড়াতে ব্যস্ত দেখা যায়। কি বিচিত্র নীতিতে ওরা বিশ্বাসী,—যা মানুষের জীবন যাত্রাকে বিপদগ্রস্থ করে পদে পদে আর জীবন যন্ত্রণার বিপাকে পড়ে এরাজ্যের জনগণ অতিষ্ট হয়ে ওঠে সব বিষয়েই। মানুষের রুজি রোজগারের পথ সংকুচিত হচ্ছে-এসরকারের আমলে সব চেয়ে বেশী, কারণ ঘন ঘন সর্বত্র অরাজকতা সৃষ্টিতে সরকার দক্ষ প্রশাসক। বিদ্যুৎ শক্তির বৃদ্ধি করা দূরে থাকুক, যেটুকু বা আছে তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করারও সরকারের কোন সদিচ্ছা বা যোগ্যতা নেই। রাস্তা ঘাটে চলা ফেরা করার উপায় নেই রাহাজানি ও মস্তানদের বোমাবাজীর দৌরাত্ম্যে। দেশে পুলিস বলে কোন সংস্থা আছে আজ আর এরাজ্যবাসী বিশ্বাস করে না, কারণ পুলিসকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে এই সরকার একদিকে, আর অপরদিকে সি, পি, এম দলের ক্যাডারদের উৎসাহ দিয়ে পুলিস কর্মী ও অফিসারদের মারধোর এমনকি হত্যা করতেও কসুর করেনি দল স্বার্থে। কি চমৎকার শাসন ব্যবস্থা আজ পশ্চিম বঙ্গে চলছে !

গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, দিবাকর ব্যানার্জি প্রভৃতি অফিসার ও বহু পুলিসের কনস্টেবল বিগত কয়েক মাসের মধ্যে নিহত হয়েছেন সি, পি, এম দলের মস্তানদের আক্রমণে। আজো পরিচিত আসামীরা হয় ধরা পড়ে নি আর না হয় তো জামিনে মুক্ত হয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টিতে সদা ব্যস্ত। সরকার এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা মজবুত রাখতে মোটেই ইচ্ছুক নয়, তা যদি হতো তবে এভাবে পুলিসের ইনসপেকটারসাব-ইনসপেকটার প্রভৃতি অফিসাররা সি. পি, এম গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ দিতে বাধ্য হতো না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই দৃশ্য নজির ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নি।

এরাজ্যে কোন সরকার তার নগর কোটাল-দের এভাবে হত্যার সঙ্গে কোন দিনই জড়িত ছিল না সুদূর অতীত থেকে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত। বামফ্রন্ট রাজত্বে কত অভিনব পদ্ধতিতে খুন খারাপি সংঘটিত হয় তার কারণ একটাই এবং সেটা হচ্ছে যে, মন্ত্রীসভার নীতি বিপথগামী হচ্ছে সি, পি, এম মন্ত্রীদের দাপটে। সি, পি, এম দল সরকারী ক্ষমতাকে নিজ দল বৃদ্ধির কাজে মুখ্যতঃ লাগিয়েছে এবং দল বৃদ্ধির পথে যে বাধা দিতে অগ্রসর হবে এমন কি পুলিস পর্য্যন্ত তাকেই ওরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবে গায়ের জোরে। মানুষকে ভালবেসে বা মানুষের সেবা করে নয় ওরা জন সাধারণকে ভীত সন্ত্রস্থ করতে চায় যাতে তারা সি.

পি, এম দলের বিরুদ্ধে কোন মতেই সংঘবদ্ধ হতে না পারে। ওরা যানে এ রাজ্যে মগের মুলুক তৈরী করলেই গরীব চাষী-মজুররা সভয়ে ওদের সঙ্গে ওঠা বসা করবে বাঁচার তাগিদে। তখন ঐ সব চাষী মজুরের মগজ ধোলাই কোরে ওদের দিয়েই সমাজের শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষদের যত্রতত্র অপমান করিয়ে বা মারধোর করিয়ে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করবে গ্রাম গঞ্জে। পরে ঐ একই কায়দায় শহরে শ্রমিক কর্মচারীদের দিয়ে শহরের বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ের মানুষদের ভীত-সন্ত্রস্ত কোরে তুলে তাদের স্তব্ধ করে দেবে। কিন্তু ওদের ঐ চালাকি বুদ্ধিজীবিরা জেনে গেছে এবং তারা ওদের ভয়ে ভীত নয় কোনদিন। তবে পুলিসের দারোগা, ইন্সপেক্টার হত্যা কাণ্ডের ফলে শহরবাসী বুদ্ধিজীবি মানুষেরা সংঘবদ্ধ হয়ে ওদের ঘৃণ্য অত্যাচারের হাত থেকে এ রাজ্যবাসী সকলকে বাঁচাবার জন্যই সি, পি, এম বিরোধী বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে মদত দিতে এগিয়ে আসছে বেশ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। বহু নিরপেক্ষ গণসংস্থাও গড়ে উঠেছে দিকে দিকে সি, পি, এম দলের হত্যার রাজনীতি চিরতরে বন্ধ করার সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে। শিক্ষিত মানুষই ওদের শয়তানী ধরে ফেলেছে সর্ব্বাগ্রে এবং তারাই সি, পি, এম দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভিপ্রায়ে বিভিন্ন সভা-সমিতির মাধ্যমে এ রাজ্যের ক্রেদাক্ত জীবন যন্ত্রণায় ভীত-সন্ত্রস্ত সাধারণ মানুষকে জাগাতে শুরু করেছেন। তাঁদের ঐ নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় পশ্চিম বঙ্গের মানুষের চেতনা ফিরে আসবে ও সি, পি, এম দলের মুখোস খুলে গিয়ে তার নগ্ন বীভৎস স্বরূপ প্রকাশ পাবে। ফলে এ রাজ্যে সি, পি, এম তথা বামফ্রন্ট ক্ষমতা চ্যুত হবে।

অনুশীলন সমিতি

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

সর্বভারত-সশস্ত্র অভ্যুত্থান : ৬৮তম স্মরণ-দিবস

প্রিয় সতীর্থ,

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৮৩ ইং, সোমবার মধ্যাহ্ন ১২ টা হইতে কলিকাতা মহাজাতি সদনে মহানায়ক রাসবিহারী বসু পরিকল্পিত "সশস্ত্র অভ্যুত্থান দিবস" উদ্‌যাপিত হইবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্তমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন করিবেন। ডাঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং ডঃ নিমাই সাধন বসু যথাক্রমে সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন। ডঃ অমলেন্দু দে "রাসবিহারী বসু" স্মারক বক্তৃতা মালার সমাপ্তি ভাষণ দিবেন। শ্রীসত্যেশ্বর মুখোপাধ্যায় উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন।

এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি ও আন্তরিক সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

অনুশীলন সমিতির পক্ষে

আহ্বায়ক

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত শচীন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতা

সম্পাদক

দীনেশ চন্দ্র ঘটক

: অনুষ্ঠান সূচী :

প্রথম অধিবেশন ১২ টা—১·৩০ মি: উদ্বোধন সঙ্গীত, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি অন্যান্য বিশিষ্ট বক্তা এবং সভাপতির ভাষণ।

১·৩০ টা হইতে ৩ টা আহার বিশ্রাম।

দ্বিতীয় অধিবেশন ৩টা—৫-৩০ মি: সভাপতি : শ্রীতারাপদ লাহিড়ী, অধ্যাপক অমলেন্দু দে কর্তৃক "রাস-বিহারী স্মারক" বক্তৃতামালার সমাপ্তি ভাষণ।

সন্ধ্যা ৫-৩০ মি:—৬টা : বাংলাদেশে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন। ৬টা হইতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সঙ্গীত, নাটক ইত্যাদি।

অনুশীলন ভবন

৩২/৮, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০

চতুর্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস

প্রিয় সতীর্থ,

আগামী ২১শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩ (সোমবার) সকাল ৯ ঘটিকায় কুদঘাটস্থিত অনুশীলন ভবনের চতু-র্বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠিত হইবে।

এই অনুষ্ঠানে আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতি প্রার্থনা করি।

নিবেদক,

অনুশীলন ভবন অস্থি পরিষদের পক্ষে—

সরল কুমার সেনগুপ্ত

শচীন্দ্র নাথ গুহঠাকুরতা

: অনুষ্ঠান সূচী :

২১শে ফেব্রুয়ারী, সোমবার, ১৯৮৩

স্থান : 'অনুশীলন ভবন', কুদঘাট

সময় : সকাল ৯ ঘটিকা—১০-৩০ মি: পর্যন্ত

জাতীয় পতাকা উত্তোলন ; শহীদ বেদীতে মাল্যদান ; ভবন প্রতিষ্ঠাতাদের ও পূর্বসূরীদের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান এবং প্রয়াত সতীর্থদের প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন ; ভাষণ ; সঙ্গীত।

: প্রতিকৃতির আবরণ উন্মোচন :

১। দীনেশ চন্দ্র বিশ্বাস
২। হেমন্ত কুমার নাগ
৩। দুর্গেশ ভট্টাচার্য
৪। সুরেশ ভরদ্বাজ
৫। স্বদেশ ধর

বি: দ্র:—উপরোক্ত অনুষ্ঠানের পর মধ্যাহ্ন ১২ ঘটিকা হইতে কলিকাতা মহাজাতি সদনে "অভ্যুত্থান দিবস" উদ্‌যাপিত হইবে।

জননায়ক শহীদ

হেমন্ত বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি

মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে ১৯৭১ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী আমাদের একান্ত প্রিয় নেতা হেমন্ত কুমার বসু আততায়ীর হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হন।

নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর সুযোগ্য সহকর্মীরূপে দেশমাতৃকার শৃঙ্খল উন্মোচন করে সর্বজন শ্রদ্ধেয় জননায়ক হেমন্ত কুমার বসুর অক্লান্ত সংগ্রাম, দুঃখবরণ ও আত্মত্যাগের কাহিনী জাতীয় ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন একজন দেশ বরেণ্য নেতাকে ঘাতকের হাতে মৃত্যু বরণ করতে হ'ল, ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

আমাদের প্রিয় নেতা হেমন্তদাকে স্মরণে রাখার উদ্দেশ্যে আমরা ১৯৭১ সাল থেকে প্রতি ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখটি শহীদ দিবসরূপে উদ্বোধন করি। সেই উদ্দেশ্যে এবারেও ১৯৮৩র ২০ ফেব্রুয়ারীতে দ্বাদশ বর্ষ মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে সারাদিবসব্যাপী এক ভাবগম্ভীর পরিবেশে নিম্নলিখিত অনুষ্ঠান সূচীর মাধ্যমে শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে হেমন্ত বসুর আবক্ষমূর্ত্তির পাদদেশে শহীদ হেমন্ত কুমার বসুকে স্মরণ করব।

স্মরণ সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আপনার সবান্ধব উপস্থিতি কামনা করি।

প্রীতি ও শুভেচ্ছান্তে

অভয় দে

সাধারণ সম্পাদক

জননায়ক শহীদ হেমন্ত বসু স্মৃতিরক্ষা কমিটি

॥ কর্মসূচী ॥

কেওড়াতলার মহাশ্মশানে

সকাল ৭-৩৩ মি,—স্মৃতিবেদীতে পুষ্পমাল্য অর্পণ।

শ্যামপুকুর ষ্ট্রীটে

বেলা ৯টায়—গীতা, কোরান, বাইবেল ও গ্রন্থসাহেব ত্রিপিটক জেন্ড

প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি পাঠ।

বেলা-১০.৫৮ হইতে বেলা ১১টায়—২ মিনিট নীরবতা পালন এবং আবক্ষ মূর্ত্তিতে মাল্যদান।

১১-১০ মিঃ—শ্রাদ্ধানুষ্ঠান।

১১-৩০ মিঃ—সারাদিন ব্যাপী কীর্ত্তন।

ঃ নতুন অঙ্গীকার ঃ

আজ থেকে তেত্রিশ বছর আগে, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে ভারতের জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছিলাম এবং দেশের সমস্ত নাগরিকের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার ; চিন্তার ও মত প্রকাশ, ধর্মবিশ্বাস ও উপাসনার স্বাধীনতা এবং সমতা, সৌভ্রাত্র ও সংহতি সুনিশ্চিত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। কিন্তু এই সবের কোন কোন লক্ষ্যে আজও আমরা পৌঁছতে পারিনি।

স্বৈরতন্ত্র, বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার মতো অশুভ শক্তিসমূহ এবং অন্যান্য নানা প্রতিবন্ধকতা বারবার আমাদের অগ্রগতি ব্যাহত করেছে। ফলে ব্যবধান রয়ে গেছে প্রতিশ্রুতি আর রূপায়ণের মধ্যে।

আজ নতুন উষার আলোকে জাগ্রত হবার সময় এসেছে। সময় এসেছে আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য, আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়িত করার জন্য নতুন ভাবে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হবার।

এক নতুন ভারত গড়ে তোলার কাজে, আমাদের দেশের সকল মানুষের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করতে আত্মনিয়োগের শপথ নিতে হবে পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে। আসুন, আবার আমরা আমাদের দেশের মানুষের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সংহতি রক্ষায় এবং শোষণ, বিচ্ছিন্নতাবাদ ও কায়েমী স্বার্থান্বেষী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াই।

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য জনগণের সংগ্রামে সামিল হতে বামফ্রন্ট সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

২৬ জানুয়ারি ১৯৮৩

॥ পশ্চিমবঙ্গ সরকার ॥

আই সি এ ১১৩০/৮৩

Regd. No.R. N. 24511 71 Postal Regd. WB / NC 77 / phone : 34-1795 মূল্য: ৩৫ প:

15 FEB 1980

।। সম্পাদক ।।

শ্রীশান্তিশরণ রায়চৌধুরী

সম্পাদক মণ্ডলী

শ্রীজগদীশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি)

শ্রীকালীপদ সরকার

শ্রীপুষ্প চ্যাটার্জী

শ্রীকামাখ্যা রায়

শ্রীমলয় ঘোষ

প্রকাশক ও মুদ্রক

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত

বিদেশে বিশেষ প্রতিনিধি—

শ্রীবারীন ঘোষ

বেরালা—

শ্রীনন্দগোপাল পাল

বিপ্লবী বাংলা

পড়ুন

ও

পড়ান

বিপ্লবী পুস্তকমালা

মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথের সেই অবিস্মরণীয় গ্রন্থ ... বঙ্গের ও পাক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ...

নেতাজীর সিক্রেটসার্ভিস—ডাঃ পবিত্র ... ৩০·০০

বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী—সু ...

অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস—প্রজেন্দ্র দাস

—ক্ষীরোদ কুমার দত্তের—

১। বাংলার অগ্নিযুগ—১·৫০, ২। অহিংসায়তে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা—৮·০০ ৩। অনুশীলন সমিতির পি, মিত্তির—২·০০, ৪। পৌহাটী সংগ্রাম কাহিনী—১·০০, ৫। কাকোরী ষড়যন্ত্র—১·২৫, ৬। কলতা বাজার সংগ্রাম কাহিনী—·৪০, ৭। রাসবিহারী ও অনুশীলন সমিতি—১·৫ ৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে মা ও মেয়ে—·৪০, ৯। বিবেকানন্দ ও সমাজবাদ—·৬৫ ১০। বিপ্লবী বিবেকানন্দ—·৫০, ১১। মহারাজ ও সুভাষচন্দ্র—·৫০ ১২। শিবাজীর ধর্মজাগরণ ও ভগিনী নিবেদিতা—·৭৫, ১৩। দেশ বাসের ডোকেমেন্ট (১)—১·০০, ১৪। দেশ বাসের ডোকেমেন্ট (২)—২·০০ ১৫। শহীদ চন্দ্রশেখর আজাদ—·৫০, ১৬। ১৯৩ এপ্রিল জাতীয় শহীদ দিবস—১·০০, ১৭। হাজিজ হত্যা প্রচেষ্টা—·৭৫, ১৮। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীল সমিতি—৪·০০, ১৯। ভারতের জাতীয় পতাকার ইতিহাস—·৪০, ২০। লাট হত্যা প্রচেষ্টা—১·৫০

প্রাপ্তিস্থান :— ৪৯ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০০৭

নৈহাটী—১/১/১/A বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট কলিকাতা-৩৬

শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক ৪,বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলি-৭ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট কলি -৯ হইতে মুদ্রিত

বিপ্লবী বাংলা

। বিপ্লবী পরিষদের সাপ্তাহিক মুখপত্র ।

স্থাপিত—১৯৫৬, 'বিপ্লবী বাঙ্গালী' নবকলেবর—১৯৭১

দ্বাদশ বর্ষ	শনিবার ৪ঠা চৈত্র ১৩৮৯ ১৯শে মার্চ ১৯৮৩	২৫সংখ্যা

সম্পাদকীয়

দিল্লীতে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন

দিল্লীতে যে নির্জোট সম্মেলন হয়ে গেল, তার বিরাট সাফল্য সম্বন্ধে সমবেত রাষ্ট্রপ্রধানেরা, তথা সমগ্র দুনিয়া প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। মাননীয় অতিথিদের আদর অপ্যায়ন, সর্বজনগ্রাহ্য প্রস্তাবাদি গ্রহণ দেশবিদেশে খবর প্রদানের নিখুঁত ব্যবস্থা, বিভিন্নদেশের রুচিসম্মত আহার্য্য পরিবেশন, প্রভৃতি প্রত্যেকটি ব্যাপারে যেসব ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে, সে জন্য প্রত্যেকেই ভারতবর্ষ ও এদেশের প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এত অল্পসময়ের মধ্যে এমন সাফল্য অর্জন করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ছিল। আমাদের বিশেষ আনন্দ ও গর্বের কথা যে পৃথিবীর দুইতৃতীয়াংশে দেশ ও অন্যান্য স্থানেও আমাদের জাতীয় মর্যাদা বহুলপরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। এশিয়াডের পর এত অল্প সময়ের মধ্যে এমন একটি বিরাট অনুষ্ঠানকে যাঁরা সাফল্যমণ্ডিত করেছেন ত্রুটিশূন্য ভাবে, তাদের উদ্দেশ্যে নিশ্চয়ই সমগ্র জাতি সাধুবাদ জানাবে অকুণ্ঠচিত্তে। এই দেশের বিরোধী দলগুলি প্রশাসক দলের কোন কৃতিত্বের জন্য সম্মান দেয় না। অন্যদলগুলি কি ভেবেছেন সে সম্বন্ধে তাদের মতামত খোলাখুলিভাবে এখনও প্রকাশিত হয়নি তারা হয়ত ভাবছেন যে শ্রীমতী গান্ধী যেভাবে অসাধ্য সাধন করেছেন, সে কথা স্বীকার করলে ভবিষ্যতে তাদের নির্বাচনের ফলাফল, তাদের বিরুদ্ধে যেতে পারে। যেখানে জাতীর গৌরব বৃদ্ধিপায়, যেজন্য অভাদর্শ নির্বিশেষে সব রাষ্ট্র প্রধানেরা অকুণ্ঠ চিত্তে প্রশংসামুখর হন, সেখানে নীরব থাকাটা তাদের ভাবমূর্তি আরো অনেক বেশী মলিন করবে এ সত্য কি তারা অনুভব করছেন না? শ্রীঅটলবিহারী বাজপেয়ীকে ধন্যবাদ দিতেই হয় তার মন্তব্যের জন্য। তিনি শ্রীমতী গান্ধীর বক্তৃতাটিকে অপূর্ব এবং গর্বের উপযুক্ত বলে বর্ণনা করতে দ্বিধা করেননি। এটাইত প্রকৃত বিরোধী দলের কর্তব্য। সরকারের দোষ ত্রুটির সমালোচনা তারা নিশ্চয়ই করবার অধিকারী অবশ্য গঠনমূলক সমালোচনা করে। কিন্তু ভাল কাজ করলেও, সরকারকে কেন তারা প্রশংসা করবেন না, এটাই দুর্বোধ্য।

একটা আলোচনা এ প্রসঙ্গে উঠেই পড়ে। দেশের খবরের কাগজের কর্তব্য কি এসম্বন্ধে? তারা নিশ্চয়ই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত করবেন, এটাই সর্বদেশে স্বীকৃতনীতি। দুঃখের সংগে বলতে হচ্ছে যে কোন একটি বিখ্যাত সংবাদপত্রের মহাজ্ঞানী একজন প্রতিবেদক এ সম্বন্ধে যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটা আদর্শ সাংবাদিকতা নয়, সেটা তার সঙ্কীর্ণ মনস্কতার পরিচায়ক মাত্র। তিনি বলেছেন যে রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তব্যে "শ্রীমতীগান্ধীর লাভ হতে পারে, ভারত দেশটা বা একজন ভারতীয়ের কি লাভ? এই প্রশংসা লাভের জন্য জাতীয় অর্থ ভাণ্ডার খুলে দেওয়া হবে কেন?" এই টাকা দেশের কুটিরশিল্পের কাজে ব্যয় করলে ভাল হত। এই ধরনের তার মস্তিষ্ক প্রসূত বহু উপদেশ বর্ষিত হয়েছে। অজ্ঞতা, নির্বুদ্ধিতা, ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কি নগ্নরূপ নিতে পারে এটা তারই পরিচায়ক মাত্র।

এই নির্জোট সম্মেলনে কি লাভ হয়েছে সেটা একটু সংক্ষেপে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সত্য সর্বজনবিদিত যে জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি সব ব্যাপারে ঐকামত পোষণ করে না। এমন কি তাদের বিপরীতমুখী দৃষ্টিভঙ্গিও আছে। এমন কি দুটি দেশ ত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত আছে। একমাত্র হস্তীমূর্খ ব্যতীত কেউ আশা করবে না যে দিল্লীতে কয়েকদিনের জন্য সমবেত হলেই সব মত পার্থক্য ও মনোমালিন্য দূরীভূত হয়ে যাবে। এমন যাদুদণ্ড কারো হাতে আছে, একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ব্যতীত অন্য কেউ একথা বলবে না। সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করবে যে এখানে কতটা মতৈক্য স্থাপন করা সম্ভব হয়েছে। একথা বলাই বাহুল্য এদিক দিয়ে সম্মেলন প্রভূত সাফল্য অর্জন করেছে, এটা সন্দেহাতীত।

শ্রীমতীগান্ধীর কৃতিত্ব বহুমুখী ও বিশাল। তাঁর সুচিন্তিত বক্তৃতাটি সারা বিশ্বে একটা ভাবনা চিন্তার নব দিগন্ত খুলে দিয়েছে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির প্রধান সমস্যা গুলিকে তিনি চিহ্নিত করেছেন এবং কিভাবে তার সমাধান সম্ভব, তার দিক নির্দেশও করেছেন, গভীর প্রজ্ঞা ও মানবীয় মূল্যবোধের দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে। শুধু জোট নিরপেক্ষ দেশগুলির সমস্যাগুলি তিনি তুলে ধরেন নি, সারা বিশ্বে আজ যে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং যার ফলশ্রুতি হিসাবে মানবজাতির ধ্বংস প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে, এবং যার সময়োচিত সমাধানের পথ তিনি নির্দেশ করেছেন পৃথিবীর সব দেশগুলিই তাকে স্বাগত জানাবে এ সত্য সন্দেহাতীত। দেশের কতটা ব্যয় হল, কতটা আয় হল, এই বণিক সুলভ বিচার বিবেচনার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ধ্বংসের আগুন যখন ধিকি ধিকি করে জ্বলছে সেই দাবানল যদি কিছুটা পরিমাণেও প্রশমিত করা যায়, তবে তার সঠিক মূল্যায়ন শুধু টাকার অঙ্কে হয় না, কারণ এটা প্রকৃতপক্ষে অমূল্য।

কি নির্দেশ এই সম্মেলন দিচ্ছে, সেটা বহুলাংশে শ্রীমতী গান্ধীর তুলনাহীন বক্তৃতার মধ্যেই বিবৃত আছে। শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, অর্থনৈতিক অগ্রগতি, সাম্য ও মৈত্রীর আদর্শ অনুসরণ, স্বাধীনতাকামী দেশগুলির স্বাধীনতার দাবী স্বীকার, অর্থনৈতিক বৈষম্যকে দূর করা প্রভৃতির মত আদর্শকে বাস্তবায়িত

করাই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মৌলিক উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন করতে বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ঐক্যমত্য প্রতিষ্ঠা করে কাজ করে যেতে হবে। সংঘর্ষ নয়, সমঝোতার নীতিই গ্রহণ করতে হবে। কাউকে বাদ দিয়ে নয়, সকলের সমবেত প্রচেষ্টায় এই দুরূহ কাজ সমাধা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর কথায় বলা যায় যে ধরা পৃষ্ঠে অবস্থান করতে হলে সহ-অবস্থানের গুরুত্ব মেনে নিতে হবে। বিশ্বশান্তি ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদন ও প্রয়োগ একসঙ্গে থাকতে পারে না। এমন নির্ভুল বিচার বিশ্লেষণ প্রধানমন্ত্রীর তথা ভারতের মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং বিশ্বের দুই তৃতীয়াংশ দেশের স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করেছে। যারা নির্জোট সম্মেলনকে বহুধা বিভক্ত করতে আগ্রহী ও সচেষ্ট ছিলেন, তাদের এই সম্মেলনের নেতৃবৃন্দ বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে ঐক্যের বন্ধন সুদৃঢ় করে তাদের হতাশ করে দিয়েছেন। এর থেকে বড় সাফল্য আর কি হতে পারে ?

শ্রীমতী গান্ধীর উপর গুরু দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয়েছে। বহু সমস্যা বিজড়িত ভারতবর্ষের দায়ভার তাঁকে বহন করতে হচ্ছে। এখন তাকে সম্মেলনের বহু নেতৃবৃন্দের মতে, বিশ্বের বৃহদাংশের নেত্রী হিসাবে কাজ করতে হবে। আর শ্রীআরাফত বলেছেন যে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের রথের গতি যেন অব্যাহত থাকে তাঁর নেতৃত্বে। শ্রীমতীগান্ধী আশ্বাস দিয়ে বলেছেন যে এই রথ কখনও তার নির্দ্ধারিত পথ থেকে বিচ্যুত হবে না। তিনি আরো বলেছেন যে কখনও এই সব দেশের নেত্রী হিসেবে কাজ করবেননা করবেন সকলের সঙ্গে ভাইবোনের মানসিকতা ও আদর্শ নিয়ে। বস্তুতপক্ষে, সব দেশের সঙ্গে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বিশ্বের সব সমস্যা সমাধানের যে নীতি জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনে গ্রহণ করা হয়েছে, সেটা নিঃসংশয়ে প্রশংসিত হবে।

শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন বিষধর কেউটে সাপ ফণা উদ্যত করে আছে। বিষ ক্ষরণের ভয়ে স্বাভাবিকভাবে সকলেই ভীত। এই সর্বনাশা পরিস্থিতির গতি যদি রোধ করতে পারেন, তবে বিশ্ববাসী দুহাত তুলে তাঁকে অভিনন্দিত করবে। কাজটা দুরূহ এবং সময়সাপেক্ষ সন্দেহ নাই। তবু এই সুস্থপরিস্থিতি স্থাপনের পথে যদি তাঁর নেতৃত্বে জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে পদক্ষেপ সুরু কিছুটা অগ্রগতির প্রতিশ্রুতি রেখে যেতে পারেন, তা হলে তাদের অবদান পৃথিবীর বিবর্তনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। শ্রীমতীগান্ধীর যাত্রাপথ শুভময় হোক্, এটাই সকলের আকাঙ্খা ও আশা।

— — —

আনন্দমঠ ঃ দেশাত্মবোধের উদ্বোধন

কালীপদ সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর পাঁচ)

"সত্যানন্দ বলিলেন, দেবতা অপ্রসন্ন নহেন, যুদ্ধে জয়-পরাজয় উভয় আছে। সেদিন আমরা জয়ী হইলাম, আজ পরাভূত হইয়াছি। শেষ জয়ই জয়। " • • আমরা যে পরাভূত হইলাম তাহার কারণ এই যে আমরা নিরস্ত্র। গোলন্দাজী-বন্দুক-কামানের কাছে লাঠি সোটা-বল্লমে কি হইবে! • • এক্ষণে আমাদের কর্তব্য, যাহাতে আমাদিগের ঐ অস্ত্রের অপ্রতুল না হয়।

জীবানন্দ। সে অতি কঠিন ব্যাপার।

সত্যানন্দ। কঠিন ব্যাপার জীবানন্দ? সন্তান হইয়া তুমি এমন কথা মুখে আনিলে? সন্তানের পক্ষে কঠিন কাজ আছে কি?

বিপ্লবীর জীবনে পরাভব নেই, সংকট তাকে বিচলিত করে না, সমস্যা সমাধানে প্রতিভা তাঁকে নতুন দিগন্ত খুলে দেয়। এই শিক্ষা সত্যানন্দের কথায় অভিব্যক্ত। সেই শিক্ষাই পরবর্তী কালের মুক্তি যোদ্ধাদের অন্তরে আশার আলো জাগিয়ে রেখেছে। তারপর—শুনুন দীক্ষা গ্রহণের বিধি বিধান।

ব্রহ্মচারী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি দীক্ষিত হইবে?"

সে বলিল, 'আমাকে দয়া করুন।'

তখন তাহাকে ও মহেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া সত্যানন্দ বলিলেন, 'তোমরা যথাবিধি স্নাত, সংযত, এবং অনশন আছ ত?

উত্তর। আছি।

সত্যানন্দ। তোমরা এই ভগবৎ সাক্ষাৎ প্রতিজ্ঞা কর, সন্তানধর্মের নিয়ম সকল পালন করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যানন্দ। যতদিন না মাতার উদ্ধার হয়, ততদিন গৃহধর্ম পরিত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যানন্দ। পিতা-মাতা ত্যাগ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যানন্দ। ভ্রাতা-ভগিনী?

উভয়ে। ত্যাগ করিব।

সত্যানন্দ। দারাসুত?

উভয়ে। ত্যাগ করিব।

সত্যানন্দ। আত্মীয়-স্বজন? দাস-দাসী?

উভয়ে। সকলই ত্যাগ করিলাম।

সত্যানন্দ। ধন-সম্পদ-ভোগ?

উভয়ে। সকলই পরিত্যাজ্য হইল।

সত্যানন্দ। ইন্দ্রিয় জয় করিবে? স্ত্রীলোকের সঙ্গে কখনো একাসনে বসিবে না?

উভয়ে। বসিব না ইন্দ্রিয় জয় করিব।

সত্যানন্দ। ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর, আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না; যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে?

উভয়ে। দিব।

সত্যানন্দ। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে?

উভয়ে। করিব।

সত্যানন্দ। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না?

উভয়ে। না।

সত্যানন্দ। যদি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়?

উভয়ে। অনন্ত চিতায় প্রবেশ করিয়া অথবা বিষ পান করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিব।

সত্যানন্দ। আর এক কথা—জাতি। তোমরা কি জাতি? মহেন্দ্র কায়স্থ জাতি। অপরটি কি জাতি?

অপর ব্যক্তি বলিল, 'আমি ব্রাহ্মণ কুমার।'

সত্যানন্দ। উত্তম। তোমরা জাতি ত্যাগ করিতে পারিবে? সকল সন্তান এক জাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই। তোমরা কি বল?

উভয়ে। আমরা সে বিচার করিব না। আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান।

সত্যানন্দ। তবে তোমাদিগকে দীক্ষিত করিব। তোমরা যে সকল প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা ভঙ্গ করিও না। মুরারী স্বয়ং ইহার সাক্ষী। যিনি রাবণ, কংস, হিরণ্যকশিপু, জরাসন্ধ, শিশুপাল প্রভৃতির বিনাশ-হেতু; যিনি সর্বান্তর্যামী, সর্বজয়ী সর্বশক্তিমান ও সর্বনিয়ন্তা; যিনি ইন্দ্রের বজ্রে ও মার্জারের নখে তুল্যরূপে বাস করেন তিনি প্রতিজ্ঞাভঙ্গ কারীকে বিনষ্ট করিয়া অনন্ত নরকে প্রেরণ করিবেন।

উভয়ে। তথাস্তু।

সত্যানন্দ। তোমরা গাও, 'বন্দেমাতরম'।

উভয়ে সেই নিভৃত মন্দির মধ্যে মাতৃস্তোত্র গীত করিল। ব্রহ্মচারী তখন তাহাদিগকে যথাবিধি দীক্ষিত করিলেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের মধ্যে দেশ সেবক, সমর্পিত প্রাণ, সন্তানদলের স্বরূপ প্রকটিত। অনুষ্ঠান হয়েছে ইষ্ট দেবতাকে সাক্ষী করে, শুদ্ধ সংযত ভাবে। লেখক দেশের কাজে ধর্মের প্রভাবকে অস্বীকার তো করেনই নি, তাকে অতি উচ্চ স্থান দিয়েছেন। এ ধর্ম কি? ইষ্ট দেবতা হলেন—সর্বনিয়ন্তা পরমেশ্বর এবং ধর্ম—লোক ধারক। ধর্মং যো বাধতে ধর্মো ন স ধর্মঃ কুবর্ত্ম তৎ। দেশভক্তিও ধর্ম। মুক্তি সাধকের মানস পটে জননী স্বরূপা দেশ পরমা শক্তি দুর্গা দশ প্রহরণ ধারিণী। দেশ কেবল মাত্র জড় প্রকৃতি ভূমি নয়, দেশ এক চৈতন্যময় সাকার বিগ্রহ। জননী স্বরূপা সেই বিগ্রহের সহিত সন্তানের অচ্ছেদ্য রক্তের সম্পর্ক। তিনি সন্তানের 'হৃদি ও মর্ম'। দেশভক্তির এমন জীবন্ত সংজ্ঞা আর কোথাও আছে কি?

আনন্দমঠের ভক্ত সন্তান ভবানন্দ তাই বলতে পেরেছেন—"আমরা অন্য মা মানি না, জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি জন্মভূমিই জননী: আমাদের মা নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই—আমাদের আছে কেবল সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা—।" এ কি পৌত্তলিকতা?

মূর্তির আর এক নাম বিগ্রহ। মন্ত্রভাবকে বিশেষভাবে গ্রহণের জন্য বিগ্রহের কল্পনা। অনেকটা জ্যামিতিক সূত্র প্রমাণের জন্য যেমন শূন্য ক্ষেত্রে একটি বিন্দুকে ধরে নেওয়া হয়, সেই রকম। প্রার্থনা-ভজনা কালে মনঃসংযোগের নিমিত্ত মূর্তি-পূজা বিরোধীদের মধ্যে কি প্রতীকের প্রচলন নেই? চার্চের মধ্যে প্রার্থনা স্থলে ক্রুশ ফলক সমন্বিত বেদী এবং মসজিদে মক্কা অভিমুখী প্রাচীর-গম্বুজ ও মক্কার দিকে মুখ রেখে নমাজ পাঠ কি প্রতীকের অর্থ বোঝায় না? নিরীশ্বরবাদী মার্কসবাদীদের লাল ঝাণ্ডা সেলামই বা কি বোঝায়? মূর্তি প্রতীক মাত্র।

ভাবোদ্বুদ্ধ নিরালম্ব অবস্থায় বেশিকাল শূন্যে থাকতে পারে না। তাকে ধরে রাখতে হলে চাই ভাষা ও ছন্দের বন্ধন, চিত্র ও ভাস্কর্যে রূপায়ন। মূর্তি ভাবেরই প্রতিচ্ছবি। গভীরতর উপলব্ধির সহায়ে। আনন্দমঠে বর্ণিত দুর্গারূপী দেশমাতৃকার মূর্তি তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কমিউনিস্টরা যে

দশফুট দীর্ঘ লেনিন এবং মার্কসের ছবি নিয়ে সভা-শোভাযাত্রা করেন, তা কি মূর্তি পূজা নয়?

আনন্দমঠের দেশপ্রেম

আনন্দমঠে যে দেশপ্রেমের আদর্শ আছে তা নাকি খুব হিন্দুয়ানি ঘেঁসা। যারা এই অভিযোগ তোলেন তারা অবশ্য এ দেশের কৃষ্টান অথবা মুসলমানী ঘেঁসা দেশপ্রেমের নমুনা দেন না। দেশ প্রেমের জাতি বিচার আছে কি? দেশ বলতে ভারতবর্ষ এবং জাতি বলতে ভারতীয় জাতি, যার অপর নাম হিন্দু। দেশের কিছু লোক ধর্মান্তর গ্রহণ করলে জাতির জাতীয়ত্ব লোপ পায় না, মূল প্রকৃতিরও রূপান্তর ঘটে না।

বিদেশাগত মুষ্টিমেয় তুর্ক, পারশীক ও মুঘল শাসক ভারতবর্ষকে নিজেদের বাসভূমি করলেই তাদের শাসন ভারতবাসীর স্ব-শাসন ছিল না। এই বিদেশী শাসককুল পাঁচ শত বছর বিজিত হিন্দুর সঙ্গে একত্রে বসবাস করলেও, কখনো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ত্যাগ করেন নি। সর্ব প্রযত্নে তাঁরা হিন্দু মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ একজাতি গঠনের প্রয়াসে বাধা দিয়ে এসেছেন। তাঁরা নিজেদের আন্তরিকভাবে ভারতীয় ভাবতে দ্বিধাগ্রস্থ থেকেছেন। 'পাঠান মোঘল এক দেহে হল লীন' কবি মনের ভাবনা মাত্র।

বাদশাহ আকবরের আমলে যে আদমসুমারী হয়েছিল তাতে ভারতবর্ষে জন সংখ্যা নির্ণীত হয়েছিল কুড়ি কোটি। এই কুড়ি কোটির মধ্যে বিদেশাগত এবং ধর্মান্তরিত মুসলমান সংখ্যার এক শতাংশের অধিক ছিল না। ইংরাজ শাসনের শুরুতেও অবস্থার বেশী হের ফের হয়েছিল বলে মনে হয় না। বাংলার অবস্থাও ছিল তাই। ডঃ উইস লিখেছেন, 'ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যখন প্রথমে বাংলার জনগণের সংস্পর্শে এলেন, তারা হিসাব করে দেখেছেন জন সংখ্যার এক শতাংশ মাত্র মুসলমান। তাদের হিসাব দৃঢ় ভিত্তিক না হলেও, প্রায় নির্ভুল ছিল। [J A S B 1894 Vol Lx II: Pt. III] বাংলার মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে ১৫০ বছরের ব্রিটিশ শাসন কালে। [মেজর সীতারাম জোহরী / হয়ার ইনডিয়া চায়না অ্যাণ্ড বার্মা মিট—থাকার স্পিঙ্ক লিঃ]

'আনন্দমঠ' রচিত কালে বাংলায় জাতি বলতে হিন্দু জাতিকে বুঝাত। সারা ভারতবর্ষেও তাই বুঝাত। সুলতান বাদশাহরাও নিজেদের হিন্দুস্থানের সম্রাট বলে পরিচয় দিতেন। ভারতের দ্বিজাতি তত্ত্ব তখন কল্পনারও অগোচর ছিল। বড়লাট লর্ড ডাফরিন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব প্রথম সরকারীভাবে ঘোষণা করেন যে, ভারতের হিন্দু মুসলমান দুটি স্বতন্ত্র জাতি। কংগ্রেসের এক জাতীয়তার আদর্শে ভাঙ্গন ধরানো ছিল যার লক্ষ্য। বড় লাটের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই আলিগড়ের উর্দুভাষী মুসলমান নেতা স্যার সৈয়দ আহম্মদ বলে উঠলেন—"দুটি পৃথক জাতি মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে একত্রে ক্ষমতার আসনে বসা এবং সমান ভাবে অধিকার ভোগ কি কখন সম্ভব? নিশ্চয়ই নয়।" [ভারতে জাতীয় আন্দোলন/প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়] পরবর্তী ইতিহাস সকলেরই জানা।

ভারত বিভাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টির পরেও অর্ধ শতাব্দী অতিবাহিত হতে চলল। এখনও যে সব শিক্ষিত নেতৃস্থানীয় মুসলমান ভারতবাসী বলেন, তাঁরা আগে মুসলমান পরে ভারতীয়, তাঁদের ভারত প্রেম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে হয়! কমিউনিস্টদের সম্পর্কেও এ কথা পুরোপুরি খাটে। কারণ তাঁদের মতে তাঁরা আগে কমিউনিস্ট

শেষাংশ ১১পৃঃ দেখুন

অনুশীলন সোপন বিপ্লবী দলে রূপান্তরিত হল

—অজেন্দ্রচন্দ্র দাস

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ কার্যে পরিণত হল। পূর্ববঙ্গের লাট হলেন স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার—এবং পশ্চিমবঙ্গের লাট হলেন স্যার এনড্রু ফ্রেজার।

১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশাল সম্মেলন পুলিশের লাঠির ঘায়ে পণ্ড হল। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নেতারা লাঞ্ছিত হলেন। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মেদিনীপুর জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অনুশীলনের পক্ষ থেকে 'সোনার বাংলা' এবং no compromiseপ্রচার পত্র বিলি করতে গিয়ে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হয়। সত্যেন বসুর সাক্ষীতে ক্ষুদিরাম মুক্তি পায়, কিন্তু সত্যেন বসুর চাকরী যায়। এই সকল ঘটনার ফলে বাংলা দেশের উভয় লাটই জনমানসে অবাঞ্ছিত ব্যাক্তি হয়ে দাঁড়াল। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ স্থির করলেন উভয় লাটকেই চরম দণ্ড দিতে হবে।

পূর্ববঙ্গের লাট ফুলারকে হত্যা করার জন্য দার্জিলিং হতে বিভিন্ন স্থানে অনুসরণ করলেন নবীন ঘোষের নেতৃত্বে অনুশীলন কর্মীরা কিন্তু পরিকল্পনা কার্যকরী হল না।

পশ্চিমবঙ্গের লাট এনড্রু ফ্রেজারকেও ১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর মেদিনীপুর জেলায় নারায়ণ গড়ে লাটের গাড়ি উড়িয়ে দিয়ে হত্যা করার চেষ্টা হল। বিস্ফোরণে গাড়ির কিছুটা ক্ষতি হল কিন্তু লাটসাহেব অক্ষত ছিলেন।

চন্দন নগরের মেয়র তার্দিভ্যাল পুলিশের সাহায্যে স্বদেশী সভা ভেঙ্গে দেওয়ায় তাকে ১৯০৮ সালের ১১ এপ্রিল বোমা নিক্ষেপ করে হত্যা করার চেষ্টা হয়।

মানিকতলায় ৩২নং মুরারীপুকুর রোডে অরবিন্দ বারীন্দ্রের পিতা কৃষ্ণধন ঘোষের বাগান বাড়িতে অনুশীলনের কর্মীদের অরবিন্দ বারীন্দ্রের নেতৃত্বে শিক্ষা দীক্ষা ও বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হল।

সন্ধ্যা, যুগান্তর, বন্দেমাতরম প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী সংবাদ পত্রগুলি দমনে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ড কুখ্যাত হয়েছিলেন। সবগুলি মামলার বিচারই তাঁর আদালতে হয় এবং আসামী সকলকেই দণ্ডিত করা হয়। বিশেষ করে বন্দেমাতরম মামলার বিচারের দিন, যে দিন বিপিন চন্দ্র পাল সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেন সে দিন আদালতে জনসমুদ্রের মধ্যে ১৫ বছরের বালক সুশীল সেন বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়ায় বেত্রাঘাতের দণ্ডাদেশ সমস্ত জনতাকে উত্তেজিত করেছিল। অনুশীলন নেতৃবৃন্দ শ্রীঅরবিন্দ সুবোধ মল্লিক প্রমুখ কিংসফোর্ডের মৃত্যুদণ্ড স্থির করলেন। এই আদেশ কার্য্যকরী করার জন্য পুস্তক বোমা পাঠান হয়েছিল, কিন্তু সেই পুস্তক কিংসফোর্ডের হাতেই পৌঁছল না। ইতিমধ্যে কিংসফোর্ড বদলি হয়ে মজঃফরপুর গেলেন। ১৯০৮ সালের মার্চ মাসের শেষে মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও বগুড়ার প্রফুল্ল চাকীকে কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য মজঃফরপুর পাঠান হয়। সর্বাধিক কাল গবে-

যাবার পর ৩০শে এপ্রিল রাত্রিতে কিংসফোর্ডের গাড়ি মনে করে বোমা নিক্ষেপ করেন, কিন্তু গাড়িতে কিংসফোর্ড ছিলেন না। গাড়ীতে আরোহী মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি নিহত হলেন। ১লা মে ওয়াইনি ষ্টেশনে ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এবং মোকামা ষ্টেশনে প্রফুল্ল চাকি গ্রেপ্তার হওয়ার সময় রিভলবারের গুলিতে আত্মাহুতি দেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

২রা মে মানিকতলা বাড়ী তল্লাসী করে বোমা তৈরীর জিনিষ সহ বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও অন্যান্যকে গ্রেপ্তার করে।

৪ঠা মে ম্যাজিষ্ট্রেট বার্লির নিকট ৪৯ জন আসামীকে হাজির করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের ফলে কোন প্রমাণ নেই বলে বার্লি সাহেব যতীন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ চার জনকে মুক্তি দেন। কিন্তু বারীন ঘোষের স্বীকারোক্তির ফলে ৮ই মে নরেন গোঁসাইর গ্রেপ্তারের পর মামলার মোড় পুলিশের অনুকূলে যায়। ২০শে জুন নরেন গোঁসাই সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অবলীলাক্রমে সত্যমিথ্যা নানা ঘটনা ও নেতাদের জড়িয়ে এক বিবৃতি দেয়। তার ভবিষ্যৎ বিবৃতি আরও মারত্মক হবে মনে করে তাকে হত্যা করা সিদ্ধান্ত হয়। প্রেসিডেন্সি জেল হাসপাতালে সত্যেন বসু ও কানাই লাল দত্তের রিভলবারের গুলিতে নরেন গোঁসাই নিহত হয়। সত্যেন বসু ও কানাই লাল দত্তের ফাঁসি হয়।

মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির বোমা নিক্ষেপের সূত্র ধরে মানিকতলা বাগান বাড়ীতে পুলিশ হানা দিয়ে বোমা তৈরীর মাল মশলা উদ্ধার করে অনেককে গ্রেপ্তার করে। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ ও নরেন গোঁসাইর স্বীকারোক্তি ভিত্তি করে পুলিশ মানিকতলা বোমা মামলা দায়ের করে। অনুশীলন সমিতির সভাপতি মিঃ পি. মিত্র ও মিঃ সি, আর, দাস (দেশবন্ধু) মামলা পরিচালনা করেন। শ্রীঅরবিন্দ মুক্তি পেয়ে চন্দন নগর হয়ে পণ্ডিচেরি চলে যান।

ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এ্যালেন অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপ দমন করার জন্য তৎপর হন। অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের সর্বাধিনায়ক পুলিন বিহারী দাসের পরিকল্পনা অনুযায়ী শিশির গুহ রায় শচীন বানার্জী ও সত্যেন বসু এই কাজে নিযুক্ত হলেন। শিশির রায় গোয়ালন্দ ষ্টেশনে এ্যালেনের গায়ে রিভলবার ঠেকিয়ে গুলি করে, সাহেব গাড়ীর মধ্যে পড়ে গেলেন। তিন বিপ্লবীই কার্য্য সমাধা করে গন্তব্য স্থানে ফিরে আসেন। ১৯০৬ সালের ২৩ ডিসেম্বর এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

১৯০৮ সালের ৭ই নভেম্বর অনুশীলনের কলিকাতা শাখার নেতা সতীশ বসুর সহকর্মী জিতেন রায় কলিকাতায় কলেজ ষ্ট্রীট্ ও হ্যারিসন রোডের সংযোগ স্থলে Y, M, C, A এর দোতালায় অবস্থিত ওয়ার টুন হলে এক সভায় পশ্চিম বঙ্গের লাট এন্ড্রু ফ্রেজারকে গুলি করে, গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়।

১৯০৮ সনের ১১ই নভেম্বর অনুযায়ীগ্রেপ্তার হলেন বরিশালের জননেতা অশ্বিনী কুমার দত্ত ও সতীশ চন্দ্র চাটার্জী ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিন বিহারী দাস ও ভূপেশ নাগ, নবশক্তির সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র, সুবোধ চন্দ্র মল্লিক, কার্লহিল সার্কুলার বিরোধী এ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটীর সংগঠক শচীন্দ্র প্রসাদ বসু, সন্ধ্যা পত্রিকার সম্পাদক শ্যাম সুন্দর চক্রবর্তী, মোট নয় জন।

১৯০৯ সনের জানুয়ারী মাসে অনুশীলন সমিতির পূর্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের সমস্ত শাখা, বাখর গঞ্জের স্বদেশ বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমাজকে বে-আইনী করা হয়।

মুরারী পুকুর বাগান বাড়ীতে বোমার সরঞ্জাম পাবার পর এবং বারীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে পরিচালিত কর্মীদের গ্রেপ্তার ও বারীন্দ্র ঘোষের স্বীকৃতিতে অনুশীলন সমিতির কলিকাতা শাখার সব কিছুই পুলিশের নিকট পরিষ্কার হয়ে পড়ে, দমননীতি চালিয়ে পুলিশ কর্মীদের নিষ্ক্রিয় করার চেষ্টা করে, ফলে কলিকাতা শাখা ভেঙ্গে যায়। যারা গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছে তারাও নিষ্ক্রিয় হয়। অনুশীলন সমিতির ঢাকা শাখা পুলিশের দমননীতির মোকাবিলা করে। দলের সংহতি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন জেলার গোয়েন্দা দপ্তরের মুখ্য অফিসারদের ও পার্টি নিয়ম শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। পুলিশ এই সমস্ত কার্যকলাপের হদিশ করতে না পেরে ১৯১০ সনের ৩রা আগষ্ট পুলিন দাস প্রমুখকে গ্রেপ্তার করে এক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু করে। ১৯১১ সনের ২৩ সেপ্টেম্বর এই ষড়যন্ত্র মামলা চলাকালীন অনুশীলন সমিতির সভাপতি মিঃ পি, মিত্র দেহ ত্যাগ করেন।

পুলিন বাবুর গ্রেপ্তারের পর এবং মিঃ পি মিত্রের পরলোক গমনের পর স্বল্পকালের জন্য মাখন সেন অনুশীলনের নেতা নির্বাচিত হন। মাখন বাবুর সঙ্গে কর্মীদের মত বিরোধ হওয়ায় মাখন সেনের স্থানে নেতা নির্বাচিত হন নরেন্দ্র সেন। নরেন্দ্র সেনের একান্ত সহকর্মী ছিলেন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, অমৃত হাজরা প্রভৃতি। ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রধান কেন্দ্র কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয়। কলিকাতা অনুশীলন সমিতি নিস্তেজ হয়ে পড়ে। ঢাকা অনুশীলন সমিতিই অনুশীলন নামে পরিচিত হয় এবং কলিকাতা সহ সারা বাংলার ও উত্তর ভারতে বিস্তার লাভ করে। এই নতুন নেতৃত্ব সারাভারত ব্যাপি সংগঠন গঠন এবং অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হয়। যুগান্তর বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ১৯১০ সালে অনুশীলনের মুখপত্র 'স্বাধীন ভারত' প্রকাশিত হয়।

দেরাদুনে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে ও চন্দননগরের বিপ্লবী দলের সঙ্গেও ঘনিষ্ট যোগাযোগ স্থাপন হয় এবং একসঙ্গে বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ও উন্নত মানের বোমা তৈরীর ব্যবস্থা হয়।

১৯০৯ সনে মিন্টো মর্লি শাসন সংস্কারে বড় লাট কাউন্সিলে ভারতীয় নিয়োগ ও ১৯১১ সালে বঙ্গ ভঙ্গ রদ করে বাঙ্গালীদের ব্রিটিশ বিরোধিতার মনোভাবের মোড় ফিরেছে প্রত্যাশায় কলিকাতা হতে দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করে নতুন ভাবে ভারত শোষণ ও শাসনের ব্যবস্থা হল। ১৯১২ সালের ২৩ ডিসেম্বর বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভা-যাত্রা সহকারে দিল্লীতে প্রবেশের দিন স্থির হল। বিপ্লবীরা স্থির করলেন বড় লাটের এই রাজকীয় প্রবেশের দিনই বৈপ্লবিক বিক্ষোভ জানাতে হবে। রাসবিহারী এই দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, রাসবিহারী কানু বিশ্বাস ও অবোধ বিহারীকে নিয়ে শোভা-যাত্রার মধ্যে হস্তিপৃষ্ঠে লর্ড হার্ডিঞ্জকে বোমা নিক্ষেপ করলেন, বড়লাট গুরুতর আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন, মাহুতের মারা গেলেন। অবোধ বিহারী ও বসন্ত বিশ্বাসকে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়ে রাস-বিহারী দেরাদুনে ফিরে গেলেন, দেরাদুনে রাসবিহারী

প্রকাশ্যেই রাজ কর্মচারী হিসাবে চলাফেরা করতে লাগলেন। রাসবিহারী এই ব্যাপারে সাহায্য করতে পারবে আশায় কেন্দ্রিয় গোয়েন্দা দপ্তর রাসবিহারীকে ছুটি দিয়ে কলকাতায় পাঠান।

কলিকাতায় এসে রাসবিহারী অনুশীলন নেতা বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার আসামী প্রতুল গাঙ্গুলীর সঙ্গে থাকতেন। কয়েক দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ও সময়ে অনুশীলনের প্রথম সারির নেতারা গ্রেপ্তার হন। রাসবিহারী হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের প্রধান নায়ক গোয়েন্দা দপ্তর জানতে পেরে, এই সংবাদে তিনি সম্পূর্ণ গা ঢাকা দিলেন, পরিকল্পনা অনুযায়ী সারা ভারত ব্যাপি অভ্যুত্থানের প্রস্তুতির জন্য ব্রতী হলেন। ইতিমধ্যে অনুশীলনের বাংলা ও সর্ব-ভারতের সংগঠন, পাঞ্জাবে হরদয়ালের সংগঠন, চন্দন নগরের বিপ্লবী গোষ্ঠি, বেনারসের শচীন্দ্র সান্যালের দল একসঙ্গে কাজ করতে থাকে। অনুশীলনের প্রথম সারির নেতা নরেন সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, রবি সেন প্রমুখ গ্রেপ্তার হওয়ায় রাসবিহারীকে নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হয় এবং সারা ভারতব্যাপী সৈন্যবাহিনীতে সংগঠন গড়ে তুলেন সহকর্মীদের সাহায্যে। অভ্যুত্থানে সাহায্য ও সামিল হওয়ার জন্য বিদেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের সংগঠন বার্লিন কমিটি ও গদর দল রাসবিহারীর নেতৃত্বে যোগ দেয়।

সারা ভারতব্যাপি গণ অভ্যুত্থান

পেশোয়ার থেকে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত মোট ২৯টি সৈন্য বাহিনী সংগঠিত হল। সারা ভারতের বিপ্লবী সংগঠনও প্রস্তুত হল। অভ্যুত্থানের দিন স্থির হল ১৯১৫ সনের ২১ ফেব্রুয়ারী। জনৈক বিশ্বাস ঘাতক কৃপাল সিং-এর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ইংরেজ আগে আক্রমণ শুরু করে। স্থানে স্থানে তুমুল লড়াই হয়, সিঙ্গাপুরে 15th Mahammdan Platoon এবং 35th Sikh Regiment স্বাধীনতা ঘোষণা করে প্রায় এক সপ্তাহ নিজেদের শাসন কায়েম রেখেছিল।

অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী কার্যক্রম স্থির করে রাসবিহারী ১৯১৫সনের ১২মে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে জাপান চলে যান। জাপান থেকে জার্মান ও জাপান সরকারের সহায়তায় দুই জাহাজ অস্ত্র-শস্ত্র ভারতে বিপ্লবীদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, এই সংবাদ নিয়ে বিপ্লবী অবনী মুখার্জী ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন, পথি-মধ্যে সিঙ্গাপুরে অবনী মুখার্জি গ্রেপ্তার হন। অবনী মুখার্জির নিকট হতে ব্রিটিশ গোয়েন্দা একটি নোট বই পায়, সেই নোট বই হতে এই সব খবর ফাঁস হয়ে যায়। গোয়েন্দা তৎপরতায় অস্ত্র-শস্ত্র সহ জাহাজ ভারতে পৌঁছতে পারে নাই, অধিকন্তু বিপ্লবী ঘাঁটির উপর পুলিশের আক্রমণ শুরু করে।

বিপ্লবীরা নীরবে সশস্ত্র পুলিশের আক্রমণ সহ্য করেনি। ১৯১৮ সালে ৭ই ও ৯ই জানুয়ারী গৌহাটিতে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়, প্রথম দিন পুলিশ হটে যায় দ্বিতীয় দিন দলনেতা নলিনী ঘোষ সম্মুখ সমরে গুরুতর আহত অবস্থায় ধৃত হন। আরও দুইজন সঙ্গী আহত অবস্থায় ধৃত হন। অন্যান্যরা সরে পড়তে সমর্থ হন। এই ধরণের লড়াই বাংলায় ও বাংলার বাইরেও হয়েছে।

১৯১৮ সালের ১৫ জুন ঢাকা কলতা বাজারে বিপ্লবী তারিণী মজুমদার ও বিপ্লবী নলিনী বাগচি পুলিশের সঙ্গে লড়াইএ মৃত্যু বরণ করেন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যু শিয়রে মুমূর্ষ অবস্থায়

নলিনী বাকচি জবাব দেন 'Let me die peacefully. Don't disturb

ফিরোজপুরে বৃটিশ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই-এ ভারতীয় সিপাহীদের ৫০ জনের মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে যে আত্মত্যাগের সূচনা দেখা দিয়েছিল শহীদ নলিনী বাকচি ও তারিণী মজুমদারের আত্মোৎসর্গে তাকে আর কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেল।

সরকারী রেকর্ডে দেখা যায় এই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টায় ৭০ জন মৃত্যু বরণ করেন, ১০০ জনের ফাঁসি হয়, ১৫০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং প্রায় ২০০ জনের বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড হয়। রেকর্ড নেই এমন বহু বিপ্লবী প্রাণ দান করেছেন। বিপ্লবী নায়ক যতীন্দ্র নাথ মুখার্জী (বাঘা যতীন) ও ১৯১৪ সালে বিশ্ব-যুদ্ধের সময় বিভিন্ন বিপ্লবী গ্রুপ একত্র করে জার্মান হতে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহের পরিকল্পনা করেন, এই পরিকল্পনাও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য ফাঁস হয়ে যায়। পুলিশের হামলা প্রতিরোধ প্রকল্পে ১৯১৫ সনের ৯ই সেপ্টেম্বর বালেশ্বর বুড়ীবালামের তীরে যতীন্দ্র নাথ ও তার চারজন সহকর্মী আত্মাহুতি দেন। সম্মুখ সমরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, পরদিন হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন যতীন্দ্র নাথ স্বয়ং। নীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসি হয় এবং যতীন পালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

যতীন্দ্র নাথ মুখার্জীর নির্দেশে ও নেতৃত্বে মানিকতলা বোমা মামলার সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে আলিপুর পুলিশ কোর্টে ১৯০৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী চারু বোস গুলি করে হত্যা করেন. চারু বোসের ফাঁসি হয় এবং ১৯১০ সালের ২৪ জানুয়ারী বীরেন দত্ত গুপ্ত আলিপুর বোমার মামলার তদন্তকারী গোয়েন্দা সামসুল আলমকে হাইকোর্টে গুলি করে হত্যা করেন। বীরেন দত্ত গুপ্তেরও ফাঁসি হয়। (ক্রমশঃ)

৬পৃঃ শেষাংশ

পরে ভারতীয়। তা না হলে তাঁদের অতি আগ্রহীরা আফগানিস্থানে রুশ বাহিনী ঢুকলে কেমন করে বলতে পেরেছিল—"আমরা আফগানিস্থানে সোভিয়েত রুশ বাহিনীর প্রবেশ সমর্থনই করি. সোভিয়েত সৈন্যদল ভারতে প্রবেশ করলে তাদের আমরা স্বাগত জানাবো।"

এ সব জেনে শুনেও যাঁরা আনন্দমঠের দেশপ্রেমকে বড্ড হিন্দু ঘেঁসা বলেন, তাঁদের কি বলা উচিত? আনন্দমঠের সন্তানদল হিন্দুরাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, তাঁদের দেশ প্রেমের আদর্শে হিন্দুধর্ম প্রভাবিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এতে কোন অসঙ্গতি ঘটে নি। দেশপ্রেমে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ নেই। (চলবে)

বেজোট সম্মেলনের রূপরেখা

বংশীধর বন্দ্যোপাধ্যায়

সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রী, পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে বিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনিই ছিলেন ঐ বিশেষ নীতির প্রবর্তক বিশ্ব রাজনীতির। ফলে ভারতের সন্নিহিত অন্যান্য সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত রাষ্ট্রের নায়কগণ ও তার সঙ্গে আন্তরিক সহযোগিতার মনোভাব প্রকাশে এগিয়ে আসেন। উ-নু, বন্দর নায়েক, নাসের, সোয়েকর্ণ, মার্শালটিটো, নক্রুমা, কাস্ত্রো, জেমোকেনিয়াট্টা, কেনিথ কাউণ্ডা প্রভৃতি অনেক রাষ্ট্রনায়কই জোট নিরপেক্ষ নীতিতে আস্থা প্রকাশ করেন এবং তাঁরা সকলেই নেহেরুজীকে কেন্দ্র করে বিশ্ব শান্তির পথে অগ্রসর হবার জন্য আগ্রহশীল হন। রাজনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের নিষ্পেষণ থেকে বহু দেশ তখন মুক্তি পেলেও, তারা অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে তখনও রেহাই পায় নি। ধনতান্ত্রিক দেশগুলি তাদের স্বদেশজাত পণ্য সামগ্রি গুলি বহুজাতিক সংস্থাগুলির মাধ্যমে সারা বিশ্বে চালান দিয়ে বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক শোষণ, অসম লেনদেনের সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একাধিপত্য স্থাপন ও বিশ্বের সমগ্র আর্থিকক্ষেত্রে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার বিশেষ তৎপরতা দেখা যায়, প্রায় অধিকাংশ সময়েই। ফলে রাষ্ট্রিক সাম্রাজ্যবাদ নূতন রূপ নেয়, যাকে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বলা চলে। সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণ বিদ্বেষবাদের বিরুদ্ধতা, ঠাণ্ডা লড়াই ও পারমানবিক যুদ্ধ প্রচেষ্টার বিরোধীতা, রাষ্ট্রসংঘের শক্তিবৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধন এবং স্থায়ী বিশ্ব শান্তির জন্য রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার প্রচেষ্টা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়েই জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন প্রথম যুগে তার সমগ্র শক্তি নিয়োগে তৎপর ছিল। নবলব্ধ স্বাধীনতা যা ছিল রাজনৈতিক কেবল, কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না তা, আর সে কারণেই তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিকামী, উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানরা নিজ নিজ দেশের বৈদেশিক নীতির মূল লক্ষ্য রেখেছিলেন—সার্বভৌমত্ব রক্ষা, আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা, পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহনশীলতা এবং স্ব স্ব আর্থিক ক্ষেত্রে স্বয়ম্ভরতা অর্জন প্রভৃতি। আর্থিক দিক থেকে তারা প্রায় নির্ভরশীল ছিল প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির উপর, যেহেতু ঐ সব দেশের অর্থনীতি সুদৃঢ় বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠা ছিল অর্থাৎ শোষণের মাধ্যমে উপনিবেশগুলির ওপর তখনও তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিরাজমান ছিল। ঐরূপ অবস্থায় ষাট ও সত্তর দশকে আন্তর্জাতিক বেজোট আন্দোলন এক নূতন পথের সন্ধানে ব্যাপৃত হয়। ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত লুসাকা শীর্ষ সম্মেলনের পর থেকেই রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার বদলে আর্থিক দাবীগুলিরই প্রাধান্য পায় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি রাষ্ট্র সংঘের দরবারে ১৯৭৪ সালে New International Economik order অর্থাৎ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবীগুলি প্রস্তাব আকারে উত্থাপন করে এবং তা গৃহিত হয় রাষ্ট্র সংঘের অধিবেশনে। ঐ সময়েই এই সব

দাবীগুলি পরবর্তী বেজোট সম্মেলনে ও রাষ্ট্রসংঘের কয়েক অধিবেশনে বার বার উচ্চারিত হয়। ঐ নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ঐ সব দাবীর মূল বিষয় বস্তু ছিল, বর্তমান অসম ও নয়া সাম্রাজ্যবাদী আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌলিক পুনর্বিন্যাস ত্বরান্বিত করা যাতে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত দেশগুলি তাদের এলাকার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর জাতিয় সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাধা না পায় বহুজাতিক সংস্থাগুলির তৃতীয় বিশ্বে কর্ম তৎপরতা বা খবরদারী ও শোষণের অবসান রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্য দানের বিশ্রী নীতি পরিহার, আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যে বিনিময় হারের সুসম বিলি ব্যবস্থা বা পুনর্বিন্যাস, আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির পরিচালনাধীনে তৃতীয় বিশ্বে ঐ সব দেশগুলির নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, পুঁজি ও কারিগরী কৌশলের হস্তান্তর প্রভৃতি। তবুও উক্ত সর্বপ্রকার ব্যবস্থার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ দেখা যায় নি, অবস্থা যে তিমিরে ছিল সে তিমিরেই রয়ে গেল। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নির্মাণের পথে কোন বিশেষ উদ্যোগ দেখা যায় নি, ফলে তৃতীয় বিশ্বে বেজোট রাষ্ট্রগুলি ক্রমশঃই আরো বিক্ষুব্ধ হতে থাকে পশ্চিমের শিরোন্নত কারিগরী বিদ্যায় পারদর্শী দেশ গুলির ওপর। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি নয়া আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দাবীগুলির সাথে নিজেদের জড়িয়ে ফেলতে নারাজ দেখা যায়। কারণ তাদের মতে তৃতীয় বিশ্বের উন্নতিশীল বা অনুন্নত যে আর্থিক কষ্টে আছে, তার মূল হচ্ছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির শোষণ ও বঞ্চনা প্রভৃতি। এছাড়াও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি পাশ্চাত্যের যুদ্ধ প্রস্তুতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ শক্তি গড়ে তুলতে সদাব্যস্ত, আর তার দারুণ প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে ক্রমশঃই। ঐ কারণেই তাদের পক্ষে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য দেওয়া আর সম্ভবপর নয়। বর্তমান আর্থিক দুরাবস্থা তৃতীয় বিশ্বে এত বেশী যে তার মূলোচ্ছেদ এখন আর সম্ভব নয়। ঐ দুরাবস্থার প্রধান কারণ হচ্ছে চরম শোষণ এবং তা সংঘঠিত হয় পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির দ্বারা ইতিপূর্ব। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে জাতীয় স্বার্থের সংঘাতও বড় কম নয়; ফলে পারস্পরিক সমঝোতা পর্যন্ত মাঝে মাঝে ক্ষুণ্ন হতে দেখা যায়, যা অত্যন্ত দুঃখজনক। ঐ সংঘাতের পশ্চাৎপটে বৃহৎ শক্তি বৃন্দের উস্কানি ও প্ররোচনার সংবাদও পাওয়া যায় প্রায়শই। প্রত্যেক রাষ্ট্রই নিজ নিজ স্বার্থে এমনই অন্ধ যে যৌথ কৌশলের পথে যেতেও তারা কখনও দ্বিধা বোধ করে, যা সার্বিক ক্ষয়ক্ষতির কারণ হয়। জোট নিরপেক্ষ দেশগুলি সহ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলিও ব্যাপক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ব্যাপারে সব সময় উল্লেখযোগ্যভাবে উৎসাহী নয় যে কেন, সেটাই বোধগম্য নয়। তৃতীয় বিশ্বের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ যদিও জোট নিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, তবুও তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে অন্তর্দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। ইরাণ-ইরাক যুদ্ধ কালেও অনেকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন একমত হতে পারে নি। আসন্ন সপ্তম দীর্ঘ সম্মেলনে যা ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তা আশা করা যায় যে, দৃঢ়তার সাথে নিজেদের মধ্যে বোঝা পড়ার দ্বারা একটা সুনির্দিষ্ট পথ বেছে নেবে। এই সম্মেলনের উপর অনেক কিছুই নির্ভরশীল বলে প্রতীতি হয়। তৃতীয় বিশ্বে প্রথম যুগের অধিকাংশ

নেতাই অর্থনৈতিক সমাজবাদের সঙ্গে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সংমিশ্রণের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে আস্থাশীল ছিলেনএবং তারা ঐ পথেই নিজ নিজ দেশকে পরিচালিত করতে প্রয়াসও পেয়েছিলেন. কিন্তু তবুও ঐ পথ থেকে কেউ কেউ পরে হটে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন সামরিক জোটবদ্ধ শক্তি গুলির দাপটে পড়ে। পরে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ সামরিক বা আধা সামরিক ধরণের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরও যাক্ বিভূতি সর্বস্ব সমাজবাদের ভ্রান্তবুলির মিথ্যা প্রচার বন্ধ হয় নি ঐ সব দেশে ওরাই আবার আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে. হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আর না হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত হয় নি। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শুরু থেকেই সামরিক জোটের বাইরে থাকার নীতি গৃহীত ও অনুসৃত হয়, তথাপি মাঝে মাঝে এর কিছু কিছু ব্যতিক্রমও লক্ষ্য করা যায়, যা লজ্জাজনক ও নিন্দনীয় পরিত্যাজ্য ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে যথাসাধ্য আর্থিক সাহায্য করে চলেছে, যদিও কোন ঐতিহাসিক ও নৈতিক দায়-দায়িত্ব এ ব্যাপারে তাদের ছিল না। তৃতীয় বিশ্বের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ব্যবস্থা কোনরূপ ব্যক্তিগত মুনফা অর্জনের ক্ষেত্র নয় ও বহু জাতির সংস্থার মালিক নয়। প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে এবং পাশ্চাত্যের ধনতান্ত্রিক দেশের মত কোন শোষণের যন্ত্র তাদের হাতে নেই; সে জন্যই তাদের পক্ষে ধনতান্ত্রিক দেশগুলির মত তৃতীয় বিশ্বে শোষণের জাল বিস্তার সম্ভব নয়, উক্ত আর্থিক সাহায্য দানের বিনিময়ে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের মধ্যে আভ্যন্তরীন এই কাঠামোগত তারতম্য ও জাতীয় স্বার্থের সংঘাতই বৃহত শক্তি বর্গের বৈদেশীক নীতি ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সমস্যা সম্বন্ধে মতভেদের কারণ স্বরূপ। রুশ-চীন সংঘাত এবং আমেরিকা ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় ঠাণ্ডা লড়াই প্রভৃতি (cold war) সংঘাতের ক্ষেত্রকে বিস্তৃত করতে প্রয়াশ পাচ্ছে, যা অনভিপ্রেত বিশ্ববাসীর কাছে। ১৯৭৯ সালে অনুষ্ঠিত হাভানা (Havana) শীর্ষ সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ফিউড্যাল কাস্ত্রো প্রস্তাব আনেন যে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের পক্ষে স্বাভাবিক মিত্র-শক্তি স্বরূপ। উক্ত প্রস্তাবের পক্ষে আরো কয়েকটি জোট নিরপেক্ষ দেশের সমর্থনও ছিল। কিন্তু ভারত, যুগোশ্লোভিয়া প্রভৃতি কয়েকটি দেশের বিরোধীতায় ঐ প্রস্তাব শেষ পর্যান্ত গৃহীত হয় নি। মার্শাল টিটো সে সময়ে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন। আফগানিস্তানে সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপ, কাম্পুচিয়ার ভিয়েৎনামী সামরিকহস্তক্ষেপ, কাম্পুচিয়া সরকারের স্বীকৃতি, চীন-ভিয়েৎনাম যুদ্ধ, ভারত সাগরে মার্কিন যুদ্ধ ঘাঁটি স্থাপন (দিয়াগো-গার্সিয়া দ্বীপপুঞ্জে) ও বৃহৎ শক্তি বর্গের সামরিক জোটের তৎপরতা তথায় প্রভৃতি সারা বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং ঐ সব সমস্যা সমাধানের চিন্তা ও আলোচনা নিশ্চয়ই সপ্তম জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে উঠবে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের নেতৃত্বে গঠিত পাশ্চাত্য শক্তি জোটের চাইতে সোভিয়েট নেতৃত্বে গঠিত সমাজতান্ত্রিক শক্তি জোটের উপর বেশী নির্ভর শীল দেখা যায়, যদিও কোন প্রকার জোটেরই পক্ষপাতি নয় তারা মূলত। জোট নিরপেক্ষ বা বেজোট আন্দোলন বিশ্বশান্তি রক্ষায় যে বিশেষ অগ্রণী, সে কথা অনস্বীকার্য্য: কারণ উক্ত বেজোট আন্দোলন ইতিপূর্বেই বহু ক্ষেত্রেই নিজেদের নৈতিক প্রভাব বিস্তারেও বিশ্ববাসীকে হুসিয়ারী দেবার ব্যাপারে বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছে। সে কারণে উক্ত বেজোট সম্মেলন যা ভারতের মাটিতে বর্তমানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন ছোট-বড় দেশের রাষ্ট্র নায়কদের পদার্পণে, তা যেন বিশ্বে সামরিক উত্তেজনা হ্রাসের ও পারস্পরিক সমঝোতা বৃদ্ধি ও সকল দেশ ও জাতির নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত করার কাজে লাগে এবং বর্তমান উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়াকে শান্ত করতে সক্ষম হয়, সর্ব্ব জনকল্যাণ চিন্তায়।

No. 8/38/82-FF(P)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministary of Home Affairs/Grih Mantralaya

New Delhi—110 003, the 13th Jan. 1983

To
The Chief Secretaries to all the State Governments./U. Ts

Sub: Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme for freedom fighters and their families.

Sir.

I am directed to state that for the purpose of grant of pension under Swatantrata Sainik Samman pension Scheme the freedom fighters who suffered interament in Home for a minimum period of six months are considered eligible for pension. On receipt of representation, from several quarters, the nature and the content of this suffering has been reviewed in consultation with Non-Official Advisory committee of freedom fighters at the Central Level and it has now been decided that all types of interoment irrespective of the area within which the movement was restricted may be considered qualifying for the purpose of grant of samman pension. The state Government/U. T. admns. are requested to keep this in view while considering the eligibility of freedom fighters and their dependent under the Swatantrata Sainik Samman pension Scheme.

Yours faithfully,
Sd/-
(K. N. SINGH)
UNDER SECY. TO THE GOVT. OF INDIA.

Copy for information and guidance to :
All Processing Sections of F. F. Division.
All Branch officers of F. F. Division.
DS FF /PS to JS(F).

Regd. No. R. N. WB / NC 77 / phone : 34-1795 মূল্য: ৩৪ প:

আমরা সবরকম বাধা অতিক্রম করতে সক্ষম

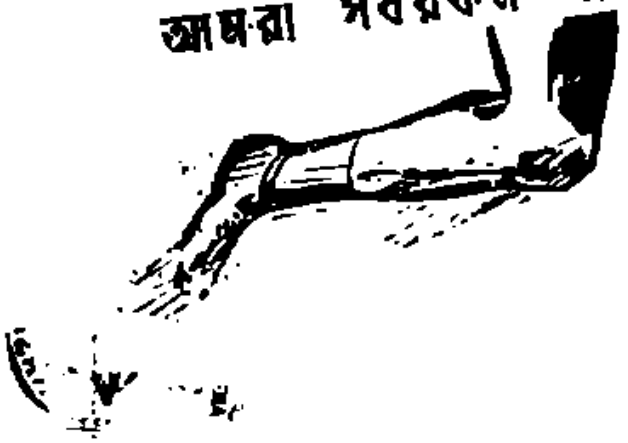

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সাধারণ নৈরাশ্যজনক অবিশ্বাসকে
প্রমাণ করে তুলতে নয় পরিবর্তে নেতৃত্ব-এর এই বিপুল সম্ভাবনা
কি করে সম্ভব হলো ?

"এখানে উদ্যম এবং পুরনোকে ভেঙে,
নতুনের প্রতিষ্ঠা"-এর জন্যে।
এই বাণীর উদ্গাতা প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর।
নতুন ২০ দফা কার্যসূচী ঘোষণার পর
তিনি এই আহ্বান জানিয়েছিলেন।

এই আহ্বানের নিবে মিলেমিশে কাজ করে আমরা দেশের
বিভিন্ন স্টেডিয়ামগুলি তৈরী করেছি এবং লক্ষ্যের সঙ্গে
আপোষ করতে সক্ষম হয়েছি। এশিয়াডের জন্য আমরা যে তৈরি,
তাতেই বিশ্বের সাধারণী পরিকল্পনা এবং নতুন ২০ দফা কার্যসূচীর
মধ্যেই আমরা তা করতে পারি।

শক্তিশালী দেশ গঠনে
আসুন আমরা সকলে মিলেমিশে কাজ করি

শ্রীসুনিল সেনগুপ্ত কর্তৃক ৫, ক্ষেত্র দাস ষ্ট্রীট, কলি-৬ হইতে প্রকাশিত ও ইংরেজী ১১৭, কেশব সেন ষ্ট্রীট কলি-৯ হইতে